পিণ্ডারীর পথে

দীপক কুমার সরকার

পরিবেশক :—
দে বুক স্টোরস
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : গুরু পূর্ণিমা, শ্রাবণ, ১৩৫৮

প্রকাশিকা : শ্রীমতী সুপ্রিয়া বসু
সুপ্রিয়া প্রকাশনী
২/ই বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোরস
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : প্রীতিসুধা বৈদ্য
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদপট : ছাঙ্গুঁছ
আলোক চিত্র : লেখক

এই লেখকের ঃ

রূপতীর্থ

রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড

নন্দন কাননে

আবার হিমালয়!

আবার সেই কুমায়ুন!

সেই স্বপ্নেঘেরা পাহাড়ের দেশ।

যেখানে নেমেছে ঝর্ণা ঝুমুরের ঝমঝম ঝঙ্কার তুলে। ছুটেছে নদী শস্য শ্যামলা শোভনা মায়ের পা ধুয়ে। নদীর কলকলানি আর পাখীর কাকলি। মৌমাছির মৌ মৌ গুঞ্জনে আর শিঞ্জনে ভরে আছে যার হৃদয়। সেই দেশেরই ভালে শোভা পায় রজত শুভ্র তুহিন কিরীটমালা। বাতাসে ছড়ায় ফুলের রেণু। আকাশে ভাসে পাখনা মেলা মেঘের ভেলা। কুয়াশা চলে ওড়না উড়িয়ে। ঘাসের শীর্ষে শিশির কণা ঝিলমিল করে অরুণ আলোর অঞ্জলিতে। বনে বনে বিকশিত হাসি। অন্দরে কন্দরে কত শত উপত্যকা। কত তাদের মাধুর্য! কোল ভরা তাদের কনক ধান। বুক ভরা তাদের মধু। লুকিয়ে থাকে ছোট্ট মেয়ের মত মায়ের আঁচল ঘিরে। ডাকছে নদী—গাইছে গান। চলেছে পথ এঁকেবেঁকে। ডেকে ডেকে। চলেছে সে অন্দর থেকে অন্দর মহলে। বইছে বাতাস শীতের শিহরণ দিয়ে। মন ছুটেছে তাদের পিছু পিছু। যেন কোন অজানা পথের সন্ধান নিয়ে।

প্রবেশদ্বার ছেড়ে বাস ছুটেছে ভাওয়ালির পথে। দেখতে দেখতে বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল কাঠগুদাম। পিচ ঢালা পথ। যেন চলেছে বিশাল এক অজগর সাপ আমাদের পথ দেখিয়ে।

এখন আর কোন ক্লান্তি নেই। নেই কোন অবসাদ। আনন্দে মনে যেন উদ্বেল জোয়ারের উত্তাল ঊর্মি উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে পুরানো পরিচিত পথ। তবুও যেন নতুন করে খুঁজে পাই তারে। মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকি বাসের জানলা দিয়ে। চেয়ে দেখে দলের সকলেই।

বারজনের দল। সেও এক অদ্ভুত ভাবে সংগঠিত হ'ল। আমার এক বন্ধু রমেন্দ্র নাথ সেনশর্মা সে তার আটজন সঙ্গী নিয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়েছে পিণ্ডারী হিমবাহ দেখতে। আর

আমরাও তিনজন চলেছি সেই একই পথে। আমার সঙ্গী অরুণাভ চ্যাটার্জি ও সুখেন্দু চ্যাটার্জি।

কলকাতা থেকে আমরা একই ট্রেনে উঠেছি। তবে সেনরা ছিল অন্য কামরায়। তাছাড়া ওদের কয়েকজন আবার অন্য ট্রেনে কাঠগুদামের পথে রওনা হয়েছিল। সেনের দলে ছিল অজিৎ রায়, স্বপন কাঁঠাল, মনোজ চ্যাটার্জি, সমীর দত্ত, বিজন দত্তগুপ্ত, বিজন ব্যানার্জি, নারায়ণ চন্দ্র দে (নাড়ু) ও নীরেন ব্যানার্জি (পানু)। যাইহোক কাঠগুদাম স্টেশনে নেমে সবাই মিলে একটা দল তৈরী করে নিলাম। এতে আমাদের কুলি ও গাইডের খরচা কম হবে। তাছাড়া পিণ্ডারীর পথে যে সব বাংলো আছে সেগুলো আমরা কলকাতা থেকে চিঠি লিখে আমাদের নামে আগে থেকেই বুক করে রেখেছিলাম। তাই একই পথে একই সময়ে যেতে হলে বিভিন্ন দলকে তারিখের একটু অদল-বদল করে নিতে হয়। এতে কোন একটা দলকে দু' একদিন পরে রওনা হতে হয় নইলে জায়গা পাওয়া একটু কঠিন। তাছাড়া এক সঙ্গে গেলে ঘর ভাড়া ও অন্যান্য খরচা আনুপাতিক কিছু কম হবে। তবে বড় দল পরিচালনা করাও ঝামেলা সাপেক্ষ। সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলাও এক কঠিন কাজ। সেইজন্য আমরা মোটামুটী ঠিকই করে নিয়েছিলাম যে দু'টো দলের পরিচালনার দায়িত্ব ভিন্নই থাকবে। তাছাড়া সেনরা যে সব খাবার কলকাতা থেকে এনেছে তা দেখে খাবারের ব্যবস্থাটাও পৃথক করে নিয়েছিলাম।

বাস চলেছে। আঁকাবাঁকা পথে। নীল আকাশে সোনালী ঝলমলে রোদ। পথের দু'ধারে পাইন, চীর প্রভৃতি গাছের স্নিগ্ধ শোভা। যেন গাঢ় সবুজ রঙের পতাকা উড়িয়ে চলেছে তারা পথের নিশানা দেখিয়ে। বইছে বাতাস মনোরম শীতের ছোঁয়া দিয়ে। ঝিরঝির শব্দ উঠেছে গাছের পাতায় পাতায়। আকাশ কোণে ভেসেছে মেঘ ডানা মেলে। যেন মনের আনন্দে। সূর্যের

সোনালী আলো ছুঁয়েছে তাদের মাথায় মাথায়। চিকমিকি কত রঙের বাহার লেগেছে তাদের পাখায় পাখায়। চলেছে চঞ্চলা কোশী নদী ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে। যেন নৃত্যের ছন্দে মনের অনন্দে। তন্ময় হয়ে দেখি আর কানপেতে শুনি নদীর প্রবাহ-গীতি।

হঠাৎ কানে আসে লোকের কোলাহল। বাস থেমেছে ভাঁওয়ালিতে (৫৬০০´/২০ মাইল)।

ভাওয়ালি একটা ছোট পার্বত্য শহর। বাস পথের একটা বড় জংশন। কাঠগুদাম থেকে নৈনীতাল, ভীমতাল, নখুচিয়া তাল, সাত তাল, আলমোড়া, রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্থানে যেতে হ'লে ভাওয়ালি হয়েই যেতে হয়।

রাস্তার দু'দিকে ফলের দোকান। আপেল, নাশপাতিতে ভরা। বাস থামতেই দোকানীরা ছুটে আসে ফলের টুকরি নিয়ে। যাত্রীদের দরাদরি আর ফলওয়ালেদের আকুল আকুতিতে বাস স্ট্যাণ্ডখানি সরগরম হয়ে ওঠে।

বাস স্ট্যাণ্ডের একটু ওপরে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত সরকারী যক্ষারোগী নিবাস। আশেপাশে আপেল বাগান। লালে লাল। যেন আগুন লেগেছে বনে বনে। মরসুমি ফুলের বর্ণে, গন্ধে মাতোয়ারা ভাওয়ালি।

বাস এখানে মিনিট পনেরো দাঁড়াবে। সেই অবসরে বাস থেকে নামি।

সবুজ গাছে ঘেরা ছায়া নিবিড় শান্ত পরিবেশ। মৃদু শীতল আবহাওয়া। পথিক চিত্তকে ভরিয়ে তোলে। কিন্তু এই অপূর্ব পরিবেশে বিশ্রামের ভাগ্য অনেকের কপালে জোটে না। কেবল অসুস্থ হলেই মানুষ আসে এই মধুর পরিবেশে বিশ্রাম করতে। এটাই যেন এখানকার ট্র্যাজেডি বলে মনে হয়।

চায়ের দোকানে এসে বসি। আপেলের ঝুড়ি নিয়ে ফেরি-ওয়ালারা আসে। সুখেন্দু দর করে। ফল প্রিয় বন্ধুর আপেল

কেনা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায় ১৯৬০ সালের কথা। সেই আমার প্রথম দেখা ভাওয়ালি।

এপ্রিল মাস। দোকানগুলো ছিল ষ্ট্রবেরি ও মালবেরিতে ভর্তি। বাস থামতেই বাচ্চা বাচ্চা ফেরিওয়ালারা হাতে ষ্ট্রবেরি ও মালবেরির থোকা নিয়ে ছুটে আসে। হাঁকে ষ্ট্রবেরি-ষ্ট্রবেরি ! মালবেরি-মালবেরি বলে। কিন্তু সেদিনের এক বাচ্চা ফেরি-ওয়ালার কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। বাচ্চাটার বয়স ছয় কি সাত। একথোকা ষ্ট্রবেরি হাতে নিয়ে আমাকে কেনার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আমি কিনতে না চাওয়ায় হঠাৎ দেখি বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথমটাতে আমি বুঝতে পারিনি বাচ্চাটা কাঁদছে কেন। আমি ভাবি ওর বোধহয় কোথাও চোট লেগেছে না হয় পয়সা পড়ে গেছে। তাই জিজ্ঞাসা করি—কা হুয়া ? ভাল ভাবে কথাও বলতে পারে না। যা বলে তাও ঠিক মত বুঝতে পারি না। আবার জিজ্ঞাসা করি। একটু কান্না কমিয়ে ও যা বলেছিল—তা আজও আমার হৃদয়ে বেজে ওঠে। 'বাবুজি আপলোক নেহি মূলনেসে হামারা খানা নেহি মিলেগা।' অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বাচ্চাটার কথা শুনে। আব কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঐ থোকাটাব দাম জিজ্ঞাসা কবি। চাব আনা দাম চাওয়ায় আমি একটা আধুলি বের কবে ওব হাতে দিই। ওর কাছে ভাঙানি পয়সাও ছিল না। আমিও আব পয়সা ফেরত চাইনি। বাস ছেড়ে দেয়। বাচ্চাটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তারপর থেকে যতবারই এই ভাওয়ালিতে এসেছি ওকে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আর দেখা হয়নি। তবুও আমি তার কথা ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না সেই কুসুমের মত কোমল তুল তুলে কচি গোলাপী গালের স্নিগ্ধ হাসি কান্না। অদ্ভুত এই পাহাড়ী বাচ্চাগুলোর জীবন কথা। শৈশবকাল থেকেই ওরা দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে বড় হয়। ক্ষুধার তাড়নায় ওরা ছোট বেলা থেকেই পরিশ্রম

করতে শেখে। সত্যি সত্যি এই পাহাড়ী শিশুগুলোর কথা ভাবলেই বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে।

সুখেন্দু আপেল কিনে আনে। বাসে উঠি। কোশী নদীর তীর ধরে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে। এখন আর চড়াই নেই। বাস ক্রমশই নীচের দিকে নেমে চলেছে।

নদীর কোলভরা সবুজ ক্ষেতের শান্ত শ্যামলিমা। কোথাও দেখি পাইন ও চীরের বন। কোথাও ক্ষেতের মাঝে গ্রামের কুটিয়া। কখনও দেখি নদীব নির্মল জলে ভেসে চলেছে চেরাই করা কাঠের সারি। যেন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলেছে তারা কোন অজানা দেশে।

বিকেল হয়ে এসেছে। কোমল সূর্য রশ্মির রেশমী আলো এসে ছুঁয়েছে গাছের পত্র পল্লবে। বালির বুকে। চিকমিকি হবেক রঙের আলোর বাহার লেগেছে নদীর জলে। চলেছে মেঘপুঞ্জ ঊর্দ্ধগগনে। গৈরিক ওড়না উড়িয়ে। কুয়াশার জালে লুকিয়ে পড়ছে দূরের ঢেউ খেলানো পাহাড়গুলো। মন মেতেছে নীল আকাশে ঐ শত রঙের আলপনা দেখে।

দেখতে দেখতে সূর্যদেব ঢলে পড়লেন পশ্চিম আকাশে। দিগন্তে দেখা দিল লালের আভা। সিঁদুর মাখা সায়ন্তন সূর্যের বঙ্কিম প্রভায় মেঘের ঝালরে লেগেছে কুমকুমের রঙ। নীল নভস্তল ম্লান। কেমন যেন একটা উদাস মায়া ও ছায়ায় ভরা সারাটা পরিবেশ। ঝাঁক বেঁধে পাখীরা ফিরছে কুলায় কুলায়। মন যেন আনচান করে। উদাসীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি শূন্য-পানে। বাস থামে গরমপানিতে (১৩ মাইল)।

গরমপানি। একটা জায়গার নাম। আলমোড়ার পথে আর একটি স্টপেজ। এখানেও বাস আধঘণ্টা থামবে। বাস স্ট্যাণ্ডটি বড় সুন্দর। কোশী নদীর তীরে। মনোরম পরিবেশ। ছোট হোটেল ও খাবারের দোকানে জমজমাট। অধিকাংশ যাত্রী নেমেছে চা ও জলখাবারের জন্য। আমরাও নামি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দূর আকাশে আবছা অন্ধকার নেমেছে। পাখীর কূজন আর কোশীর কলকলানিতে যেন পূরবীর তান তুলেছে। বইছে ঠাণ্ডা বাতাস মনের আনন্দে। নদীর ওপারে মাঠে মাঠে দুলছে সোনালী ফসল। যেন প্রকৃতির অঙ্গে রূপের রঙ লেগেছে। নীরবে দাঁড়িয়ে দেখি সান্ধ্য শোভা। নয়নে স্নিগ্ধতা আনে। এলোমেলো নানা চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়ি। হঠাৎ মনোজের প্রশ্নে চমক ভাঙে। এই কি সেই কোশী নদী যাকে বিহারের দুঃখ বলা হয়! ফিরে ওর দিকে তাকাই। হাসতে হাসতে বলি এ কোশী বিহারের বন্যা ঘটায় না। এ কোশী কুমায়ুনের মুক্তধারা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ সব ঋতুতেই সমান ভাবে জলদান করে চলেছে। এ কোশী স্কন্দপুরাণের কৌশিকী। সোমেশ্বরের ভটকোট পর্বতে এর জন্ম। বহু পথ প্রান্তর, জনপদের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে মিশেছে এ কোশী রাম গঙ্গায়।

আর বিহারের কোশী হ'ল বীরপুরের বৃদ্ধকোশী। সে কোশীর আসল নাম সপ্তকোশী। নেপালের সাতটি নদী যথা ইন্দ্রাবতী, সুনকোশী, ভোটকোশী, দুধকোশী, লিখুখোলা, অরুণ ও তামুর মিলে সপ্তকোশীর জন্ম। সে কোশী শীতে শীর্ণা, বর্ষায় ভয়ঙ্করী।

অরুণ ডাকে। চা ও জলখাবার খেতে দোকানে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে বাসের হর্ন কানে আসে। তাড়াতাড়ি উঠি। বাস ছাড়ে। পথ এখন ক্রমশই ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে।

সন্ধ্যার ছায়া নিবিড় হয়ে আসে। বাঁদিকের ভ্যালিগুলো ধীরে ধীরে কুয়াশার জালে লুকিয়ে পড়ছে। পাইন ও চীর গাছগুলো একে একে মুখ লুকাচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে ধরণীর বুকে। আবছা রাতের আলো জাগছে নীল আকাশে। যেন দূর থেকে কেউ আলোর রথে আসছেন। একটি দু'টি করে নক্ষত্রের দীপশিখা জ্বলে ওঠে আকাশ কোণে। ঐ দূর আকাশে পাহাড়ের আড়ালে দেখা দেয় বাঁকা চাঁদ। শ্যামল বনভূমি আলোকিত করে উঠছেন চন্দ্রিমা ঊর্দ্ধগগনে। রূপসীর রূপোলী

কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর আকুল করা সুর মূর্ছনা যেন উদাসী বাউলের একতারায় আনন্দ সুরের ইশারা জাগায়। বাতাসে ভেসে আসে এক অপূর্ব সুরের রেশ। প্রাণ জুড়ায়। মন ভরে। চুপ করে বসে থাকি।

বাস ছুটে চলে। অন্ধকারের বুকে আলো ফেলে। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। কানে আসে শুধু ঝিল্লির ঝনক। আর বাসের হুঙ্কার। যেন হা-রে-রে-রে রব তুলে ছুটে চলেছে দস্যুদল কোন রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে।

যাত্রীরা সব নীরব। ক্লান্ত। তন্দ্রায় এ ওর ঘাড়ে ঢুলে পড়েছে। ব্যানার্জিদা দিব্যি নাড়ুর কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছে। বাসের ভিতরে ঠেসাঠেসি ভিড়। তার ওপর অনেকেই পাহাড়ী পথে মোটর চড়ায় অনভ্যস্ত। বিশেষতঃ পাহাড়ীরা। তাই বাসে উঠলে তাদের মাথা ঘোরায়, গা ঘুলায়। বেশ কয়েকবার বমি করে তারাও ক্লান্ত। আবার তারি মাঝে দু' একজন পাহাড়ী অম্লান বদনে বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছাড়ে।

সুখেন্দু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পাশে বসে বেশ গল্প জমিয়েছে। পিণ্ডারী যাচ্ছি শুনে তিনি তো অবাক। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। সুখেন্দু বারবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। বলে পিণ্ডারী যাচ্ছি শুধু বেড়াতে আর হিমালয়ের শোভা উপভোগ করতে। কিন্তু বৃদ্ধতো মানতে রাজী নয়। সে একটু আশ্চর্য হয়েই বলে বেড়াতে কি আর লোক ঐ সব দুর্গম অঞ্চলে যায়। বেড়াতে আসে লোকে নৈনীতালে, আলমোড়ায়, রাণীক্ষেতে। একমাত্র শিকারীরাই যায় ঐ সব বন জঙ্গলে শিকার করতে। কখনও কখনও দেখা যায় সরকারী লোকেরা আসে বন জঙ্গল দেখতে ও ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলোর খোঁজ খবর নিতে। তাও আবার অনেকেই লোকের মুখে খবর নিয়ে ফিরে যায়। আর আপনারা চলেছেন বেড়াতে—এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই এসেছেন কোন সরকারী কাজে। সুখেন্দু যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন ভবীতো আর

ভুলবার নয়। সেতো ধরেই নিয়েছে আমরা সরকারী লোক। তাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে নিজের কথা পাড়ে।

গত দু' বছর হ'ল বুড়ো তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। জামাই থাকে সোমেশ্বরের কাছে এক গ্রামে। মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক স্বরূপ একখণ্ড জমি তার জামাইয়ের কাছ থেকে পায়। কিন্তু কিছুদিন হ'ল জামাই সে জমিটাতে আর তাকে চাষ করতে দিচ্ছে না। তার অভিযোগ বিয়ের সময় জামাই যখন নগদ টাকা কিছু দিতে পারেনি তখন কেন তাকে ঐ জমি চাষ করতে দেবে না। ঐ জমির মালিক সে—জামাই ওটা ফেরৎ নিতে পারে না।

বুড়োর কথা শুনে সুধেন্দু হাসে। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে বিয়ের সময় জামাই কেন আপনাকে পণ দেবে· আপনি তো তাকে যৌতুক হিসাবে কিছু দেবেন। আমাদের দেশেতো তাই নিয়ম। বৃদ্ধ বলে এখানকার কানুন জামাই মেয়ের বাবাকে বিয়ের সময় যৌতুক দেবে।

অরুণ এতক্ষণ ঝিমাচ্ছিল। হঠাৎ সুধেন্দুদের মজার আলাপ আলোচনা শুনে উঠে বসে। তারও কৌতূহলের অবধি নেই।

এখানকার বিয়ের রীতিনীতি একটু অন্য ধরণের। বিয়ের সময় ছেলে পক্ষ মেয়ের বাবাকে টাকা পয়সা বা অন্য কোন সামগ্রী উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে থাকে। বিয়ের পর মেয়ে যদি সেই স্বামী গৃহ ছেড়ে অপর কোন ব্যক্তিকে পুনরায় বিয়ে করে তবে সেই নতুন স্বামী পূর্বতন স্বামীকে সেই একই রকম নিয়ম অনুসারে যৌতুক দিয়ে থাকে।

সুধেন্দু বুড়োকে বেশ তালিম দিয়ে বলে তাহলে এখানে মেয়ের বাবা হ'য়ে বেশ লাভ আছে দেখছি। বুড়ো হাসে। তবুও তার মাঝে আবার জিজ্ঞাসা করে আপনারা কি সত্যি সরকারী লোক নন? অরুণ ও সুধেন্দু এবার তাকে বোঝাতেই সে বুঝতে পারে। তাই হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বলে তাহলে আমার ঐ জমিটার কোন সুরাহা হ'ল না। অরুণ তাকে বলে আপনিতো পঞ্চায়েতের

লোকজনকে খবর দিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন। বুড়ো এতে যেন একটু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে ওরাও সব ঐ দলেরই। অপরকে ফাঁকি দিতে পারলে আর কেউ কি ছাড়ে। পুলিশকে জানালাম। সেও গড়িমসি করে সময় কাটাচ্ছে। সুখেন্দু বলে তাহলে আপনি আইনের আশ্রয় নিন।

বুড়ো নিজের মনেই গজগজ করে বলে প্রয়োজন হলে লেঠেল দিয়ে জমি নেব।

বুড়োর হাবভাব দেখে আমার হাসি পায়। শান্ত কণ্ঠে বলি কি হবে আপনার ঐ জমি নিয়ে। ওটাতো আপনার মেয়ে জামাই ভোগ করছে। ফসলতো ওরাই পাচ্ছে।

বুড়ো আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে তারাতো আমাকে বলে কয়ে জমিটা নিতে পারতো। তা না করে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা! জোর করে জমি দখল! আমি কিছুতেই ছাড়বো না। আমার নাম মাধোয়াল সিং। দেখে নেব তারা কি করে আমার জমি দখল করে রাখতে পারে।

বুড়োর অবস্থা দেখে আর কেউ কথা বাড়াই না। চুপ করে বসে থাকি। সেও নিজের মনে বক্‌বক্ করতে করতে নীরব হয়ে যায়।

বাস চলেছে শোঁ শোঁ শব্দ তুলে। চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। অন্ধকার। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশ ললাটে উঠেছে ফালি চাঁদ—মৃদু কিরণ ছড়িয়ে। জ্বল জ্বল করছে শুধু নক্ষত্রমালা। যেন কৃষ্ণাভ শাড়ীর বুকে উজ্জ্বল চুমকী ঝলমল করে। অপলক নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখি। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আসে উড়ে। ক্ষণিক চাঁদের মুখখানি ঢেকে দেয়। আবার যেন কার ইঙ্গিতে তারা সরে পড়ে।

পথ চলে এঁকেবেঁকে। বাস ছোটে বিকট শব্দ তুলে। ঘুমন্ত শান্ত বনকে চমকে দিয়ে। দু'চোখে তার জোরালো আলো। যেন অবলা রজনীর কালো ঘোমটা টেনে তোলে। পথের দু'পাশে

নিবিড় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। শুধু পথের উপর আলোর ছটা ফেলে চলেছে বাস।

দৃশ্যপট বদলায়। দূরে দেখা যায় আলমোড়া শহরের আলো। যেন জোনাকিরা দলবেঁধে অপেক্ষা করছে পথিকের অভ্যর্থনার জন্য। পথ যত এগিয়ে আসে আলোর জৌলুসও বাড়ে। সঙ্গীরা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একটানা বাস ভ্রমণে সকলেই বেশ ক্লান্ত। নামতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রাত তখন প্রায় ৮টা। বাস থামে চুঙ্গিকর অফিসের সামনে। চৌকিদার আসে। বাসের খাতা দেখে লোক গুনতে শুরু করে। পাছে কেউ কর ফাঁকি দিয়ে নেমে যেতে না পারে।

কুমায়ুনের এই সব অঞ্চলে যথা নৈনীতাল, আলমোড়া, রাণী-ক্ষেত প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করতে হলে চুঙ্গিকর দিতে হয়। অনেক যাত্রীই এতে বিরক্ত বোধ করেন। বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার টুরিষ্টরা দার্জিলিঙের নজির দেখিয়ে বলে কই সেখানে তো কোন কর দিতে হয় না। কিন্তু একটা কথা না বলেও পারি না। এই কর আদায় করে এখনকার কর্তৃপক্ষ পথঘাট ছিম-ছাম রাখার জন্য ব্যয় করেন। শহর অঞ্চলের রাস্তাগুলো যে রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়—তা' সত্যি প্রশংসনীয়। যাইহোক মাথা পিছু পঁচিশ পয়সা করে কর নিয়ে চৌকিদার নেমে যায়। মিনিট ক'য়েকের মধ্যে বাসও স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায় (১৬ মাইল)।

আলমোড়া।

এক প্রাচীন শৈলপুরী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫৪৯৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত। রমণীয় প্রকৃতির কোলে এক কমনীয় স্থান। সবুজ ঢেউ খেলানো পাহাড়ে ঘেরা এই শহরটি মানুষকে বহুকাল ধরে আকর্ষণ করে চলেছে। পথের যে কোন স্থানে বেরলেই দেখা যায় রঙিন ছবি। যেন চিত্রের শহর।

সুদূর আকাশপটে তুহিনোজ্জ্বল শিখরমালা। নীল আকাশে স্নিগ্ধ সূর্যালোকের ঝিলিমিলি। উপত্যকার অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল

শোভা। নবীন ফসল ভরা ক্ষেত। পাহাড়ের ঢালু গায়ে সাজানো ঘর বাড়ী। যেন খেলাঘরের শহর। মনোরম শীতল আবহাওয়া। আলোছায়ায় ঘেরা পথ। পাইন, চীর, দেওদার বৃক্ষতলে বসে প্রকৃতির মনোলোভা শোভা দেখতে বড়ই ভাল লাগে। মন ভরে। দু'চোখে শান্তির আবেশ আনে।

আলমোড়া কুমায়ুনের বৃহত্তম নগরী। কত্যুরী রাজাদের আমলে এই শহরের পত্তন হয়। তাঁরা প্রথমে এখানে 'খাগমারা' নামে একটি দুর্গ তৈরি করেন। বর্তমান মিউনিসিপ্যাল অফিসের কাছেই কোথাও সেই দুর্গ ছিল। এই দুর্গকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে ওঠে। ১৫০০ সালে কত্যুরীদেব পরাজিত করে চাঁদরাজা কীর্তিচন্দ্র খাগমারা দুর্গ জয় করেন। ১৫৬০ সালে ভীষ্মচন্দ্র চম্পাবত থেকে রাজধানী সরিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। চাঁদ রাজাদের প্রচেষ্টায় আলমোড়ার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

দর্শনীয় স্থান হিসাবে আলামোড়ার খ্যাতিও কম নয়। এখানে রয়েছে চাঁদ রাজাদেব প্রাচীন দুর্গ। মিউনিসিপ্যাল অফিসের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে দেখা যায় পথেব দু'পাশে বাজার। আর সেই বাজারের উত্তর প্রান্তে রয়েছে প্রাচীন দুর্গ। ধ্বংস প্রায়। অক্ষত বলতে রয়েছে কেবল দুর্গপ্রাচীরের কিছু অংশ ও রামচন্দ্রের চরণ মন্দির। অবশ্য এই মন্দিরটি চাঁদরাজারা তৈরী করেন নি। এটি নির্মিত হয়েছিল প্রদ্যুম্ন শাহের আমলে।

বাজারের কাছেই রয়েছে নরসিংহ মন্দির। দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে মুরলী মনোহরের মন্দির।

বাস রাস্তা থেকে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যায় কুমায়ুনের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়—নন্দাদেবীর মন্দির।

নন্দাদেবী কুমায়ুন-গাড়োয়ালের পরমারাধ্য জাগ্রতা দেবী। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিনী আদ্যাশক্তি।

মন্দিরের মূল বিগ্রহ নন্দাদেবীর। পূর্বে এই মূর্তিটি ছিল পূর্ব গাড়োয়ালে—লোভার উত্তরে দেউলখালের কাছে জুনিয়াগড়

দুর্গে। ১৬৩৪ সালে ত্রিমলচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বাজ বাহাদুরচন্দ্র কুমায়ুনের সিংহাসনে বসেন। ১৬৭০ সালে তিনি জুনিয়াগড় অধিকার করেন। সেখান থেকে ফেরার সময় তিনি নন্দাদেবীর মূর্তিটি নিয়ে আসেন আলমোড়ায়। দুর্গের মধ্যে নতুন মন্দির নির্মান করে নন্দাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকেই এই মন্দিরে মহাসমারোহে নন্দাদেবীর পূজা পার্বন চলতে থাকে।

১৮১৫ সালে কুমায়ুন বৃটিশ শাসনাধীনে আসে। ইংরেজ শাসকগণ নন্দাদেবী মন্দিরের যাবতীয় দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে নেয়। ফলে পূজাও বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩০ সালে আলমোড়ার কমিশনার মিঃ ট্রেল নন্দাকোট ও নন্দাখাতের মধ্যবর্তী গিরিবর্ত্ম (ট্রেলস গিরিবর্ত্ম) অতিক্রমকালে সাময়িক তুষার-অন্ধ হয়ে যান। সঙ্গীরা ও স্থানীয় লোকেরা এটাকে নন্দাদেবীর অভিশাপ বলে অভিহিত করে। তারা তখন সাহেবকে নন্দাদেবীর পূজা ও দেবোত্তর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে। ট্রেল আলমোড়ায় ফিরে এসে নন্দাদেবীর পূজা দেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবোত্তর সম্পত্তিও ফিরিয়ে দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় নন্দাদেবীর এই মন্দির নির্মিত হয়।

আলমোড়ার চারদিকে চারটি পাহাড় আছে। এদের নাম কাসারদেবী, বাসরীদেবী, শ্যাহীদেবী ও কাতরমান। প্রত্যেকটি পাহাড়ের ওপর মন্দির আছে।

আলমোড়া থেকে হাঁটা পথে ৫ মাইল দূরে রয়েছে কাসারদেবীর মন্দির। সকালে বেরিয়ে বিকেলে ফিরে আসা যায়। বাজার ও জেলখানা ছাড়িয়ে নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে পথ গেছে এঁকেবেঁকে। পথে পড়বে স্নো ভিউ এষ্টেট ও কালিমঠ।

কালিমঠ এক অপূর্ব সুন্দর নির্জন স্থান। মঠের ভিতরে রয়েছে কালিমন্দির ও সাধুদের থাকার ঘরবাড়ী। এখান থেকে দেখা যায় মনোমুগ্ধকর দিগন্ত বিস্তারী হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভা। নন্দা-দেবী, ত্রিশূল, নন্দাকোট প্রভৃতি শৃঙ্গমালা। আর অপূর্ব দেখায়

আলমোড়াকে। এখান থেকে এক মাইলের মত পাকদণ্ডী পথে আসা যায় কাসারদেবী মন্দিরে। পথটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেশ চড়াই পূর্ণ।

সুশোভামণ্ডিতা প্রকৃতির রমণীয় পরিবেশে কাসারদেবীর মন্দির। সামনে দিগ্‌বলয়ে প্রসারিত হিমালয়ের অন্তহীন শুভ্র কেশরজাল। সংখ্যাতীত শ্বেত শিখরের সীমাহীন সৌন্দর্য।'

এই শান্ত মধুর পরিবেশে সন্ন্যাসীরা গড়েছেন তাঁদের সাধনভূমি।

কাসারদেবীর প্রধান মন্দিরটি সম্প্রতি বিড়লা নির্মান করেছেন। মন্দিরের ভেতরে শ্বেত পাথরের রণরঙ্গিনী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

অবশ্য আদি মূর্তিটিও রয়েছে এক বট গাছের নীচে। সিঁদুরে রঞ্জিত এক বিশাল প্রস্তর খণ্ডকে দেবীমূর্তিরূপে কল্পনা করা হয়।

তাছাড়া মন্দিরের আশেপাশে আরও কতগুলি ছোট ছোট মূর্তি ও মন্দির আছে।

আলমোড়া থেকে বাসে যাওয়া যায় জাগেশ্বর (২৫ মাইল)। আটওল্লায় নেমে মাইল তিনেক হাঁটতে হয়। পথে পড়বে জাগেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর গ্রাম। এখানে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। তবে যজ্ঞেশ্বর শিব মন্দিরই প্রধান। এখানে থাকার জন্য বনবিভাগের বাংলো ও মন্দির কমিটির রেষ্ট-হাউসও আছে।

আবার সেখান থেকে হাঁটা পথে (৫ মাইল) বুড়া জাগেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে যাওয়া যায়।

আটওল্লা থেকে আরও মাইল দশেক এগিয়ে গাঙ্গোলী হাটে মহাকালির মন্দির দর্শন করা যায়। ছ'মাইল দূরে রয়েছে পাতাল ভুবনেশ্বরের মন্দির।

আলমোড়া কুমায়ুনের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-মহাত্মাদের তপোভূমি। যুগ যুগ ধরে বহু

বাঙালী সন্ন্যাসী এসেছেন এই আলমোড়ায়। তাঁদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে আলমোড়ার পুণ্যভূমি।'

এসেছেন আলমোড়ার স্বামীজী (**Swami of Almora, the holy ascetic of Almora**)। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। ১৮৮২ সালে অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে তাঁর লিখিত এক মূল্যবান পত্র থিওসফিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৮৬ সালের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর বরাহনগর মঠের শিষ্যরা পুণ্যতীর্থে অথবা নির্জন নিভৃত অঞ্চলে তপস্যা করতে বেরিয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ) যাত্রা করলেন হিমালয়ে। তিনি বলেছিলেন 'আমার গুরুদেব বলতেন—হিমালয় বা সমুদ্র না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না, তাই হিমালয় দর্শনের জন্য আমার মন ব্যাকুল।'

১৮৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৯০ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি এক নাগাড়ে গাড়োয়াল, কুমায়ুন, তিব্বত, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে পরিক্রমা করেছিলেন। সেই সময় তিনি আলমোড়ায় আসেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দও হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু নানা কাজের জন্য তাঁকে দীর্ঘ তিন বছর হিমালয় ভ্রমণ স্থগিত রাখতে হয়। ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে স্বামীজী সঙ্গে অখণ্ডানন্দকে নিয়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে স্বামীজী শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিতে গিয়ে বলেছিলেন 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফিরব...।'

১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্রথম আলমোড়ায় আসেন। তিনি সেবারে লালা বদ্রী-সার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর তিনি আলমোড়া ত্যাগ করে বদ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ,

কৃপানন্দ ও মালবাহী একজন কুলি। কিন্তু সেবারে তিনি বদ্রীনাথ দর্শন করতে পারেন নি। দীর্ঘ ১২০ মাইল পদযাত্রার পর তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

আলমোড়া ছাড়ার পর পথে স্বামী অখণ্ডানন্দের কফ বৃদ্ধি হয়।...সেই অবস্থায় তাঁরা কর্ণপ্রয়াগে পৌছান। সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করেন। কারণ ঐ অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দেওয়ায় সরকার কেদার বদ্রীকাশ্রমের পথ যাত্রীদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিন দিন অপেক্ষা করে যখন তাঁরা দেখলেন যে ঐ পথ খোলার কোন আশা নেই তখন তাঁরা ঐ তীর্থদ্বয় দেখার আশা পরিত্যাগ করে অন্যপথ ধরলেন।

কর্ণপ্রয়াগ ছাড়ার পর স্বামীজীর জ্বর হয়। অখণ্ডানন্দের বুকের রোগ বৃদ্ধি পায়। তাঁরা সলড়কাড় চটিতে আশ্রয় নেন। পুনরায় পথ চলার মত সবল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই দিন কয়েক বিশ্রাম করেন। তারপর তাঁরা রুদ্রপ্রয়াগ এসে উপস্থিত হন।

রুদ্রপ্রয়াগের নৈসর্গিক শোভায় স্বামীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন। অলকানন্দাব প্রবাহগীতি শুনে তিনি বলেছিলেন 'উহা এখন কেদাব বাগে প্রবাহিত হচ্ছে।'

রুদ্রপ্রয়াগে পূর্ণানন্দ নামে একজন বাঙালী সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরই আশ্রমে তাঁরা প্রথম রাত্রি যাপন কবেন। পরদিন তাঁরা নিকটবর্তী ধর্মশালায় আশ্রয় নেন। স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হন। এই সময় গাড়োয়ালেব সদর আমিন বদ্রীদেব যোশীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের কিছু কবিরাজী ওষুধ দেন। তাঁরা কিছুটা সুস্থ হলে ডাণ্ডী করে তাঁদের শ্রীনগরে পাঠিয়ে দেন।

শ্রীনগরে এসে স্বামীজী ভাগীরথী দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তারপর তাঁরা টিহরি অভিমুখে যাত্রা করেন।

টিহরিতে এসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বড় ভাই রঘুনাথ ভট্টাচার্যের

সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। তিনি সেই সময় টিহরির রাজার দেওয়ান ছিলেন। তিনি গঙ্গা ও ভিলঙ্গনা নদীর সঙ্গমস্থল গনেশপ্রয়াগে স্বামীজীর থাকার স্থান ঠিক করে দেন। কিন্তু অখণ্ডানন্দের সর্দিজ্বর দেখে স্থানীয় ডাক্তার তাঁদের নীচে নেমে যেতে পরামর্শ দেন। গুরুভাইয়ের মঙ্গলের জন্য স্বামীজী তপস্যা পরিত্যাগ করে মুসৌরী হয়ে দেরাদুন অভিমুখে রওনা হন।

আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭ সালে স্বামীজী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মে মাসে পুনরায় আলমোড়ায় আসেন। সেবারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন গুরুভাই ও শিষ্য। মিস মূলার ও গুডউইন আগেই আলমোড়ায় এসে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের আগমনে সেবারে কুমায়ুনে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল শহরে। লালা বদ্রীসার 'টমসন হাউসের' সামনে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। হাজার হাজার নরনারী বিবেকানন্দের বাণী শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

পরের বছর ১৮৯৮ সালের মে মাসে আবার তিনি আসেন আলমোড়ায়। সেবারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দ ও তুরীয়ানন্দ এবং শিষ্য সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ। আর সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস ওলি বুল, মিস্ ম্যাকলাউড ও কলকাতার আমেরিকান কন্সাল জেনারেলের পত্নী মিসেস প্যাটারসন।

আলমোড়ায় থাকা কালিন প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণের পর স্বামীজী যেতেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের ওকলে হাউসে। সেভিয়ার দম্পতি তখন আলমোড়াতেই ছিলেন।

স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, সংস্কৃতি ও সংস্কার নিয়ে আলোচনা করতেন।

১১ই জুন আলমোড়া ছেড়ে অমরনাথের পথে রওনা হন।

[redacted]গে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম ও সেখান থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করে যান।

১৯১৮ সালে আলমোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির প্রতিষ্ঠিত হয়।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে ধ্যান, গম্ভীর হিমালয়ের কোলে শান্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ কুটির ও আশ্রম। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মাইল দু'য়েক দূরে। আর রামকৃষ্ণ কুটির থেকে একটু নীচে আশ্রম বাড়ী।

সাধুদের সাধন-ভজনের প্রার্থনা মন্দির, আবাস গৃহ, অতিথি-শালা, ভোজনাগার, গ্রন্থাগার, কলেরজল, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে।

আলমোড়া কুমায়ুনের বৃহত্তম নগরী। বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পাইন চীর দেওদার প্রভৃতি গাছে ভরা।

এখানে অনায়াসে পশম শিল্প, প্লাইউড, আসবাবপত্র, কাগজ, তার্পিন তেল, ইউক্যালিপ্টাস তেল ইত্যাদির নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।

খনিজ সম্পদও কম নয়। ম্যাগনেসাইট যা ইস্পাৎ চুল্লীর অপরিহার্য অঙ্গ তাও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এক সময় আলমোড়া ছিল নিরিবিলি শান্ত শহর। বিশ্রামের আদর্শ স্থান। কালের পরিবর্তনে এরও রূপ বদলেছে। এখন এই শহর বিরাট ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পথের সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছে। পণ্য বিকিকিনি আর লোকের ভিড়ে শহরটা এখন সব সময়ই সরগরম। কিন্তু তবুও আলমোড়া মানুষের কাছে প্রিয়। এখনও বিভিন্ন মরসুমে বহু টুরিস্ট আসে এখানে বিশ্রাম করতে।

বাস থেকে নেমেই যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়ি। অরুণের ডাকে চমক ভাঙে। তাড়াতাড়ি হাত লাগিয়ে বাসের ছাদ থেকে মালগুলো নামাই। অরুণ ও অজিত চলে যায় হোটেল ঠিক করতে।

পাহাড়ী শহর সন্ধ্যা হ লাগতে নিঝুম হয়ে পড়ে। [redacted] লোকজন কমে আসে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় আমি ও সুধেন্দু রেশন কেনার জন্যে বেরিয়ে পড়ি।

অরুণরা ফিরে আসে। অশোকা হোটেলে ঘর ঠিক করে। কুলির মাথায় মাল তুলে দিয়ে হোটেলে আসি। কিন্তু বসার উপায় নেই। ফর্দ মিলিয়ে জিনিষপত্র কিনতে হবে। দোকান-গুলোও ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই হোটেলে এসেই হাত মুখ ধুয়ে আবার বাজারে জিনিষপত্র কিনতে বেরিয়ে পড়ি। রেশনের বেশ কিছু অংশ কেনাও হয়। বাকী যা থাকে তা গরুড় বা বাগেশ্বরে কেনা হবে।

এদিকে রাত হওয়ায় হোটেলের খাবারও প্রায় শেষ। যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই রাতের খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে জিনিষপত্র গোছগাছ করতে থাকি।

ব্যানার্জিদা ও নাড়ু শুয়ে পড়ায় সেন তাদের বকাবাক করতে থাকে। বলে কাল সকালের প্রথম বাসে বাগেশ্বর রওনা হতে হবে সেদিকে খেয়াল আছে? কিন্তু ওরা নির্বিকার।

ব্যানার্জিদা একটু অলস প্রকৃতির। কাজের ভয়ে সে সব সময়ই একটা না একটা অজুহাত দেখায়। সেন কাজের ফাঁকে তাদের অনর্গল বকে চলেছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ওরা উঠে এমন কি নিজেদের মালপত্রও গোছগাছ করল না। লোকের মুখে পথের ভয়াবহতা শুনে এখন থেকেই ওরা যাব না যাব না শুরু করেছে। দত্তগুপ্তও সেই একই সুর গাইছে। অজিত ও সেন এ বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে।

আমি ওদের বলি যদি ওরা না যেতে চায় তাহলে ওদের নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হিমালয়ের পথ চলা যায় না। এতে দলের প্রত্যেকেরই ক্ষতি হয়। মনোজ ওদের বোঝাতে চেষ্টা করে। সেন তার দলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পাশের ঘরে চলে যায়। আমরা কাজ শেষ করে শুয়ে

সেনের দলের লোকেদেব এ রকম অবস্থা দেখে আমার সঙ্গী রুণ ও সুধেন্দু বিরক্তবোধ করে। আমাকে বলে কি দবকাব ছিল ওদেব সঙ্গে যোগ দেবার। এতে আমাদেবই ক্ষতি। যতসব ঝামেলা তুই ঘাড়ে নিবি। আমি হাসতে হাসতে বলি কোন চিন্তা নেই—আমবা আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী ঠিক এগিযে যাব। ওবা যায় যাবে নইলে পড়ে থাকবে। এতে আমাদেব কোন ক্ষতি হবে না।

ও ঘবে সেনদেব বোঝাপডা চলেছে। একদল বলছে ছেডে দে ওদেব। আবাব কয়েকজন বলছে এক সঙ্গে যখন এসেছি তখন সকলেই যাব। ভয পেলে কি হিমালযেব পথে হাঁটা যায। সেনেব গলাও পাওয়া যাচ্ছে। সে আমাদেব সঙ্গে যাবে। অজিত ও স্বপন ক্ষুব্ধ হয়ে আমাদেব ঘবে এসে শুয়ে পড়েছে।

অধিক বাত অবধি ওদেব আলোচনা চলে। শুয়ে শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ১ ॥

সেনেব ডাকে ঘুম ভাঙে। দু'হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘড়ি দেখি বাত সাড়ে চাবটে। এখনও সকাল হযনি। কিন্তু এটাই যেন আমাদেব কাছে সকাল। ভোবেব প্রথম বাস ধবতে হবে। অতএব দেবী না কবাই শ্রেয। তাডাতাডি উঠে বিছানাপত্র বাধা-ছাদা কবে নিই। হোটেলেব পাওনাগণ্ডা মিটিযে নীচে নামি।

কুযাশাব ঘন অন্ধকাবে সাবাটা শহব ঢাকা। পাখীব গানও কানে আসে না। পথেও কোন পথচাবী দেখি না। দোকানপাট সবই বন্ধ। কেবলমাত্র হোটেলেব কযেকজন লোক উঠে চাযেব জন্য স্টোভ ধবিযেছে। সেখানে গিয়ে বসি। অরুণ চায়েব অর্ডাব দেয। সুধেন্দু হোটেলেব লোকগুলোকে ধবে ডিম সিদ্ধ কবাব ব্যবস্থা কবে। কাল বাতেই ডিমগুলো কিনে হোটেল-ওযালাকে দেওয়া হযেছিল সিদ্ধ কবে দেবাব জন্য। খুব শক্ত কবে সিদ্ধ কবে নেওয়া হবে। ঠাণ্ডাব দেশ নষ্ট হবাব কোন সম্ভাবনা নেই।

কুলির মাথায় মাল তুলে সেনরা সদলবলে বা[redacted] এগিয়ে যায়। ব্যানার্জিদা ও নাডুকেও দেখছি সঙ্গে [redacted] চলেছে। চা খেয়ে আমরা আমাদের মালপত্র নিজেরাই নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে আসি।

আলমোড়ার বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ জমজমাট। এখান থেকে কাঠগুদাম, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, সোমেশ্বর, কৌশানী, গরুড়, বৈজনাথ, গোয়ালদাম, বাগেশ্বর, ভাডারি হয়ে মুন্সিয়ারী প্রভৃতি অঞ্চলের বাস ছাড়ে। তাছাড়া দ্বারহাট, বিনসর, পিথোরাগড়ের বাস এখান থেকে পাওয়া যায়। বেরিলী ও দিল্লীর বাসও এখান থেকে ছাড়ে।

প্রধান পথ গান্ধীমার্গ অর্ধবৃত্তাকারে শহরকে বেষ্টন করে আছে। পথের ওপরে ও নীচে কূর্মাকৃতি পাহাড়ের গায়ে গড়ে উঠেছে এই শৈলাবাস।

সকাল ৬টা। শহরের ঘুম তখনও ভাঙে নি। কুয়াশায় চারিদিক অবলুপ্ত। সুখ নিদ্রায় পাখীরা যেন মগ্ন। পাইন ও দেওদার গাছগুলো সবে যেন আড়মোড়া ভেঙে মুখগুলো বের করছে। কনকনে হিমেল বাতাস ছুটেছে। দূরের সবুজ ঢেউ খেলানো পাহাড়গুলো কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। বাস ষ্ট্যাণ্ড ফাঁকা। দোকানপাট এখনও খোলে নি। পাহাড়ী শহর। একটু বেলা হলে দোকানগুলো খোলে। তবে চায়ের দোকানে দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে। ষ্টোভের গুনগুন শব্দ যেন ভ্রমরের গুঞ্জন তুলেছে।

গোটা কয়েক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের সামনে। সেনও লাইনে রয়েছে। ব্যানার্জিদা, নাড়ু ও পান্নু একটু দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাছে কাছে আসলে কেউ তাদের কাজ করতে বলে।

ঠাণ্ডা বাতাসে শিহরণ লাগে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে যেন অস্বস্তি বোধ হয়। তাই বাস ষ্ট্যাণ্ডের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

ক্রমে ক্রমে ভোরের আলো দেখা দেয়। পূব আকাশে বক্তিম রঙের খেলা চলেছে। জেগেছে যেন আলোর ইন্দ্রধনু। মুখর হয়েছে প্রভাতী আকাশ পাখীর গানে গানে। আহা! কি অপূর্ব বর্ণালীর ছোঁয়া লেগেছে মেঘের পাখায় পাখায়। যেন নীল আকাশের গায়ে এঁকেছে সাদা আর লালের আলপনা।

সবুজ ঢেউ খেলানো পাহাড়ের পশ্চাতে ঐ দূরে দিগন্তব্যাপী তুষারাবৃত পর্বত শিখরমালায় স্পর্শ করেছে কোমল সূর্যরশ্মি। যেন গিরিরাজের ঘুম ভেঙেছে। লাল রঙের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হচ্ছে শিখর থেকে শিখরে। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখি শুধু তুষারের সুদীর্ঘ প্রাকার। যেন তরঙ্গ উদ্বেল মহাসাগর কোন জাদু প্রভাবে নীরব, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সূর্য উঠছে। স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে। প্রকৃতির ঘুম ভাঙিয়ে। ঘুম ভেঙেছে বনের। ঘুম ভেঙেছে পাহাড়ের। ঘুম ভেঙেছে শহরের।

দেখতে দেখতে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। শুভ্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে একে একে দেখা দেয় নাম্পা (২২,১৬২´), আপি (২৩,৩৯৯´), পঞ্চুলি (২০,৮৫০´, ২২,৬৫০´ ২০,১৩০´, ২০,৭৮০´, ২১,১২০´), নটলফু (২১,৪৪৬´), নন্দাকোট (২২,৫১০´), নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫´), ত্রিশূল (২৩,৪০৬´, ২২,৪৯০´, ২২,৩৫০´), নন্দাঘুন্টি (২০,৭০০´), হাতি পর্বত (২২,৩৭০´), ঘোড়ী পর্বত (২২,০১০´), কামেট (২৫,৪৪৭´), নীলকণ্ঠ (২১,৬৫০´), চৌখাম্বা (২৩,৪২০´), কচাকুণ্ডা (২১,৬৯৫), কেদারনাথ (২২,৭৭০)। পূব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত ২৫০ মাইল ব্যাপী হিমালয়ের এই মনোরম শোভা কৌশানী থেকে আরও ভাল দেখা যায়।

প্রভাতের শান্ত শোভায় নয়নে স্নিগ্ধতা আনে। নীরবে দাঁড়িয়ে দেখি সূর্যোদয়।

অরুণ ডাকে। ফিরে যাই বাস ষ্ট্যাণ্ডে।

কাউণ্টার এখনও খোলে নি। লাইন সর্পাকারে বেড়ে চলেছে। ব্যানার্জিদা এগিয়ে গিয়ে সেনকে জলখাবারের কথা বলে।

শুনেইতো সেন সিংহ-গর্জন করে ওঠে। বলে নাড়ুগোপাল এতেই সকালেই তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। আগে টিকিট কাটা হোক। তারপর সময় থাকলে খাওয়া। নইলে খাবি খাও।

ব্যানার্জিদা আবার যেন কি বলতে যায় সেন হাত পা নেড়ে তাকে ধমক দিতেই মনক্ষুন্ন হয়ে ফিরে আসে।

সকাল তখন ৭টা। সেন টিকিট কেটে আনে। বাসের নম্বর দেখে সেদিকে ছুটি। এটা ষ্টেট বাস নয়। কুমায়ুন মোটর ওনার্স ইউনিয়নের বাস। টিকিটের গায়ে সীটের কোন নম্বরও লেখা নেই। তাই তাড়াতাড়ি সকলে হুড়মুড় করে উঠে জানলার দিকে জায়গা করে। আমি, অরুণ, সুধেন্দু ও অজিত ধরাধরি করে বাসের ছাদে মাল তুলি।

আপাততঃ এ বাস যাবে বাগেশ্বর। সেখান থেকে বাস বদল করে যেতে হবে ভাড়ারি। তারপর শুরু হবে আমাদের পদযাত্রা।

বাস ছাড়তে এখনও আধঘণ্টা দেরি হবে। সেই অবসরে চায়ের দোকানে বসি। সুধেন্দু পাশের দোকান থেকে গরম সিঙ্গাড়া, জিলাপি কিনে আনে। ব্যানার্জিদার মুখে হাসি ফোটে। ক্ষিদের তাড়নায় সে যেন কাতর। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে খাবার নেয়। নাড়ু ও পানু মুচকে মুচকে হাসে। স্বপন এমন ভঙ্গিতে চা এনে দেয় যাতে সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে। চা খেয়ে বাসে উঠি।

*　　　*　　　*

সকাল তখন সাড়ে সাতটা। বাস ছাড়ে। আঁকাবাঁকা পিচ ঢালা পথ। বাঁ দিকে চঞ্চলা কোশী নদী। বক্ষে তার তরঙ্গের পর তরঙ্গ। সোনালী আলোর পরশ লাগে তাদের মাথায় মাথায়। ঝিকিমিকি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। আহা! কি মোহিনী রূপ! এ যেন স্বর্গ থেকে কে রৌপ্য প্রদীপ ভাসায় কোন অজানার উদ্দেশ্যে। আকুল করে হৃদয়। দু'চোখ ভরে দেখি মমতাময়ী প্রকৃতিকে।

শরতের নীল আকাশে সোনা ঝরা রোদ। শ্যামলিমা প্রকৃতির মুখে যেন স্নিগ্ধ হাসি। দূরে পাহাড়ের কোলে কোলে মেঘ আসে উড়ে। চূড়ায় এসে যেন থমকে দাঁড়ায়। কি যেন ভাবে। আবার দেখি পাহাড়ের গা এলিয়ে নীচে নামে। উপত্যকা ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে।

নদীর উপর পুল পেরিয়ে বাস ছোটে। শহর ছেড়ে নির্জন পথে। সমতলের দিকে। বাঁদিকে পড়ে থাকে বাণীক্ষেতের (৬০০০'/২১ মাইল) পথ। পথের ডান দিকে নদী। বাঁ দিকে পাইনের বন। নীচে গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে ছড়াছড়ি। মাথার উপর পাতায় পাতায় ডালে ডালে মেশামেশি। যেন সবুজ পাতার ঝালর ঝোলে। সকালের স্নিগ্ধ আলো পাতার ফাঁকে ঝরে পড়ে। শিশির সিক্ত দূর্বাদলে যেন মুক্ত বিন্দু ঝলমল করে।

নদীর কূল ঘেঁষে বাস চলে। তীরে সারি সারি গাছ। ক্ষেতের পর ক্ষেত। কোথাও নবীন ফসল। কোথাও সোনালী রঙের বাহার কোথাও দেখি রামদানার রঙে রাঙানো ক্ষেত। ছোট ছোট ঢেউ এসে আছাড় খায় পাথরে। যেন আলতা পরা জননী বসুন্ধরার চরণ দু'খানি ধুয়ে চলে। মন ভরে। আশ মেটে না।

পাখী ডাকে কুহুকুহু। পথের পাশে ফুলেরা হাসে। মৌমাছি গুনগুন গান ধরে। নদী ডাকে কলকল ছলছল রব তুলে। মন যে পালিয়ে বেড়ায় দূর থেকে দূরান্তরে। বাঁক ঘোরে। নদী দূরে সরে। নতুন দৃশ্য খোলে।

পাহাড়ের পর পাহাড়। স্তরে স্তরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও তার ঢালু গায়ে ধাপে ধাপে সাজানো ক্ষেত। কোথাও গভীর বনের সবুজ আচ্ছাদন। স্নিগ্ধ কোমল। দিক্‌চক্রবালে তুষার গিরিশ্রেণী। যেন নীল আকাশের নীচে আঁকাবাঁকা শুভ্ররেখা।

কখনও দেখি পথের পাশে পাহাড়ী গ্রাম। শ্লেট পাথরের ছাউনি দেওয়া কাঠ ও পাথরের তৈরী ঘর বাড়ী। কোথাও দেখি তারি ছাদে লাউ, কুমড়ো ঝোলে। কোথাও মকাই শুকায়। বাঁক

ঘুরতে সবই যেন মিলিয়ে যায়। আবার নতুন দৃশ্যপট এসে উপস্থিত হয়।

বাস নেমে চলে পাহাড়ের নীচের দিকে। পথের পাশে বড় বড় পাইন ও চীরের বন। শান্ত নীরব। শুধু বাস চলার ঘড়ঘড় কড়কড় শব্দ। যেন অবোধ দুরন্ত বালক ধ্যান মৌন অরণ্যদেবকে দেখে উপহাস করে। বনতলের স্নিগ্ধ আসর যায় ভেঙে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে। কান পেতে শুনি। সবই যেন ভাল-লাগে। ভাল লাগে নীলিমার মুখে সোনালী হাসি।

খোলা জানলার ধারে বসে আছি। দু'চোখে খালি দেখার নেশা। দেখছিও প্রাণভরে। প্রতি মুহূর্তেই যেন বিস্ময় জড়ানো।

মেঘ ভাসে নীল আকাশে। ডানা মেলে। সূর্যদেব লুকিয়ে পড়েন তাদেরই মাঝে। ছায়া নামে। দূরের ভ্যালিতে আলো খেলে। যেন মিতার সাথে মিতালী চলে। দু'চোখ ভরে দেখি শুধু পরমাসুন্দরী প্রকৃতিকে। মনের কথা বুঝতে পেরে যেন তাঁর রূপের দুয়ার খুলে দিয়েছেন।

পথ ওঠে নামে। নদী, পাহাড় কাছে আসে। দূরে সরে। মন ছুটে চলে তাদের পিছু পিছু।

স্নিগ্ধ বাতাস। পাইনের সুবাস। বনফুলের মিষ্টি চাউনি। নদীর প্রবাহ গীতি। আলো ছায়ার লুকোচুরি। সবই যেন মনে শান্তির প্রলেপ বুলায়। উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকি।

ঐ নীল আকাশে উড়েছে পাখীরা মনের আনন্দে। পাখা মেলে চলেছে তারা এদিক থেকে ওদিকে। কত বিচিত্র রঙের আলপনা এঁকেছে তারা নভস্তলে! আহা! কত তাদের আকার! ফিনফিনে পাখার ঝাপটা টেনে ভাসছে তারা বাতাসের উজানে। বসে বসে ভাবি কত কথা। অবুঝ মন যে বোঝে না। চায় সে উড়ে যেতে ঐ পাখীর দলে।

উৎরাই পথ। দূরে দেখা যায় সবুজ উপত্যকা। ঘরবাড়ী। ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। বাস থামে সোমেশ্বরে (৪৭০০'/২৬ মাইল)।

সবুজ পাহাড়ের কোলে কোশী নদী বিধৌত কমনীয়া কুমায়ুনের রমণীয়া উপত্যকা। শস্য শ্যামলা। শিবতীর্থ সোমেশ্বর। বাস স্ট্যাণ্ডের নিকটেই সোমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। ঘরবাড়ী। দোকানপাট। বাস থামবে মিনিট দশেক। যাত্রীরা অনেকেই চা খেতে নেমেছে। হাতপায়ের জড়তা কাটাতে বাস থেকে নামি।

গরম পকৌড়ি ভাজতে দেখে সুধেন্দু ও মনোজের লোভ হয়। তাড়াতাড়ি কিনে আনে।

ব্যানার্জিদা এতক্ষণ অঘোরে ঢুলছিল। যেইমাত্র পকৌড়ির নাম শোনে অমনি উঠে বসে। ঠোঙা নিমেষেই সাফ। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি হাসতে হাসতে ব্যানার্জিদাকে বলি মিনিটে মিনিটে এত ক্ষিদে পেলে হাঁটাপথে চলবে কি করে। ওখানে তো আর কথায় কথায় খাবার পাওয়া যাবে না। ব্যানার্জিদা আমার কথা শুনে আক্ষেপ করে বলে সেইজন্যই তো আমি যেতে চাচ্ছিলাম না। সেন পাশ থেকে বলে ওঠে তাহলে এলেই বা কেন? কলকাতায় বসে থাকলে তো পারতে। ঐ নধর শরীর আরও হৃষ্টপুষ্ট হ'ত। মনোজ বেগতিক দেখে ওদের সামাল দেয়। ব্যানার্জিদাকে প্রবোধ দিয়ে বলে—আরে তোমার কোন চিন্তা নেই, চিঁড়ে তো আছেই পকেটে পুরে নিয়ে হাঁটবে। ব্যানার্জিদা কোন উত্তর দেয় না। তবে ওর হয়ে নাড়ু বলে চিঁড়ের সঙ্গে একটু চিনি দিও ভাই—তাহলেই আমাদের হবে।

পেছন থেকে অজিত আমার কাঁধে হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকে। ফিসফিস করে বলে দেখছেন দীপকদা নাড়ুর কাণ্ড। কাজ করতে বললে মুখ দিয়ে একটা টুঁ শব্দ বের হয় না। সব সময় যেন না শুনি না শুনি ভাব। আর খাবারের কথা বললে—দেখুন কেমন গলার স্বর বেরিয়েছে। চিঁড়ের সঙ্গে চিনি চাই। দৈয়ের কথা বললেই হ'ত। আমি কাল রাত্রেই সেনদাকে বলে-ছিলাম ওদের নিয়ে যেতে হবে না। দেখবেন ওরা হাঁটা পথে ঠিক জ্বালাবে। কেদারনাথে যাবার সময় তো ওদের দেখেছেন। আমি

বারবার সেনদাকে বলেছি যখন ওরা যেতে চাচ্ছে না তখন নিয়ে যেও না। কিন্তু সেনদার ঐ এক কথা — এক সঙ্গে যখন এসেছি তখন এক সঙ্গেই যাব।

স্বপন ও অজিতের কথায় সায় দিয়ে, বলে শুধু ওরা কেন পানুকেও দেখো ঠিক ওদের মতই জ্বালাবে। হিমালয়ে এসেছে ও এক নাপতে ব্যাগ নিয়ে। যেন সকলের চুল দাড়ি কামিয়ে দেবে। স্বপনের কথায় উচ্চৈস্বরে হেসে উঠি। স্বপন বলে হাসবেন না। আমি যা বলছি তা ঠিকই। ও সঙ্গে গরম জামা কাপড়ই আনেনি। আমি বিস্ময়ে বলি সে কি! গরম জামা কাপড় না নিয়ে ও পিণ্ডারী যাবে! সেনকে সে কথা বলেছো। স্বপন বলে সেনদা জানে। ও সঙ্গে একটা ছেঁড়া কম্বল ও ছেঁড়া একটা সোয়েটার নিয়ে বেরিয়েছে।

স্বপনের কথায় আমি অবাক হয়ে যাই। ভাবি ঠাণ্ডার দেশে ঐ সম্বল নিয়ে পানু যাবে কি করে! তাই তাড়াতাড়ি সেনকে ডাকবার জন্য উদ্যত হতেই অরুণ ও সুধেন্দু আমাকে ধমক দেয়। বলে তোর কি দরকার আছে। আগে দেখ ওরা কি করে। নইলে আমাদের থেকেই দেওয়া যাবে। আমি চুপ করে বসে থাকি।

বাস চলেছে। চড়াই পথ। ইঞ্জিন গর্জন করে। যেন রণ উন্মাদনার দুন্দুভি বাজিয়ে কারা ছুটে চলে। বাঁকের পর বাঁক ঘোরে। নদী কোথায় যেন হারিয়ে যায়। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় ত্রিশূল শৃঙ্গমালা। সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল করে। যেন দেবাদিদেবের ত্রিনয়ন থেকে দিব্য জ্যোতিচ্ছটা ঠিকরে পড়ে।

মাথার উপর সুপ্রসন্ন সুনীল আকাশ হাসে। হিমালয়ের স্নিগ্ধ আবহাওয়া দেহ মনে অনুপ্রেরণা আনে। নয়নের রূপ তৃষ্ণা মেটায়। অন্তরে অপরূপের আভাস ফোটায়।

পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। ফিরে ফিরে তাকাই। পথের পাশে বড় বড় গাছপালার সবুজ আবরণ। দৃষ্টি রোধ করে

চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, অতি প্রশান্ত। মন যেন অতল শান্তি সাগরে তলিয়ে যায়।

মাইলের পর মাইল বাস এগিয়ে চলে। দূরের পাহাড় কাছে আসে। পিছনের পাহাড় দূরে সরে। পুরানো পরিচিত পথ। তবুও যেন নতুন লাগে। পথ যতই এগিয়ে যায় ততই যেন নতুন দৃশ্যের দুয়ার খোলে।

কোথাও দেখি রুক্ষ পাহাড়। পাথরের স্তূপ। আর তার পাশেই জড়াজড়ি করে রয়েছে বনময় সবুজ পাহাড়। কোল ভরা তার ক্ষেত। যেন শান্ত জননীর কোলে ভাই বোনে বসে বিশ্রাম করে। বেশ লাগে।

নদী কাছে আসে। কল্লোলিনী কোশীর কুলকুল ধ্বনি কানে আসে। তন্ময় হয়ে দেখি। নদীর জলেতে সূর্যরশ্মি চিকমিক করে। প্রতিবিম্বিত হয় গাছ পাহাড়। যেন জলদেবতা তাঁর নিজ দর্পণে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মুখখানি দেখেন।

বাস নেমে চলে। ধীরে ধীরে নদীর উপর পুল পেরিয়ে ওপারের রাস্তা ধরে।

অরুণ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বাসের জানলার উপর মাথা নীচু করে বসে আছে। পিঠে হাত দিয়ে ডাকি। বলি কি হ'ল? এখানেই এই। তবে পাহাড়ে হাঁটবি কি করে?

মুখ তুলে বলে ঠাট্টা করিস না। ভাল লাগছে না। গা বমি বমি করছে। হাঁটা পথ আসলে দেখবি শরীর চাঙ্গা। পা আপনি চলবে। আমি আর বিরক্ত করি না। ও চুপচাপ বসে থাকে।

সুধেন্দু আপেল কেটে দেয়। টক মিষ্টি আপেল একটানা বাস জারনিতে খেতে ভালই লাগে। কিন্তু ফালিটি এত সরু যে পুরো মাত্রায় রস আস্বাদনের সুযোগই মিলল না। চাইবার উপায় নেই—তাহলেই সুধেন্দু ধমক দেবে।

বাস চলেছে। ফুরফুরে স্নিগ্ধ বাতাস ও শীতের পাতলা রোদ এসে ছুঁয়ে যায়। দেহে আমেজ আসে। উদাস করে তোলে

মন। মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকি আকাশ পানে।

এদিকে নাড়ুর কোলে মাথা রেখে ব্যানার্জিদা দিব্যি ঘুমচ্ছে। আর ঐ বিশাল দেহ কোলে রাখার যে কষ্ট নাড়ু তা মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে।

আশ্চর্য ওদের বন্ধুত্ব!

নাড়ু একটু শান্ত প্রকৃতির। কথাও কম বলে। তবে ব্যানার্জিদার সঙ্গে ওর হরিহর আত্মা। যত কিছু মনের কথা ওর সঙ্গেই হয়। অন্য কারও সঙ্গে তেমন একটা কথা বলতে দেখি না। কেউ ওকে কাজ করতে বললে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। কিন্তু ব্যানাজিদার ফাইফরমাশ ও ঠিক মাথা পেতে করে। কি যে ব্যাপার তা বোঝাই দায়!

গতবারের এক মজার ঘটনা মনে পড়ে। গুপ্তকাশী থেকে কেদারনাথের পথে হেঁটে চলেছি। রামওয়ারা ছাড়ার পর হঠাৎ একটু দূরে দেখি দু'জন ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি করছে। পাহাড়ী পথে এরকম ঝগড়া করা ঠিক নয়। এই ভেবে দ্রুত পদ-ক্ষেপে এগিয়ে যাই। কাছে গিয়েই চক্ষু স্থির। বিশাল ভুঁড়িওয়ালা দেহ নিয়ে ব্যানাজিদা আর চলতে পারছে না। তাই নাড়ু পেছন থেকে মাথা দিয়ে গুঁতো মেরে ব্যানাজিদাকে ঠেলে ঠেলে তোলে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! না দেখলে বোঝানো যায় না।

ব্যানার্জিদা দু'হাত দিয়ে আলতো করে পাথরের উপর ভর দেয়। নাড়ু মাথা দিয়ে ঠেলে। একটু ওঠে। দম নেয়। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। মুখ দিয়ে বিকট আওয়াজ করে। বলে আর পারছিনারে নাড়ু। হয়তো বা এখানেই মরে যাব। নাড়ু নির্বিকার। আবার ঠেলা দেয়। ব্যানাজিদা থরথর করে কাঁপে। জল চায়। নাড়ু ওয়াটার বটল খুলে জল দেয়। আবার দু'পা চলে দাঁড়িয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। নিজের মনেই হাসি। পরমুহূর্তে এগিয়ে গিয়ে ব্যানার্জিদাকে ধরে একটা পাথরের উপর বসাই। একটু বিশ্রাম করে আবার হাঁটতে বলি।

[redacted] নয়। এত কাছে এসে কেদারনাথ দর্শন করবে না—ভাব[redacted] যেন মনটা খারাপ হয়ে যায়। সাহস দিয়ে বলি, চলুন সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে হাঁটুন, প্রকৃতিকে দেখুন সব কষ্টই ভুলে যাবেন। ধীরে ধীরে হাঁটে। আমি এগিয়ে যাই। ঐখানেই ওদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। অবশ্য সেবারেও ওরা সেনের দলেই ছিল। আমার গল্প শুনে সকলেই উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে। কেবল হাসে না দত্তগুপ্ত। চড়াই পথ অতিক্রম করার বর্ণনা শুনে ও যেন আতঙ্কগ্রস্ত নয়নে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চায়। কোন কিছু বলার আগেই আমি তাকে বলি কিছু ভেবো না -হিমালয়ের পথে পা বাড়ালেই দেখবে সব ঠিক হায়। কেবল মনে একটু সাহস থাকা দরকার। তবুও ও মনে মনে কি ভাবে।

ব্যানার্জিদার ঘুম ভাঙে। নাড় নির্বিকার। আমি হাসতে হাসতে বলি কি হ'ল ব্যানার্জিদা সারাটা পথ যে ঘুমিয়েই কাটালে। দেখলে না কিছু। রাতে কি ঘুম হয়নি ? তাছাড়া এই স্বল্প পরিসর জায়গায় তুমি যে ঐ ভাবে বেঁকে শুয়ে ঘুমচ্ছো সেও দেখার জিনিষ। ব্যানার্জিদা কিছু বলার আগেই সুধেন্দু বলে আরে ও কোথায় কাজ করে দেখ। সরকারী ব্যাঙ্কে। ফাইলে মাথা রেখে ঘুমনো অভ্যাস। আর এখানে তো কোলে মাথা রেখে ঘুমচ্ছে। এতো স্বর্গ সুখ।

স্বপন সুধেন্দুর কথায় সায় দিয়ে বলে ও সেইজন্যেই ব্যানার্জিদা কাজ দেখলে ভয়ে দূরে সরে যায়। আবার হাসির রোল ওঠে। ব্যানার্জিদাও হাসে। বলে না ভাই রাত্রে শোবার সময় আমার একটা পাশ বালিশ দরকার হয়। নইলে ভাল ঘুম হয় না।

সেন হাসতে হাসতে বলে তাহলে কাঁথা বালিশ আর অয়েলক্লথটা সঙ্গে নিয়ে আসলেই তো পারতে—ষোলকলা পূর্ণ হ'ত। আবার সকলে হাসিতে ফেটে পড়ে। বাস থামে কৌশানীতে (৬৬০০'/৬ মাইল)।

কৌশানী। সে তো চিত্রের জগ[illegible] অন্তঃপুরে লুকিয়ে থাকা যেন এক [illegible]দেশ। মূর্ত নয়—স্বর্গী মানুষের হাতে গড়া নয়—এ যেন প্রকৃতির লীলাভূমি।

প্রকৃতিরাণী যেন তাঁর রাজভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে সাজিয়েছেন এই শৈলপুরী কৌশানীকে। কি নেই!

দূর দিগন্তে বিস্তৃত হিমবন্তের হিমানী শৃঙ্গমালা। বনবীথির শ্যাম শোভা। উপত্যকার বুকে বঙ বেরঙের ফুলের হাসি। কোলভরা তার সবুজ ক্ষেত। গাছের ডালে বসে পাখীরা কেমন মিষ্টি মধুর সুরে ডাকে। মেঘেরা চলে পাখনা মেলে নীল আকাশে। কুয়াশা কেমন ওড়না ওড়ায়। শীতের সোনাঝরা রোদ আর মধুময় বাতাসে দু'চোখে আনে রূপের মায়া। কামনায় বাসনায় ভরে ওঠে মন। সৌন্দর্য পিপাসু পথিক আত্মহারা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে আলাপের যেন শ্রেষ্ঠ সুযোগ পায়।

বাস স্ট্যাণ্ডের একটু ওপরেই রয়েছে ডাকবাংলো, গান্ধী-আশ্রম।

শান্ত পরিবেশ। অতি পরিচ্ছন্ন সুন্দর সাজানো গোছানো বাংলো। লম্বা টানা বারান্দা। সামনে সবুজ লন। লাল-হলদে, সাদা-বেগুনে নানা মরসুমী ফুলের বাহার। যেন সবুজ গালিচার গায়ে ফুলকাটা বর্ডার আঁকা।

সামনে পাহাড়ের ঢালু গা বহু নীচে ভ্যালিতে মিলেছে। ভ্যালির ওপারে স্তরে স্তরে পাহাড়ের সারি। সবশেষে তুহিন শিখরমালা। গগনচুম্বী। দিগন্ত বিস্তারী। নীল আকাশের গায়ে যেন শ্বেতপাথরের সীমাহীন সৌন্দর্য। নয়ন ভরে।

বাস থেকে নেমেই কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি। বলাকার মত পাখা মেলে মন যেন উড়ে যায় অসীমের দিকে। পাইনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখি নৈসর্গিক প্রকৃতিকে।

পরিচিত জায়গা। তবুও মনে হয় যেন নতুন। চোখের পলকে পলকে বিস্ময় জাগায়। মন যেন মিশে যায় আকাশে বাতাসে।

নাল[illegible]াসে ভেসে· যেন নীল সাগবে পাল তুলে ছোট্ট নৌকার [illegible]হিনী। মত্তা আনন্দে। শিখব দেশেব আশপাশ ঘিবে চলে তাবই কানখানে। কখনও দেখি কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপবে ওঠে। যেন নীলিমাব সাথে চলে তাদেব মন দেযানেয়া। আলো আর আঁধারেব ছোয়া-ছুঁয়িব খেলা চলেছে ঐ পাহাডেব কোণে। গিবিবাজ যেন লুকিযে পডেছেন তাদেবই আডালে। চোখে তৃষ্ণা। আঁখি পল্লবে স্বপ্নেব অঞ্জন। মনে অভিনবত্বেব লোভ। দৃষ্টি যে সুদূবেব পিযাসী। প্রাণ যে আন-চান কবে ওঠে। আবাব কখন দেখব তুহিনোজ্জ্বল গিবিবাজকে।

ঐতো আলোব বেখা ফুটে উঠছে। মেঘেব আঁচলে আঁচলে সোনালী বঙেব আলপনা লাগছে। ঐতো চাইছেন মহামৌনী গিবিবাজ। ঢুলুঢুলু চাউনি। ক্ষণিকেই দেখি জ্যোতিচ্ছটা। শূন্য প্রাণটা আবাব যেন আনন্দে ভবে ওঠে। অতীত স্মৃতি ফিবে আসে। মনে পডে ১৯৬০ সালেব কথা। সেই আমাব প্রথম দেখা কৌশানী।

সবাবে নৈনীতাল থেকে ভীমতাল যাবাব পথে বাসে এক প্রফেসাবেব সঙ্গে আলাপ হয। কথাব মাঝে তিনি আমাদেব প্রোগ্রামটা জানতে চান। কিন্তু প্রোগ্রামেব মধ্যে কৌশানীব নাম না থাকায তিনি বিস্মযে বলেন সেকি এখানে এসেছেন অথচ কৌশানী যাবেন না। অমন প্রাকৃতিক সৌন্দয, অমন হিমালযেব শোভা না দেখেই ফিবে যাবেন! একটু নীবব থেকে বলেন ঘুবে আসুন ভাল লাগবে। ওখানে গেলে বুঝতে পাববেন জগৎ কত সুন্দব। যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই দেখবেন চিত্রশালা। কৌশানী যেন প্রকৃতিব নীল দেওযালে টাঙানো বিশ্ব শিল্পীব অঙ্কিত অনন্তমহান বঙিন ছবি। আব এই কৌশানীব রূপে মুগ্ধ হযে গান্ধীজি এক সময বলেছিলেন 'সুইজাবল্যাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া।'

সেদিন প্রফেসাব ভদ্রলোকেব কাছে কৌশানীব কথা শুনে

আমি ও আমার সঙ্গী নির্মল দত্ত যাবার পরিকল্পনা করি। দলের অন্যান্যরা ভীষণ আপত্তি জানায়। বিশেষতঃ দলের নেতা অরুণ বল্লভ ও গোবিন্দ ব্যানার্জি। পাছে পয়সা একটু বেশী খরচ হয় সেই ভেবে রাণীক্ষেত থেকেই তারা ফিরে যাবার কথা বলে। যাই-হোক সেবারেই আমরা সদলবলে এসেছিলাম কৌশানীতে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কৌশানীর রূপে সকলেই মোহিত হয়ে ছিল।

কিন্তু সেবারের একটা ঘটনা আজও স্মৃতি ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে আছে।

সেবারে হঠাৎ এখানে আসায় ডাকবাংলোয় থাকার জায়গা করতে পারিনি। তখন এখানে একটা ছোট্ট হোটেল ছিল। নাম-তার সর্বোদয় হোটেল। সেখানেই উঠি। যাত্রী নেই। ফাঁকা হোটেল। ঘরগুলো ধুলোয় ভর্তি। হোটেলওয়ালা একগোছা পাইনের ডাল এনে সেগুলো কোন রকমে ঝেড়ে দেয়। বিছানা পেতে খাটিয়াতে বসি। সেই সকালে রাণীক্ষেত থেকে বেরিয়েছি। পথেও কিছু খাওয়া হয়নি। দুপুর প্রায় সাড়ে তিনটে হয়ে গেল। খিদেও পেয়েছে। কিন্তু সে সময় কোন খাবারের দোকান ছিল না। একটি মাত্র মুদিখানা কাম চায়ের দোকান আর এই হোটেল। তাও বললেই খাবার মিলতো না। হোটেলওয়ালার পরামর্শে মুদি-খানায় যাই খাবারের খোঁজে। কিছুক্ষণ পর মুদিখানার লোকটি গরম দুধ এনে দেয়। তৃপ্তি সহকারে পান করি। কিন্তু কলকাতার লোক খাঁটি দুধ কি পেটে সয়! অনেকেরই পেট গুড়কায়।

বিকেলে ডাকবাংলোয় যাই। সেখানে এক ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি চা খাওয়ান। সূর্যাস্ত দেখে হোটেলে ফিরে আসি। হোটেলওয়ালা কোন রকমে আটা ও লাউ এনে রুটী তরকারি করে দেয়। বিকেলেই রাতের খাওয়া শেষ করে ঘরে বসি। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। অন্ধকার। ঘরে মোমবাতির আলো জ্বলে। শুয়ে শুয়ে ডায়রী লিখি। হঠাৎ হোটেলওয়ালা এসে ডাকে। দরজা খুলে দিই। ঘরে এসে বলে 'বাবুজি নাচ

দেখনে জায়েগা।

শুনে চমকে উঠি। বুঝি এখানে নাচ! ও বলে চলিয়ে না হামারা সাথ। দেখেগা হামারা গাঁওকা কেইসা নাচ গানা। বহুৎ আচ্ছা লাগেগা।

তাড়াতাড়ি উঠে ওর সঙ্গে বেবিয়ে পড়ি। এপ্রিল মাস। কিন্তু এখানে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাই চাদব মুড়ি দিয়ে পথ চলি। ধারণা ছিল বাস বাস্তাব কাছেই কোথাও নাচ গান হচ্ছে। কিন্তু হোটেলওযালা দেখি ক্রমাগত পাকদণ্ডী পথ ধবে পাহাড়ের ওপরে উঠছে। অন্ধকাব। দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝেই পাথবে হোঁচট খাচ্ছি। কখনও বা পড়েও যাচ্ছি। বনেব পথ। গা ছম-ছম করে। সাপেব ভয় হয়। কিন্তু তবুও মনে বড়ই আনন্দ। এ এক পবম অভিজ্ঞতা। সাবা দেহে বোমাঞ্চ জাগে। উৎসাহে এগিযে চলি। কখনও নিজেব পাযেব শব্দে নিজেই চমকে উঠি। ভযে দাঁড়িযে পড়ি। হোটেলওয়ালাকে ডাকি। ও কাছে আসে। হাত ধবে টেনে তোলে। খিলখিলিযে হাসে। আবাব পাহাড়েব গা বেয়ে ওঠে। অতি সন্তর্পণে পাথবেব উপব পা বেখে উঠি। কোনোটা নড়ে ওঠে। কোনোটা আবাব নীচে নামে। গড়গড় কবে গড়ায। অন্ধকাবেব বুকে যেন কামানেব গোলা ছোটে। তবুও মনে বড় আশা যাব নাচ দেখতে। পথ চলি আব মনে মনে ভাবি এ যেন চলেছি কোন বহস্য সন্ধানে। অজানা আনন্দে বুক ভবে।

পথ ওঠে। বাঁকা চাঁদেব ক্ষীণ রূপোলী আলো এসে পড়ে। কুয়াশাব ঘন অন্ধকাব। হিমেল হাওযা। চড়াই ভাঙাব ক্লান্তি কমে। ধীবে ধীবে উঠি।

হঠাৎ বন্ধুবা ডাকে। দাঁড়াই। কাছে আসে। বলে আব গিযে কাজ নেই। এ নিশীথ অভিযান এখানেই বন্ধ কব। হোটেল-ওযালাব ঐ এক ফার্লঙ আব শেষ হবে না। প্রায এক মাইলেব মত এসে গেছি— এখনো পৌছাতে পাবলাম না। আমি হাসি। বলি আমার তো বেশ মজাই লাগছে। বনেব গাঢ় অন্ধকাবে ঢাকা

পথে ঝিল্লির ঝনক, জোনাকির ঝিলমিলি আলো, ভয়—আনন্দ—নির্জনতা সবে মিলে যেন রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। এ যেন শরৎচন্দ্রের সেই শ্রীকান্ত উপন্যাসের নতুন-দাকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের থিয়েটার দেখতে যাবার কাহিনীর মত।

ওরা একটু বসে। আমি একাই এগিয়ে যাই। ফিরে ফিরে এদিক ওদিক চাই। কিন্তু সব কিছুই দৃষ্টির অন্তরালে। হঠাৎ সরসর শব্দ শুনে চমকে উঠি। ভীত মনে দাঁড়িয়ে পড়ি। ভাবি এই বুঝি কুমায়ুনের ম্যান ঈটারেব হাতে প্রাণটা গেল। ভয়ে চোখ দু'টো যেন আপনি বুজে যায়। পরমুহূর্তেই দেখি টর্চের জোরালো আলো। হোটেলওয়ালা ও আর একজন পাহাড়ী ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছেন অন্ধকার পথে আলো দেখিয়ে নিয়ে যেতে।

ভদ্রলোক কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করেন কি ভয় পেলেন নাকি! আমি ঢোক গিলে বলি তা একটু পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই বোধহয় বাঘের মুখেই পড়লাম। কথা শেষ না হতেই ওরা হো হো কবে হেসে ওঠে। আমি ওদেব মুখেব দিকে ফ্যালফ্যাল কবে চেয়ে থাকি। আশ্চর্য ওদের সাহস। অন্ধকারে পথ চলতে ওরা একটুও ভয় পায় না। বন্ধুবা এসে পড়ে। হাত দশেক উঠেই দেখি নাচের প্রাঙ্গন।

সমতলের মত সবুজ একখানি মাঠ। চারপাশ ঘিরে সারিবদ্ধ পাহাড়। সামনে হিমবান হিমালয়ের তুহিন শৃঙ্গমালা। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ে শিখরে শিখরে। যেন চূড়ায় চূড়ায় লক্ষ মানিক জ্বলে। অম্লান বদনে হাসেন গিরিরাজ। দিকে দিকে দীপ্যপান দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। দিনের বেলায় পাহাড় দেখে মনে হয় কতদূরে। আর রাতে পাহাড় যেন কাছে আসে। দু'বাহু বিস্তার করে যেন ডাকে। কোথাও কোন মেঘের অবগুণ্ঠন নেই। মনে হয় যেন নীল আকাশের নীচে হীরের পাহাড়। থাক এখন সে দৃশ্যের কথা। সেতো স্মৃতি-ভাণ্ডারে অক্ষয় অমর। যা বলছিলাম তাই বলি।

মাঠের মাঝে আগুন জ্বলে। গ্রামবাসীরা গোল হয়ে বসেছে। বুকভরা তাঁদের আনন্দ। গালভরা হাসি। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলেই এসেছে এই বন মহোৎসব দেখতে। আমরা যেতেই কয়েকজন এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। কলকাতার লোক শুনে যেন একটু খুশী বোধ করে। মাঠে বসি। শ্যামল অঙ্গনের মাঝে নাচের আসর বসেছে। সেও এক অদ্ভুত ধরনের। উপরে নক্ষত্র খচিত উন্মুক্ত আকাশ। নেই কোন আচ্ছাদন। নেই কোন বিদ্যুতের আলো, মাইকেব শব্দ। চারিদিক নিঝুম। অন্ধকাব। খালি মাঠেব মাঝে কাঠের লাল আগুন যেন আলোকস্তম্ভের মত দেখায়।

শিশুর দল আসে নাচতে। হাতে তাদেব জ্বলন্ত টর্চ। নাচে তাবা টর্চ হাতে। নাচেব তালে হাত বেঁকায় কোমব দোলায়। আবার দেখি পা কাঁপিয়ে ঝুমুরেব ঝুমঝুম ঝঙ্কাব তুলে মাঠেব চারিপাশ প্রদক্ষিণ কবে। মাঠেব এক কোণে বসে এক ভদ্রমহিলা গান গেয়ে নাচেব তালে তাল দেয়। দেখতে ভাবি মজা লাগে।

আসে নতুন দল। সাবিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। কোমবে বাঁধা জ্বলন্ত টর্চ। ছড়া গান গায়। দুলে দুলে নাচে। নির্জন প্রকৃতিব বুকে ঘুঙুরের ঝঙ্কাব যেন মধুর হয়ে ওঠে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আবাব ফিরে আসে।

কখনও দেখি গোল হয়ে বসে গান গায়। মাঝে এক তরুণী। মনে হয় কোন স্কুলেব শিক্ষয়িত্রী। খাতা খুলে টর্চেব আলোয় কি যেন পড়ে। শুরু হয় গান। হাততালি দিয়ে সুবের তাল মিলায়।

যুবক যুবতীব দল এসে ভিন্ন ভিন্ন সাবি দিয়ে দাঁড়ায়। ঢোল বাজে। বাজনার তালে তাল মিলিয়ে কোমবে হাত দিয়ে একবার এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে। দর্শকমণ্ডলী কৌতূহল দৃষ্টিতে দেখে। মাঝে মাঝে হাসে। প্রাণ খোলা হাসি। লোকসঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় আর অনাবিল হাসিতে সবুজ উপত্যকাখানি যেন মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। বেশ লাগে। বসে বসে দেখি।

রাত ক্রমে বাড়তে থাকে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বয়। হিহি করে কাঁপি। ফেরার জন্যে বন্ধুরা তাগিদ দেয়। কিন্তু তবুও যেন উঠতে ইচ্ছে করে না।

রাত তখন ৯টা। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে আসর ভাঙে। বুক ভরা আনন্দ নিয়ে ফিরে আসি।

আজ ১৯৬৯ সালের ১৯শে অক্টোবর। কিন্তু ১৯৬০ সালেব এপ্রিল মাসেব সেই সুমধুর রজনীর কথা এখনও যেন ভুলতে পারি না। মন-মুকুরে সে যেন ফুটে ওঠে।

ভেসে আসে প্রফেসার ভদ্রলোকের কাছে শোনা কৌশানীর পূর্ব ইতিহাসখানি। পরে অবশ্য উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কুয়ারি গিরিপথে' বইখানিতে পড়েছিলাম এব সেই সুন্দর জন্ম কাহিনী।

১৮৬১ সাল। লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের বড়লাট। সেই সময় তিনি এক নতুন আইন প্রবর্তন কবেন। সেই আইনের বলে হিমালয়ের পাদদেশেব কয়েকটি উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে ইংবেজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সেই কলোনীগুলো স্থাপনেব মূল উদ্দেশ্যই ছিল পরাধীন ভাবতেব বুকে ইংরেজ-শাসনের শিকড় দৃঢ় কবা। অবশ্য এতে বলা হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার বিশেষ করে সেনা বিভাগের অফিসাবদেব জন্যই এই পরিকল্পনা। এছাড়া ভারত-প্রবাসী সাহেববাও চিত্ত বিনোদনের জন্যে ঐসব অঞ্চলে যেতে পারবেন। হিমালয়েব প্রান্ত প্রদেশে এই সব ইংবেজরা প্রহরীব মত বসবাস করবেন। বিলেত থেকেও সাহেবরা আসতে পারেন পরম আনন্দে দিন কাটাতে। এক কথায় দীন দরিদ্র ভারতীয় পাহাড়ীদের উপর প্রভুত্ব চলতে থাকবে আর তাদের স্বার্থ কায়েম হবে। এই উদ্দেশ্যে বহু ইংরেজকে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি অল্প মূল্যে জমি দেওয়া হয়। চিরস্থায়ী নিষ্করস্বত্বে।

তাঁরা এই সব অঞ্চলে এসে জঙ্গল কেটে চায়ের বাগান, ফলের বাগান শুরু করেন। দেখতে দেখতে বাগানগুলো বড় হয়। তাঁরাও ধনী হয়ে ওঠেন। এই সব বাগানে স্থানীয় লোকেদের

জোর করে কাজে লাগানোর প্রথাও চালু করেন। ধীরে ধীরে ঘোড়ায় চড়বার পথ তৈরী হয়। সুন্দর সুন্দর ডাকবাংলো নির্মিত হয়। ফল, চা ইত্যাদি চালান দেবার জন্য যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করেন। এদিকে গ্রীষ্মবাসের জন্য হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে হিল স্টেশনগুলি গড়ে ওঠে। ইংরেজ সেনা নিবাস ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশী সাহেবরা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু দীন দরিদ্র পাহাড়ীরা দরিদ্রই থেকে যায়। সাহেবরা হিমালয়ের নিভৃত নির্জন অঞ্চলগুলিতে ভোগ বিলাসে দিন কাটাতে থাকেন, আর স্থানীয় অধিবাসীদের উপর শোষণ নীতি চালিয়ে যান।

এই দুর্দশা ও লাঞ্ছনার নিষ্পেষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন আলমোড়ার স্থানীয় নেতারা গান্ধীজির কাছে করুণ আবেদন জানান। ১৯২৯ সালে গান্ধীজি আলমোড়ায় আসেন। সেই সময় তিনি দশ দিন কৌশানীতে কাটান। স্থানীয় অধিবাসীদের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা শোনেন। তিনি তাদেরকে অহিংস আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। কিছু দিন পরে বাগেশ্বরে এক বিরাট জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। হাজার হাজার লোক সেদিন ঐ সভায় উপস্থিত হয়ে সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল তারা বাধ্যতামূলক এই শ্রমদান নীতি কিছুতেই মানবে না। প্রতিজ্ঞা করেছিল যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন তারা মাথা পেতে সইবে।

এই লাঞ্ছিত অধিবাসীদের ঘুমঘোর সেদিন কেটেছিল। অসীম সাহসের সঙ্গে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। তাদের সেই আন্দোলনের ফলে দুর্নীতির প্রয়োগ বন্ধ হয়।

বর্তমান ভারতেও নাকি এখনও এই নিয়ম চালু আছে। কৌশানী ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারীর লোকেরাই জমি কিনতে পারেন--স্থানীয় লোকেরা কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না।

কৌসানীর ডাকবাংলোটি তখন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের

তত্ত্বাবধানে ছিল। তাই ডাকবাংলোয় গান্ধীজির থাকার ব্যবস্থা হয়। গান্ধীজি দশ দিন এখানে থাকায় ফলে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এখানে আসার আগে গান্ধীজি কারাবাস কালে ভগবদ্‌গীতার গুজরাটি অনুবাদ শুরু করেন। কৌসানীতে বসে তিনি তার মুখবন্ধ লেখেন।

গান্ধীজি তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় কৌসানী-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি আশ্চর্য হই, নিজের দেশে এমন জায়গা থাকতে আমার দেশবাসীরা কেন স্বাস্থ্যোন্নতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে সুইজারল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটেন।

* * *

কৌশানী ছেড়ে বাস চলেছে উৎরাই পথে। চারিদিকে শ্যামলতার স্নিগ্ধ শোভা। ক্ষেতের পর ক্ষেত। মাঠে মাঠে দোলে সোনালী ফসল। রোদ ঝলমল করে। প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গ যেন রেশমী আবরণে ঢাকা পড়ে। রৌদ্রস্নাত জননী বসুন্ধরার শান্ত শোভায় মনে পরিতৃপ্তি আনে।

বাস চলে যেন সমতলের পথ ধরে। সামনে দেখা যায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা। তারি পশ্চাতে সবুজ ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি। যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথিকের প্রতীক্ষায়। যেমন রূপের জৌলুস তেমন শান্ত-নীরব।

বাঁক ঘুরতেই দেখা দেয় চিরতুহিন ত্রিশূল শৃঙ্গমালা। বিশাল—অতি বিশাল। রবিরশ্মি এসে পড়েছে ঐ শিখরদেশে। জগৎজোড়া আসন জুড়ে দেবাদিদেব যেন সমাহিত ধ্যানগম্ভীর। স্বর্ণজটাজালে সোনার আলো যেন লুকোচুরি খেলে যায়। আহা! কি অনুপম শোভা! কি রূপের গৌরব! অব্যক্ত আনন্দে মন প্রাণ যেন হিল্লোলিত হয়।

বসে বসে ভাবি বহুরূপী হিমালয় বুঝি এমনি করেই মনের কথা শোনে, এমনি ভাবেই কাছে টানে।

পথ চলেছে এঁকেবেঁকে। শ্যামল প্রান্তরের বক্ষ বিদীর্ণ করে। চারিদিকে সবুজ বৃক্ষরাজির সৌন্দর্য সুষমা। নির্মল আকাশে প্রাণবন্ত রোদের খেলা। যেন পটে আঁকা রঙিন ছবি। প্রতি বাঁকেই বিস্ময় জড়ানো।

দূরে দেখা যায় গরুড়ের ঘরবাড়ী।

সুখেন্দু ডাকে। ফিরে তাকাই। জিজ্ঞাসা করে এখন কি আমাদের কোন কিছু কেনার প্রোগ্রাম আছে? অরুণ বলে গরুড়ে আর দৌড়ঝাঁপ না করে একবাবেই বাগেশ্বর থেকে সব কিনবো। আমিও অরুণের কথায় সায় দিয়ে বলি সেই ভাল হবে—ওখানে কিনে বেঁধেছেঁদে ভাড়ারির পথে রওনা হব।

ওরা রেশন কেনার আলোচনা করে। আমি দেখি ব্যানার্জি-দাদের। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সকলকে দেখাই। নাড়ুর কোলে মাথা রেখে ব্যানার্জিদা দিব্যি ঘুমচ্ছে। নাড়ুও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও তার পিঠে মাথা রেখে তন্দ্রায় মগ্ন। আবার তাদের পাশে বসে পান্নুও ঢুলতে ঢুলতে ওদের ঘাড়ে পড়েছে। যেন চলন্ত বাসে চলেছে পিরামিড। যত দেখি ততই যেন হাসি পায়। আশেপাশের যাত্রীরাও হাসে। হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে বাস থামে। ওরা যেন ছিটকে পড়ে। ঘুম ভাঙে। বাস ভর্তি যাত্রীর আর উল্লাসের সীমা থাকে না। সকলেই পড়েছে ব্যানার্জিদার ঘাড়ে। সেতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে চাইতে থাকে। সেন হাত ধরে টানে। ব্যানার্জিদা হামাগুড়ি দিয়ে ওঠে। নাড়ু পান্নু ঝেড়েঝুড়ে বসে। বাস থেমেছে গরুড়ে (৩৫৩৮´/৯ মাইল)। সকলেই চা খেতে নামি। ওরা লজ্জায় মুখ লুকায়। অজিত ওদের ডেকে আনে।

গরুড়—এক রমণীয় উপত্যকা। প্রকৃতির আপন হাতে সাজানো। গোমতী ও গরুড় নদীর জল বিধৌত সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা উপত্যকাটি মানুষের মনে সৌন্দর্যের আকূতি জাগায়।

হিমালয়ের অন্তঃপুরে অবস্থিত এই চিত্রপট উপত্যকাটির

নয়নাভিরাম।দৃশ্যে যেন নবজীবনের আশ্বাস মেলে।

সবুজ গাছে ঘেরা মাঠ, সোনালী ধানেব ক্ষেত, শুভ্র শিখরের উজ্জ্বল দীপ্তি, নদীর কলকলানি, পাখীর কাকলি আর মনোরম আবহাওয়ার সুখস্পর্শে পথিকেব মন ভোলায়। তাইতো যুগযুগ ধরে মানুষ এসেছে এরই টানে।

সৌন্দর্যে-ভবা এই উপত্যকাটি দেখে মোহিত হয়েছিলেন সেকালেব কত্তুবী রাজারা। গড়ে তুলেছিলেন সমৃদ্ধ জনপদ - বৈজনাথ। তখন এই উপত্যকাব নাম ছিল বৈজনাথ বা কত্তুবী। আর এখন একে বলা হয় গরুড় উপত্যকা।

সেকালে গরুড় ছিল মহানগরীব প্রান্ত সীমা। আব এখন গরুড় সাবা উপত্যকাব কেন্দ্রভূমি। এখন বৈজনাথ বলতে গোমতীর তীবেব মন্দিরমালা ও মিউজিয়ামকেই বোঝায়। গরুড় থেকে বৈজনাথ ২ মাইল।

আবাব এই কত্তুবী বাজবংশেব কথা বলতে গেলে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয সহস্রাব্দেব কথাই বলতে হয়।

আর্যবা যখন আর্যাবর্ত থেকে অনার্যদেব বিতাড়িত কবাব জন্য ব্যস্ত ছিলেন সেই সময মধ্য এশিযাব কাশগড় ও খোতান থেকে আর্যদেব প্রতিবেশী খস ও শকেরা বিভিন্ন পথে কুমাযুনে প্রবেশ ক'বে আদি অধিবাসী কিবাতদেব পবাজিত ক'বে কুমাযুন অধিকার কবে। কিন্তু কিরাতদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। উভয় জাতিব মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাবা মিলেমিশে বসবাস কবতে থাকে।

এদিকে বহু শতাব্দী পবে আর্যবা যখন আর্যাবর্ত সম্পূর্ণভাবে করতলগত কবে তখন তাদের নজব পড়ে হিমালয়েব দিকে। মহাভারতের যুগে তাবা পাঞ্চাল থেকে কুমাযুনে প্রবেশ কবে। কিন্তু খসবা তাদের বাধা দেয় না। বিনা যুদ্ধেই আর্যবা কুমাযুন অধিকার করে। আর্যবাও খসদেব বিতাড়িত না কবে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে তারাও সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।

ধীরে ধীরে উভয় জাতির পৃথক সত্তা বিলুপ্ত হযে এক নতুন জাতিব উদ্ভব হয। এরাই বর্তমানে কুমায়ুনী নামে পরিচিত।

এই দুর্ধর্ষ কুমায়ুনীবা কিছুকাল পবে গাড়োয়ালের কিযদাংশ অধিকার কবে নেয। প্রতিষ্ঠা কবে স্বাধীন ব্রহ্মপুবা বাজ্য। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৬৬০ মাইল বিস্তৃত ছিল এই ব্রহ্মপুরা রাজ্য। কৈলাস মানস-সরোবব ও রাবন হ্রদ তখন এই বাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতী বাজা মোং-চন গামফো ব্রহ্মপুবা আক্রমণ করে বাজ্যেব উত্তবাংশ অধিকাব কবে নেয। সেই থেকে তিব্বতীবা কুমাযুনে দু'শ বছব বাজত্ব কবে। ৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মগধেব বাজা দেব পাল ও কনৌজ রাজ প্রথম ভোজ কুমাযুন আক্রমণ করে তিব্বতী-দেব হঠিযে দেয়। কিন্তু তাবা লিপুলেখ গিবিবত্মেব ওপাবে নিজেদের অধিকাব বিস্তাব কবতে পাবেন নি। ফলে কৈলাস তিব্বতেব অন্তর্গতই থাকে।

দেবপাল ও প্রথম ভোজেব আক্রমণেব ফলে কুমাযুন তিব্বতী-দের শাসনমুক্ত হলেও কনৌজেব শাসনাধীনে আসে। তবে প্রথম ভোজ বসন্তদেব নামে এক কুমাযুনী প্রতিনিধি [illegible] কুমাযুনেব শাসনভাব অর্পণ করেন।

৮৫০ খৃষ্টাব্দে বসন্তদেব উত্তবাখণ্ডেব শাসক নিযুক্ত হন। তিনিই কত্তুবী রাজবংশেব প্রতিষ্ঠাতা। তখন এই বাজ্যেব বাজধানী ছিল কার্তিকেযপুরে (জোশীমঠ)। বৈজনাথ বাজ্যেব পশ্চিমাংশে আঞ্চলিক শাসন কেন্দ্র ছিল। কনৌজবাজেব প্রতিনিধি হলেও বসন্তদেব নিজেকে স্বাধীন নবপতি বলে মনে করতেন। স্থানীয জনসাধাবণও তাকে বাজা বলেই মানতেন। বসন্তদেব বিশ বছব বাজত্ব করেন। তাঁব স্ত্রীব নাম ছিল সজ্জনবা দেবী।

বসন্তদেবেব মৃত্যুব পব ৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পৌত্র খবপব দেব বাজা হন। কিন্তু খবপর দেবেব পিতার কোন ইতিহাস পাওযা যায় না। যাইহোক খবপব দেব সতেবো বছব কুমাযুনে বাজত্ব কবাব পর তাঁর পুত্র অধিধ্বজ দেব ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাজা হন। তিনি আট বছব

রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লোদধা দেবী।

৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র ত্রিভুবনরাজ দেব সিংহাসনে বসেন। তিনিই সম্ভবতঃ জোশীমঠ থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এখানে আসেন। অবশ্য তাঁর পরবর্তী কয়েকজন রাজা জোশীমঠেই প্রধান কর্মস্থল করে রাজত্ব চালান। যে কোন কারণেই হোক সেই বছরই তাঁর পুত্র নিংবর্তদেব শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি বিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল নাশু দেবী।

৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র বানাশু রাজা হন। তিনি পনেরো বছর রাজ্য শাসন করেন। ৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র ইষ্টগণ দেব সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার ন্যায় পনেরো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বেগ দেবী।

৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কুমায়ুনের শাসনপদে আসেন তাঁর পুত্র ললিতসুর দেব। তাঁর রাণীর নাম লয়াদেবী। তাঁর রাজত্বকাল থেকে কুমায়ুনের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়।

এদিকে তখন কনৌজে রাজত্ব করছিলেন প্রথম মহীপাল।

ললিতসুর দেব ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একদিন দূত মারফৎ কনৌজের রাজা প্রথম মহীপালের নিকট নিজেকে স্বাধীন নরপতি-রূপে ঘোষণা করে এক বার্তা পাঠান। ললিতসুর তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী নন এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করেন।

এই সংবাদে মহীপাল ক্ষিপ্ত হলেও ললিতসুর দেবকে দমন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কারণ কনৌজ তখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্র পাল কনৌজের সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি নিজের রাজ্য রক্ষা করার দিকে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে কার্তিকেয়পুর আক্রমণ করার ক্ষমতা তাঁর কল্পনাতীত ছিল।

ললিতসুরের পর তাঁর পুত্র ভূদেব ৯৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র সলোনাদিত্য দেব পিতার সিংহাসনে বসেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সিংহবলী দেবী। তিনিও বিশ বছর রাজত্ব করেন।

১০০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র ইচ্ছট দেব রাজা হন। তিনি পনেরো বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল সিন্ধুবলী। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র দেশট দেব রাজা হন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল পদমল্ল দেবী।

১০৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র পদ্মট দেব রাজা হন। তিনিও ঠিক পনেরো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল ঈশাল দেবী। ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে সুভিক্ষরাজ দেব রাজা হন। তিনিই স্থায়ীভাবে কার্তিকেয়পুর থেকে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনিও পনেরো বছর রাজত্ব করেন।

সুভিক্ষরাজের পরে তাঁর পুত্র ইন্দ্রপাল দেব বৈজনাথের সিংহাসনে বসেন। তবে তাঁর সিংহাসন আরোহণের সাল জানা যায় নি।

ইন্দ্রপাল দেবের মৃত্যুর পর ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র লক্ষণপাল দেব রাজা হন। তিনিই বৈজনাথের বিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নির্মান করেন।

লক্ষণপাল দেবের পর ১১৫২ খৃষ্টাব্দে বৈজনাথের রাজা হন উদয়পাল দেব। তাঁর পরে বসন্তপাল দেব ও বলীনকুলপাল দেব। কিন্তু তাঁদেরও সিংহাসনে আরোহণের সাল জানা যায় নি।

১২০৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়পাল দেব বৈজনাথের রাজা হন।

পরবর্তী কত্তুরী রাজাদের ইতিহাস খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে তাঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মন্দির, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ করে বৈজনাথকে মহানগরীতে পরিণত করেন। এই বংশের শেষ রাজা সুখল দেব। তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে বৈজনাথের রাজা হন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে কত্তুরী রাজবংশের গৃহবিবাদ শুরু হয়।

ফলে কত্তুরী রাজারা দুর্বল হয়ে পড়েন। এদিকে চাঁদ রাজারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চাঁদরাজারা বারবার বৈজনাথ আক্রমণ করেন। কিন্তু চাঁদরাজারা বৈজনাথের কোন ক্ষতি করেন নি। বৈজনাথের ক্ষতি হয়েছিল রোহিলাদের কাছে। ১৭৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে রোহিলারা দ্বারহাট আক্রমণ করে বৈজনাথের দিকে অগ্রসর হয়। দ্বারহাট ও বৈজনাথকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে।

ধূমায়িত চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে গল্প করতে করতে বাসের সময় হয়ে আসে। অজিত ও স্বপনের দারুণ কৌতূহল হয়। জিজ্ঞাসা করে কত্তুরী রাজাদের রাজপ্রাসাদ কোথায় ছিল ? এখনও কি তার কোন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় ?

সেকালে গোমতীর উভয় তীরেই শহর ছিল। এখন একদিকে গরুড় অপর দিকে ক্ষেত। মাঝে মাঝে ভগ্ন মন্দির ও গ্রাম। এরই এক গ্রামের নাম তেলীহাট। সেখানেই কত্তুরী রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। এখন আর সে রকম কিছুই নেই। তবে কয়েকটি ভগ্ন মন্দির দেখা যায়। তার মধ্যে রয়েছে প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও রাক্ষস দেউলের মন্দির।

আবার এই তেলীহাট থেকে মাইল দেড়েক দূরে রয়েছে রণচুলকোট দুর্গ। সেকালে ঐখানেই কত্তুরী রাজাদের সেনা নিবাস ছিল। বর্তমানে রণচুলকোটের ভেতরে একটা কালী মন্দির আছে। নন্দাজাতের সময় সেখানে বহু তীর্থ যাত্রীর সমাবেশ হয়।

আবার রণচুলকোট থেকে আধ মাইল দূরে নাগনাথের মন্দির।

স্বপন কথার মাঝে বলে এসব জায়গায় দিন কয়েক না থাকলে ইতিহাসের পুরো রস আস্বাদন করা যায় না। সুধেন্দু তার উত্তরে বলে ফেরার পথে তো একদিন এখানে থাকার প্রোগ্রাম আছেই। চিন্তা কি ? তখনই দেখা যাবে।

আমি হাসতে হাসতে স্বপনকে বলি হিমালয়ের ইতিহাস কি একটুখানি। এর ইতিহাস জানতে হলে যে রকম মনোভাব

নিয়ে আসা প্রয়োজন—তা আমাদের মধ্যে ক'জনেরই বা আছে? একে জানতে হলে পাহাড়ীদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি নিয়ে যে অনুসন্ধান করা দরকার তা কতটুকুই বা করি। তাছাড়া সময়ের প্রয়োজন। অর্থের প্রয়োজন। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। ক'দিনের প্রোগ্রাম করে হৈ হৈ করে দেখে পালিয়ে গেলেই হয় না। দিনের পর দিন কাটাতে হয়। কারণ বহু অঞ্চলেরই খবরাখবর এখনও অলিখিত রয়ে গেছে। আমরা আসি দু'দিনের জন্য। হিমালয়কে দেখতে ও তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এতে একঘেয়েমি জীবনের সাময়িক পরিবর্তন ঘটে। মন ভরে। আশ মেটেনা। তবে বছরের এই ক'টা দিনে যা দেখি, যা শুনি—তাই স্মৃতি ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকে। সেটাই ইতিহাস।

আজ তাই মনে পড়ে পরিব্রাজক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, এ্যাটকিন্‌সনের কথা। তিনি দু'বছর ধরে (১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত) গাড়োয়াল কুমায়ুন সহ সারা উত্তর প্রদেশ পর্যটন করেছিলেন। বহু মন্দির পরিদর্শন করেন। অসংখ্য শিলালিপি, তাম্রলিপি, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করে খসজাতি, কত্তুরী, চাঁদবংশের ইতিহাস রচনা করেন। লোকগীতি, গ্রাম্যগাথা, সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতি নিয়েও অনুসন্ধান করেন। তাঁর লিখিত সেই 'The Himalayan Districts of the North Western Provinces of India (1882-1884)' গ্রন্থখানি আজ আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ।

পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদ্রী ও ধ্যানবদ্রী মন্দিরে প্রাপ্ত চারখানি তাম্রলিপি ও বাগেশ্বরে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি থেকেই কত্তুরী রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস তথা তৎকালীন গাড়োয়াল কুমায়ুনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। পাণ্ডুকেশ্বরের একখানি তাম্রলিপি ও বাগেশ্বরের শিলালিপিটি এখন নিখোঁজ। তবে এ্যাটকিন্‌সন যখন

বাগেশ্বরে এসেছিলেন তখন শিলালিপিটি ছিল। তিনি শিলালিপিটির একটি নকলও করে রাখেন।

পাণ্ডুকেশ্বরের চারখানি তাম্রলিপির মধ্যে দু'খানি ললিতসুরের আমলের। এ থেকে কত্তুরী রাজাদের বাহুবল, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

প্রথমটি থেকে জানা যায় যে ললিতসুরের হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রারোহী সেনা বাহিনী ছিল। তাঁর রাজ্যে বনরক্ষক ও গরু-মহিষ অধিকারীগণ ছিল। বণিক শ্রেষ্ঠী ও প্রজাগণ জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁর রাজসভায় যোগদান করতেন। খস, কিরাত, গৌড়, হুন, কলিঙ্গ, মেদ, চণ্ডাল, দ্রাবিড় ও অন্ধ্রদেশীয় প্রজাগণ তাঁর রাজ্যে বসবাস করতেন। রাজসভায় মাঝে মাঝে নৃত্য গীতের আসর বসত। ললিতসুর অতিশয় ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন। তিনি অলকানন্দার উত্তরতীরের তঙ্গনপুর ও অন্তরঙ্গ নামে দুইটি বিষয়ের (পরগনার) কিয়দাংশ বদ্রীনাথের ব্রাহ্মণদের দান করেন।

দ্বিতীয় তাম্রলিপিটি থেকে দু'টো স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধাচল ও কাকাস্থল। এ্যাটকিনসনের মতে কাকাস্থল হচ্ছে কেদারখণ্ডে উল্লেখিত কাকাচল (বর্তমান দেবপ্রয়াগের পূর্বনাম)। অর্থাৎ বদ্রীনাথ থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত গাড়োয়ালের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেকালে কত্তুরী রাজাদের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে এই আয়তন আরও বিস্তৃত হয়েছিল। হিমাচল প্রদেশের শতদ্রুর তীরে নিরতরের সূর্যমন্দিরে পাদুকা পরিহিত একটি সূর্যমূর্তি রয়েছে। এ ধরনের মূর্তি কত্তুরী আমলেই কেবল নির্মিত হয়েছিল। সেইজন্য মনে হয় বর্তমান হিমাচল প্রদেশের কিয়দাংশ কোন সময়ে কত্তুরী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ললিতসুরের তাম্র-লিপিতে একটি বৃষমূর্তি অঙ্কিত আছে। কুষান রাজ বাসুদেবের মুদ্রায় এই ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে।

বাগেশ্বরের শিলালিপিটি ললিতসুরের পুত্র ভূদেব কর্তৃক নির্মিত হয়। এর থেকে জানা যায় তিনি রাজা হবার চতুর্থ বর্ষে অনেক

দান করেছিলেন।

পাণ্ডুকেশ্বরের তৃতীয় তাম্রলিপিটি ত্রয়োদশ রাজা পদ্মট দেবের আমলের। এর থেকে জানা যায় তিনিও অনেক গ্রাম দান করে ছিলেন। তাছাড়া বংশ তালিকাও দেওয়া আছে। সেই তালিকায় ভূদেবের পরবর্তী রাজা রাণীদের নাম দেওয়া আছে।

* * *

গল্প করতে করতে কখন যে বাস ছেড়ে দিয়েছে তা খেয়ালই নেই। হঠাৎ দেখি বাস চলেছে গোমতীর পুল ধরে। নদীর নীল জলে ছোট ছোট ঢেউ। বাতাসের স্পন্দনে হেলে দুলে নেচে নেচে চলে তারা যেন কোন সাথীর সন্ধানে। সোনালী বালুকারাশি চিক্‌মিক্ করে। যেন চিকন শাড়ির বুকে চুমকির আলো চক্‌মক্ করে। কুলকুল ধ্বনি আর সূর্য্যালোকের ঝিলিমিলি মনকে যেন দোলা দিয়ে যায়।

নদীর নির্মল জলে ছোট ছোট মাছ খেলা করে। ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসে। থমকে দাঁড়ায়। কি যেন ভাবে। হঠাৎ বাসের শব্দে চমকে ওঠে। ভয় পায়। ছুটে পালায় অতল জলে।

ওপারে কচি ঘাসে ছাওয়া মাঠ আর শস্যভরা ক্ষেত। সবুজে শ্যামলে, লালে আর নীলে, হলুদে হলুদে যেন বিশ্ব জুড়ে রঙের আগুন লেগেছে। এপারে সিঁথি কাটা পথ। যেন পথিককে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওপারে নদীর কূলে বৈজনাথের ঘরবাড়ী। মন্দিরমালা। সারা দেহে তার বার্ধক্যের ছাপ। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যুগযুগান্তরের ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পকলার উজ্জ্বল উদাহরণ।

বাস ক্ষণিক বৈজনাথে থেমে আবার এগিয়ে চলে। কিছুদূর আসতেই দু'টো পথ চোখে পড়ে। বাঁদিকের পথটি গেছে গোয়ালদামের দিকে। সেখান থেকেই শুরু হয় রূপকুণ্ড-হোম-কুণ্ডের হাঁটাপথ।

অজানা রহস্য উদ্‌ঘাটনের অভিপ্রায়ে মানুষ ছুটেছে দলেদলে

সেই পথে। প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ বছর আগে একদল তীর্থযাত্রী নন্দাজাতের পীঠস্থান—হোমকুণ্ডে যাবার পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে রূপকুণ্ডের ধারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদেরই অস্থি-অবশেষ ও নানা নিদর্শন আজও পড়ে আছে সেই হ্রদের ধারে।

ত্রিশূল পর্বতের পাদদেশে তুষারময় অঞ্চলে অবস্থিত এই ছোট্ট হ্রদটি একদিকে যেমন মানুষের মনে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগায় অপর দিকে তেমনি দুঃখ বেদনায় অন্তর আচ্ছন্ন করে। *

থাক্ ওপথের কথা। এখন বাস চলেছে ডান দিকের পথ ধরে। বাগেশ্বর ও ভাড়ারির দিকে।

পথের দু'দিকে বড় বড় গাছের সারি। যেন সবুজ নিশান দেওয়া তোরণ দ্বারের মধ্যে দিয়ে বাস ছুটেছে। ডান দিকে নৃত্যপরা গোমতী। স্বচ্ছ নীল জলেব সাদা সাদা ঢেউতুলে চলেছে সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। কলস্বনাব কলধ্বনিতে বিভোর হয়ে উঠেছে শান্ত বনানী। যেন মুক্তিব উচ্ছ্বাস জেগেছে আকাশে বাতাসে। ভুবন জুড়ে শুধুই যেন সুবের প্রতিধ্বনি আজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। ভেসে যায় যেন আমাব মনের কথা নিযে। পলকহারা নয়নে চেয়ে থাকি।

ঝিকিমিকি আলোক বশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নদীব জলে। যেন এঁকেবেঁকে সেও চলেছে নদীর সাথে সাথে কোন অজানা দেশে। আহা কি মধুর মিলন! এযেন ভাইবোনে হাত দুলিয়ে চলেছে কোন রূপেব সন্ধানে—হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে গান। চলেছে তাবা পথিককে পথ দেখিয়ে, মন ভুলিয়ে। এরূপেব শেষ নেই, অন্ত নেই।

নদী চলে। বাস চলে। চলে মন শূন্যপথে। বাতাসে ছড়ায় ফুলের গন্ধ। আকাশে ভাসে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। যেন কলহংসীরদল ডানা মেলে উড়েছে ঐ নীল আকাশে। অগাধ সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য।

* লেথকের রূপতীর্থ রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড দ্রষ্টব্য

শরতের প্রশান্ত বাতাস। ঝলমলে রোদ। প্রকৃতির শ্যাম শোভা। স্নিগ্ধ কোমল ঘাসে ছাওয়া মাঠ। ক্ষেতের পর ক্ষেত। নদীর কলকাকলি আর পাখীর কুহরায় মাতানো বনভূমি।

কোথাও দেখি গাঁয়ের মেয়েরা আসে নদী-ঘাটে জল নিতে। কেউবা এঁটো বাসন মাজে। কেউবা নোংরা কাপড় কাচে। গুন গুনিয়ে গান করে আর জল ভরে। কোথাও দেখি রাখাল বালক গাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজায়। মাঠে মাঠে ভেড়া ছাগল চরে। কোথাও দেখি শ্রান্ত পথিক শান্ত ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে। বাঁক ঘুরতে তারাও যেন মিলিয়ে গেল। থেকে গেল শুধু রাখালিয়ার বাঁশির সুরের মিষ্টি রেশটুকু।

হঠাৎ সূর্য কোথায় পালিয়ে গেল। পথে পথে ছায়া নেমে এলো। যেন রঙ্গমঞ্চের অঙ্ক শেষে যবনিকা পড়লো।

নতুন দৃশ্য। ছায়া মণ্ডপে ঢাকা পথ ধরে বাস চলে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সাদা নীলে মেলানো আকাশ। নদীর নীল জল। নির্জন পাহাড়তলী। ছায়া নিবিড় শান্ত শোভা। তৃষিত হৃদয় যেন 'ময়ুরের মত নাচেরে।'

ক্রমে বাগেশ্বরের পথ এগিয়ে আসে। বন্ধুরা নিস্তেজ। পেছনের সীটের পাহাড়ী মেয়েটি বমি করে কাতর হয়ে পড়েছে। তাকাতে কষ্ট হয়। বাস থেকে নামতে পারলে সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। সোনালী রোদ উঠেছে আকাশ ভরে। বইছে বাতাস সুখ স্পর্শ দিয়ে। বাস থামে বাগেশ্বরে (৩০০০'/১৬ মাইল)।

হিমালয় দুহিতা সরযূ ও গোমতীর মিলন ভূমি—পুণ্যতীর্থ বাগেশ্বর।

শান্ত সবুজ পাহাড়ের কোলে পুণ্যতোয়া গোমতী ও সরযূর জল বিধৌত এক অতি রমণীয় পার্বত্য শহর। স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। দূরে গিরিশ্রেণী—ঘন সবুজ বনময়। তরুলতায় সমাচ্ছন্ন প্রকৃতির অবর্ণনীয় রূপ।

গোমতীর তীরে বাস স্ট্যাণ্ড। সারি সারি দোকানপাট হোটেল। শহরের প্রবেশ মুখে সুন্দর সুন্দর বাংলো আকৃতির ঘরবাড়ী। তবে সেগুলো বেশীর ভাগ অবসর প্রাপ্ত সৈনাধ্যক্ষদের।

বাস স্ট্যাণ্ডের অনতি দূরে সঙ্গমস্থল। দু'দিক থেকে কলকল ছলছল রব তুলে ছুটে আসে দুই নদীধারা। সরযূ ও গোমতী। দেবতনয়াদের মিলন ঘটে। সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে মিলন ভূমি।

সঙ্গমের উভয় তীরে শহরের ঘরবাড়ী। দোকান বাজার। রয়েছে ডাকবাংলো, ধর্মশালা, পোষ্ট অফিস, স্কুল কলেজ। সঙ্গমের ওপারে প্রাচীন মন্দিরমালা।

সরযূর ওপর লছমনঝোলার মত পারাপারের সুন্দর পুল পেরিয়ে যেতে হয় মন্দির দর্শন করতে। বাজারের মধ্যে দিয়ে পথ ঘুরে আসে মন্দির প্রাঙ্গণে। সঙ্গমের তীরেই বাগনাথের প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছেন বাগেশ্বর মহাদেব। আশেপাশে ছড়ানো অন্যান্য মন্দিরগুলোর মধ্যে ভৈরবনাথ, গঙ্গা-মাতা ও দত্তাত্রেয় প্রসিদ্ধ। ১৪৫০ সালে চঁদরাজা কল্যান চাঁদ এই বাগনাথের মন্দিরটি নির্মান করেন।

নদী-সঙ্গমের উভয় তীরে হরিদ্বারের মত বাঁধানো ঘাট। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে জলের ধার পর্যন্ত। এপারে মন্দির ওপারে সুন্দর সবুজ ময়দান। বসার জায়গা।

মন্দিরের প্রবেশ মুখে ঘাটের ধারে সাধুদের আশ্রম, দেবালয়। নদীর তীরে তীরে সারি সারি পাইন, চীর গাছ। ঘন শ্যাম বর্ণ।

যেন সবুজ পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ভক্তের দল।

চারিদিকে শান্তি ও নীরবতার মাঝে শুধু শোনা যায় নদীদ্বয়ের কলোচ্ছ্বাস। ঢেউয়ের পর ঢেউ ওঠে আর নামে। ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ ওর বুকে। ফেনিল জলরাশি আবার যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালিয়ে যায় দূরে। শিঞ্জনে আর গুঞ্জনে দোলা লাগে নদীর বুকে। দোল দিয়ে যায় আমার মনে: নীরবে দাঁড়িয়ে দেখি।

কথিত আছে বাগেশ্বরের সরযূর গর্ভে রয়েছে মার্কণ্ডেয় শিলা। সেই শিলায় উপবিষ্ট হয়ে ঋষি মার্কণ্ডেয় রচনা করেছিলেন দুর্গা-সপ্তসতী পুরাণ। প্রবাদ আছে এই সঙ্গমস্থলে দক্ষহিমবান তাঁর কন্যা পার্বতীর সাথে মহাদেবের বিয়ে দিয়েছিলেন। এই খরস্রোতা নদীতে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন দেহত্যাগ করেছিলেন। তাই এই সঙ্গম অতি পুণ্য।

প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে বাগেশ্বরে ভুটিয়াদের বিরাট মেলা বসে। মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত টুরিষ্টদের ভিড় হয়।

পিণ্ডারী থেকে ফেরার পথে এক রাত এখানে কাটিয়েছিলাম। সেই সময় পরিচয় হয়েছিল এক স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করেন। এককালে তাঁর অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা পড়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে গাইডের কাজ করে পয়সা উপায় করেন। মন্দির দর্শন করে আমরা যখন ঐ ময়দানের দিকে ফিরছি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমাদের এত বড় দল দেখে অপরিচিত ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে বলেন আমি একজন গাইড। আমাদের কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি বাগেশ্বরের নানা কথা বলতে শুরু করেন। ওঁর সঙ্গে বকবক করতে করতে ময়দানে আসি। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরের দিন। তবুও দশেরা উৎসবে মুখর হয়ে আছে বাগেশ্বর। ঘাটের ধারে বসি।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে ধরণীর বুকে। রাতের আবছা আলো জেগেছে আকাশে। দূর থেকে কেউ যেন আলোর

মশাল নিয়ে আসছেন এই শ্যামল সুন্দর নিভৃত নিকুঞ্জে। আলোর ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে ঐ দূর আকাশে। আলোর আভাস ছড়িয়েছে ঐ বনের আড়ালে। ঘরে ফেরা পাখীর গুঞ্জরণে মেতেছে সারাটা সঙ্গমভূমি। একটি ছু'টি করে জাগে নক্ষত্রের দীপ শিখা। যেন আকাশের কোণে জ্বলে আকাশ প্রদীপ।

চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার চন্দন মেখে। রূপসী রাত। মধুর করে তুলেছে পরিবেশখানি। শান্তির প্রলেপ বুলিয়েছে বসুমতীর অঙ্গনে। তন্দ্রালু চোখে স্মিত হাসিতে হাসছেন জগজ্জননী। আহা কি মনোহর রূপ! কি মনোরম দৃশ্য!

সরযূর একটানা আকুল করা সুর-মূর্ছনা যেন উদাসী বাউলের একতারায় আনন্দের ইশারা জাগায়। চুপ করে বসে থাকি। বাতাসে ভেসে আসে এক অপূর্ব সুরের রেশ। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির মঙ্গল শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। সে সুর প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড়ে পাহাড়ে। মূর্ছিত হয় নদীর কল-কল্লোলে।

মন্দির প্রাঙ্গনের আলোকমালা ছুলছে সঙ্গমের জলে। ভাসছে শত শত তারকার প্রতিবিম্ব। উছলে পড়েছে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ। আহা! কেমন ছুলে ছুলে চলেছে স্রোত—গান গেয়ে গেয়ে। এ যেন কমলেকামিনীর মন্দিরের ছুয়ার খুলেছে। দীপান্বিতার দীপ শিখায় উদ্ভাসিত হয়েছেন জলদেবী। বন্দনা গীতে মুখর হয়েছে আকাশ বাতাস।

মন্ত্রমুগ্ধের মত অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নদী-বক্ষে ঢেউয়ের পর ঢেউ। সাদা ফেনার হীরক দ্যুতি। ঘুরে ঘুরে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে। যেন মন্দিবা বাজিয়ে জলদেবীর আরাধনা চলে।

যত দেখি প্রাণটা যেন হুহু করে ওঠে। ক্ষণিকের দেখা এই অনন্ত আনন্দস্রোত যেন জীবনের বেলাভূমিতে বার বার ছুটে আসে। আঘাত খেয়ে আছড়ে পড়ে উচ্ছল উচ্ছ্বাসে। সেই অস্ফুট সঙ্গীতের সুর, সেই মুক্ত চূর্ণি মাখানো জলের ঢেউ স্মৃতি-ভাণ্ডারে ওঠে আর নামে। জোনাকির মত মিট মিট করে জ্বলে

আর নেভে। অন্তর যেন তলিয়ে যায় অতল অনিলে।

বেশ চুপচাপ বসেই ছিলাম। হঠাৎ ভদ্রলোকের বকবকানিতে তন্ময়তা কাটে। তিনি যতই কথা বলেন ততই মুখ দিয়ে বিকট গন্ধ বের হয়। কিন্তু এড়াবার উপায় নেই। নেশার ঘোরে আপন মনেই বলে চলেছেন—আমি সরকারী চাকরি করতাম। উপার্জনও ভাল ছিল। স্ত্রী পুত্র পরিবার সবই ছিল। কিন্তু আজ! চম্পাও নেই, রাজুও নেই! আজ আমি ভিখারি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলেন 'But I am a graduate'.

ভদ্রলোকের কথায় মন বিষাদে ভরে। বুঝতে পারি যে তাঁর স্ত্রী পুত্র উভয়ই মারা গিয়েছে। শোকে অভিভূত হয়ে তিনি চাকরিও ছেড়েছেন। আর সেই শোক ভোলবার জন্য তিনি আজ মাতাল। পাছে তাঁর অন্তরে আঘাত করে সেইজন্য জিজ্ঞাসাও করি না কিভাবে তাঁর স্ত্রী-পুত্র মারা গেল।

ক্ষণিক নীরব থাকার পর ভদ্রলোক আবার আপনা থেকেই বাগেশ্বরের পৌরাণিক কাহিনী বলতে শুরু করেন।

এক সময় ঋষি মার্কণ্ডেয় গভীর ভাবে আত্মনিগ্রহে মগ্ন হন। আর ঠিক সেই সময়ই ঋষি বশিষ্ঠ সরযূকে নীচে নামিয়ে আনছিলেন। সরযূ নামে তীব্র বেগে। এগিয়ে চলে দ্রুত গতিতে। ঋষিও তার সঙ্গে সঙ্গেই আসেন—ধীর পদক্ষেপে। পথের মাঝে সরযূ মার্কণ্ডেয়কে ঐ অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে, জল জমে এক সরোবরের আকার ধারণ করে। সরযূকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঋষিও স্তম্ভিত হন। কাছে এসে তিনিও দেখেন মার্কণ্ডেয় গভীর তপস্যায় মগ্ন। সরযূর যাত্রাপথ বন্ধ দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। মার্কণ্ডেয়র তপস্যা না ভাঙা পর্যন্ত সরযূকে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নীচে নামবার আর কোন উপায় নেই। চিন্তিত বশিষ্ঠের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে। ভেবে চিন্তে তিনি মহাদেবের স্মরণাপন্ন হন।

ভোলনাথ তো অল্পেই সন্তুষ্ট। ভক্তের আকুল আহ্বানে তো

নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। তিনি বশিষ্টেব কথা শুনে হাসেন। ক্ষণিক নীবব থেকে ডাকেন পার্বতীকে। কাছেই ছিলেন পার্বতী। স্বামীর ডাকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে নাথ? শিব হেসে বলেন সবযূব প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। আবাব তাকে সচল কবতে হবে। পাবতীও হেসে বলেন এতে আব ভাববাব কি আছে। মার্কণ্ডেয়ব তপস্যা ভেঙে দিলেইতো সবয যেতে পাববে। শিব বলেন আবে কি ভাবে ভাঙা যাবে তাব কৌশল বেব কবাব জন্যইতো তোমাকে ডেকেছি। যাক্ এখন একটা বুদ্ধি বাতলাও। পাবতী একটু আধো আধো স্বরে বলেন কেন তুমিতো ইচ্ছে কবলেই ভেঙে দিতে পাব। শিব একটু শান্ত কণ্ঠে বলেন সেতো পাবি। কিন্তু কিভাবে ভাঙবো সেটা বাতলাও। পার্বতী ক্ষণিক মাথা চুলকান। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলেন ঠিক আছে এক কাজ কবা যাক। চলো আমবা দু'জনেই যাই সেখানে। তবে নিজ নিজ বেশে নয়। আমি যাব গাভীব বেশে ঘাস খেতে আব তুমি যাবে বাঘেব বেশে। আমি যখন ঘাস খাব তখন তুমি পিছন থেকে আমাকে শিকাব কবাব জন্য ধাওয়া কববে। তাহলেই…। কথা শেষ না হতেই শিব বলেন তোফা বুদ্ধি এঁটেছো। চলো এখুনি তাহলে বেবিয়ে পড়ি।

পূর্ব পবিকল্পনা অনুযায়ী পার্বতী গাভীব রূপে ঘাস খেতে আসেন মার্কণ্ডেয়ব সাধনাস্থলে। শিবও ছুটে আসেন বাঘেব বেশে। উদ্যত হন গাভী শিকাবে। প্রাণভয়ে গাভী ছোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে। চীৎকাব কবে তাবস্ববে। মার্কণ্ডেয়ব তপস্যা ভঙ্গ হয়। চোখ খুলেই দেখেন ঐ অবস্থা। ছুটে যান গাভীটিকে বাঁচাতে। অমনি সবযূ বইতে আবম্ভ কবে। শিবও পার্বতী তখন হেসে ফেলে নিজ নিজ মূর্তি ধারণ কবেন। মার্কণ্ডেয হতভম্ব হয়ে যান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবেব কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন আজ থেকে এই অঞ্চলেব নাম হোক 'বাগেশ্বব'। তথাস্তু বলে শিব অদৃশ্য হন।

যেহেতু মহাদেব ব্যাঘ্ররূপে এখানে দেখা দিয়েছিলেন সেইজন্য একে বাগেশ্বর বলা হয়। আর এখানকার বাঘনাথের মন্দিরও সেইজন্যই প্রসিদ্ধ।

সঙ্গমের ধারে বসে নীরবে পৌরাণিক কাহিনী শুনতে শুনতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি। কি-সব আবেশে সারা শরীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফ্যালফ্যাল করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কাহিনী শেষে তিনিও নীরব হয়ে বসে থাকেন কি যেন ভাবেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলেন। মাথা যেন তাঁর নুয়ে পড়ে। আবার দেখি কেমন একদৃষ্টে চেয়ে আছেন নদীর তরঙ্গমালার দিকে। কিনারে আছাড় খাওয়া রূপোলী ঢেউয়ের মালা যেন তাঁর অতীত স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত করে। নদীর সুর মূর্ছনা তাঁকে যেন বিভোর করে তুলেছে। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। একটু দম নিয়ে ময়দানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন ১৯২৯ সালে গান্ধীজি স্বদেশী আন্দোলনে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আসেন এই ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে। কুমায়ুন হিমালয়ে তাঁর শেষ পদচিহ্ন পড়েছিল এই বাগেশ্বরে। এর পর তিনি আর যাননি। এই হিসাবে এখানকার লোকেরা এই ময়দানটিকে ভক্তির চোখে দেখে।

বলতে বলতে ভদ্রলোক কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েন। আবার দেখি আবেগ ভরে বলেন সেদিনের সে দৃশ্য, সেই ভাষণের কথা মনে করলে আজও প্রতি ধমনীতে যেন উষ্ণ রক্ত সঞ্চালিত হয়। সেদিন – আর আজ! কত ফারাক! কত পরিবর্তন। সেকথা ভাবলে আবার কৈশোরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। হায়রে অদৃষ্ট • সেকি আর ফিরে পাওয়া যাবে। কিছুই ফিরে পাওয়া যাবে না। সে চম্পাকেও আর ফিরে পাবনা। পাবনা সে রাজুকে। সবাই আমায় ছেড়ে গেছে।

ভদ্রলোকের কথায় মন বেদনায় ভরে। ইচ্ছে হয় তাঁকে

থামিয়ে দিতে। কিন্তু কথা বললে যে তাঁর মন হাল্কা হয়। তাই বাধা দিই না। সেদিন দেখেছিলাম ঐই ময়দানে লোকের ভিড়। বলেই ক্ষণিক নীরব থেকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন 'That day I was young. I promised to join hands with the national party for the freedom of our mother land'.

কিন্তু আজ! আমি ভিখারি। Will you please give me one cigarette ?

সেন সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দেয়। ধন্যবাদ জানিয়ে মৌজে টানতে থাকেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে। নিজের মনেই কি যেন ভাবেন।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে আমার পিতৃদেবের কথা মনে পড়ে। এক সময় বাবাও স্বদেশী করতেন। প্রথমে অনুশীলন পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে নামেন। বছরের পর বছর কারাবাস করেন। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাবার আগে থেকেই আমাদের পরিবারে এসেছিল। আমার ন-'দাদু অনেক দিন থেকেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও বহুবার কারাবরণ করেন।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়া কালিন বাবা বার বার কারাবাস করতে থাকায় পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হতে থাকে। দাদু তখন বাবাকে কলকাতায় নিয়ে এসে ক্যাম্বেলে ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি করে দেন। সেখানেও সেই একই অবস্থা।

কর্মজীবনেও তাঁর রেহাই ছিল না। পুলিশ রোজই বাড়ীতে টহল দিয়ে বেড়াতো। দীর্ঘ দিন কারাবাসের জন্য তিন তিনবার ডিস্পেনসারি বিক্রি করে দিতে হয়। যে ক'দিন জেল থেকে ছাড়া পেতেন তাও বাড়ীতে থাকার উপায় ছিল না। পালিয়ে বেড়াতে হ'ত। আজ ঢাকায়, কাল ময়মনসিং পরশু অন্য জায়গায়। মোটকথা সে সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁকে যেতে হ'ত। বাবার শেষ সফর কোটা ও বুন্দি।

দেশ স্বাধীন হ'ল। বাবাও রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। বাবার মত আরও যাঁরা রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ে।

গ্রীষ্মকাল। বিকেল বেলা। রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক মুটের মাথায় কুলপি মালাইয়ের বোঝা চাপিয়ে হেঁকে হেঁকে চলেছেন। বাবা পাশের ঘরের জানালা দিয়ে দেখে আমাকে বলেন ডেকে আনতো ঐ কুলপিওয়ালা ভদ্রলোককে।

ভদ্রলোক তখন বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছেন। ছুটে গিয়ে ডেকে আনি। বাবা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসেন। ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে দীর্ঘদিন হিজলী জেলে ছিলেন। বাবার মত তিনি পেনসন প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিপ্লবীদের সেই ফর্ম ভর্তি করে মাননীয় ব্যক্তিদের সুপারিশ নিয়ে সরকারী দপ্তরে জমা দিলে সরকার বিবেচনা করে দেখবেন সেই ব্যক্তিকে পেনসন মঞ্জুর করা যায় কিনা। এই ফর্ম ভর্তি করে পেনসন নিতে অনেকেই চান না। তাঁদের মতে দেশপ্রেমিক বা দেশসেবী হিসেবে নিজেকে নিজেই জাহির করলে দেশসেবী হওয়া যায় না। দেশবাসী যদি কাউকে দেশসেবী বলে মনে করে তবেই সে প্রকৃত দেশসেবী। তাই বাবা বলতেন দেশ স্বাধীন করাই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সে যখন সফল হয়েছে, আমাদেরও কাজ ফুরিয়ে গেছে।

তাই আজ সঙ্গমের ধারে বসে স্বাধীনচেতা মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে অনেক কথাই মনে পড়ে। থাক্ এখন সেসব কথা। কালের পরিবর্তনে মানুষেরও পরিবর্তন হয়। বাবাও থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন ধরে শয্যাশায়ী। তাঁর প্রবল বাসনা ছিল হরিদ্বারে দিনকয়েক কাটানোর। নিয়ে যাব বলে আমিও আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারিনি। তাই হরিদ্বারের মাটিতে পা দিলেই আমার মন বিষাদে ভরে।

পিণ্ডারী থেকে ফিরে আসার বেশ কয়েক মাস বাদে যখন ত্রৈলক্ষ্য মহারাজ ভারতে আসেন তখন একদিনের জন্য কলকাতা থেকে বহরমপুরে আমাদের বাড়ীতে যান, বাবার সঙ্গে দেখা করতে। মহারাজের আসার কথা শুনে বাবা শুয়ে শুয়ে বাড়ীর সকলকে ডেকে ডেকে কি করতে হবে বলেন। মহারাজ আসেন। দু'জনের মুখে সেদিন হাসি ফোটে। বহুদিন বাদে দেখা কত পুরানো গল্পই না হয়।

আমাদের বাড়ীতে মহারাজের আগমন নতুন কিছু নয়। তবে স্বাধীনতার পর নতুন বলে মনে হয়।

মহারাজ দিল্লী ফিরে যাবার আগে বাবাকে বলে যান 'তোকে দিল্লী নিয়ে গিয়ে একবার চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করবো।' বাবা সে কথা শুনে খুব খুশী হন।

কিন্তু দিন কয়েক বাদে হঠাৎ রেডিওতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে বাবা মূর্ছা হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরলে দেখি শিশুর মত অশ্রুধারা নেমেছে তাঁর চোখ বেয়ে। শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু তারপর। সে কথা ভাবলে আমাদের চোখে জল আসে। বলতেও যেন বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৭০ সালের ২১শে অক্টোবর বাবা দ্বিতীয় দিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এলোমেলো নানা চিন্তায় তন্ময় হয়ে বসে থাকি। মন যেন গুরু গুরু করে। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় শিউরে কেঁপে উঠি। অজিত ডাকে। উঠে ময়দানে ঘুরি।

ময়দানে এখনও দশেরার মেলা চলেছে। তবে আজই শেষ দিন। সারি সারি অস্থায়ী দোকানপাটগুলোও রয়েছে। কোথাও দেখি ম্যাজিক দেখানোর ব্যবস্থা আছে। কোথাও খাবারের দোকানে বসে লোকেরা সিনেমার হিন্দী গান শুনছে। মাঠের এককোণে যাত্রার জন্য মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। আজ লবকুশ যাত্রা হবে। লোকজনও দলে দলে আসতে শুরু করেছে। সারা-রাত ধরে নাচ গান চলবে। ভদ্রলোক তাই আমাদের জিজ্ঞাসা

করেন যাত্রা দেখবো কিনা। না বলাতে তিনি একটু বিরক্ত বোধ করেন। চেঁচিয়ে উঠে বলেন why? তাঁর কথার জবাবে অতি সংক্ষেপে বলি এ'কদিন হাঁটাপথে ঘুরেছি শরীরটাও ক্লান্ত তাই আজ বিশ্রাম নেব। উনি আবার কি বলতে যান। সেন সঙ্গে সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে একটা দু'টাকার নোট বের করে দিতেই তিনি চলে যান। যাবার আগে আর একবার যাত্রা দেখার জন্যে অনুরোধ করেন।

সন্ধ্যে তখন আটটা। কনকনে হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। বাইরে ঘুরতেও আর যেন ভাল লাগে না। তাই হোটেলে ফিরে আসি। হোটেলওয়ালা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঠাকুর চাকর সকলেই আজ যাত্রা দেখতে যাবে। আমাদের খাওয়া হলেই ওদের ছুটী। তাই আমরাও সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে যাই

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই ওরা চটপট দোকান বন্ধ করে তৈরী হয়ে নেয়। কি আনন্দ আজ ওদের মনে। সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে রাতভোর যাত্রা দেখবে। পাহাড়ী মানুষ শহরের মতো তো আর আমোদ প্রমোদ করতে পায় না। বছরে ক'টা দিন তাদের এই সুযোগ আসে। আর তারি আনন্দে ওরা বুক বেঁধে সারা বছর কাটায়। তাই ওদের আনন্দ, সাজগোজ দেখে আমাদেরও মন আনন্দে ভরে।

কম্বল জড়িয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি এই সহজ সরল পাহাড়ী মানুষের মিছিল। কেমন চলেছে তারা খুশীর মেজাজ নিয়ে ঐ ময়দানের দিকে।

পাহাড়ী শহর সন্ধ্যা লাগতেই নিঝুম হয়ে যায়। কিন্তু আজ এখানে চলেছে দশেরা উৎসব। দলে দলে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই চলেছে ঐ উৎসব প্রাঙ্গনে। অনাবিল আনন্দে তাদের মন ভরা। ময়দানও আজ প্রাণচঞ্চল। নাচ-গানে মুখর।

তাই লিখতে বসে মনে পড়ে কুলুর দশেরার কথা। বছরের ক'টা দিন সুলতানপুরের ময়দান জমজমাট হয়ে ওঠে। দোকানপাট

বসে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু লোক আসে। বিপাশার তীরে অসংখ্য তাঁবু ফেলে। মাঠের এক কোণে রঘুনাথজীর পূজোর ব্যবস্থা হয়। লোকেরা পাল্কিতে করে নিজ নিজ গ্রাম্য দেবতাদের নিয়ে আসে। বাজী পোড়ে। সারারাত ধরে নাচ গান হৈ হুল্লোড় চলে। সে এক অভিনব দৃশ্য!

* * *

বাস থেকে নামতেই হোটেলওয়ালারা যেন ছেঁকে ধরে। এ ডাকে বাবুজি হামারা হোটেল মে আইয়ে বহুৎ আচ্ছা কামরা মিলেগা। ও ডাকে আইয়ে আইয়ে বাবুজি হামারা সাথ বহুৎ বঁড়িয়া খানা মিলেগা। ওদের কথায় কান যেন ঝালাপালা হয়ে ওঠে। যতই বোঝাতে চেষ্টা করি—আমরা এখানে থাকবো না শুধু বাস বদল করতে নেমেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা নিজেদের কথাই বলে চলেছে। অবশেষে সুধেন্দু একটু রেগে গিয়ে জোরের সঙ্গে বলে আপলোক কি পাগল বান গিয়া, হাম ঠারেগা নেহি—সব আদমী পিণ্ডারী যায়েগা।

পিণ্ডারীর নাম শুনেই ওরা যেন আঁতকে ওঠে। বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে সেতো দুর্গম পথ, গভীর জঙ্গলের রাস্তা, বাঘ, ভাল্লুক সবই আছে। কাহে উধার যায়েগা?

বেড়াতে।

চমকে ওঠে। বলে বেড়াতে! উধার যানকো কৈ রাস্তাই নেহি হায়।

সুধেন্দু বলে ঠিক আছে রাস্তা থাকুক বা নাই থাকুক আমরা যাবই। আবার একজন এসে হাজির হয়। বলে বাবুজি আপলোক কি কই সরকারী কাম মে আয়া?

আমি হাসতে হাসতে বলি যে স্রেপ্ ঘুরতে এসেছি।

ঘুমনেকো লিয়ে যব আয়া তব কাহে উধার যাতা। এহিতো বহুৎ আচ্ছা জায়গা। ওর কথায় সায় দিয়ে বলি বাগেশ্বর সত্যি ভাল জায়গা। আবার দেখি ও প্রশ্ন করে তব্ এতনা পয়সা

খরচ করকে কাহে আপ্ পিণ্ডারী যারহি ?

অরুণ এবার ভীষণ রেগে গেছে। ধমক দিয়ে বলে বার বার বলা হচ্ছে যে পিণ্ডারী যাচ্ছি ট্রেপ ঘুরতে তবুও সেই এক প্রশ্ন।

সুখেন্দু ও সেন আমাদের ডাকে। বলে ওদের সঙ্গে বকে লাভ নেই। যে সমস্ত জিনিষপত্র এখনও কেনা হয় নি সেগুলো এখুনি এখান থেকে কিনে নিতে হবে। ওরা ফর্দ মিলিয়ে জিনিষ কিনতে থাকে। অরুণ বাসের খবর নেয়। বেলা দেড়টায় ছাড়বে।

সামনের চায়ের দোকানে চা-জল খাবার খেয়ে যে যার কাজে লেগে যায়। সুখেন্দু ও সেন রেশনের বস্তাগুলো বাঁধাছাঁদা করে। অজিত ও স্বপন ওদের সাহায্য করে। আমি ও অরুণ হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাই। নাড়ু, পানু ও ব্যানার্জিদার উপর বাসের টিকিট কাটার ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল ওরা তিনজনই বেডিঙের উপর মাথা রেখে দিব্যি ঘুমচ্ছে। সেনের লক্ষ্য পড়তেই চোখ তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। চীৎকার করে বলে ওহে নাড়ুগোপালের দল তোমরা কি এখানে খালি খেতে আর ঘুমতে এসেছো। তাহলেতো এখানে শুয়ে থাকলেই পার। আর গিয়ে লাভ কি। বাসে ওঠার সময় যে এগিয়ে আসছে সে দিকে খেয়াল আছে। স্নান খাওয়া কি করবেন আপনারা ?

ব্যানার্জিদা তাড়াতাড়ি উঠে স্নানের জন্য তৈরি হয়। তেল গামছা নিয়ে সকলেই গোমতীর ধারে আসি। নদী তটে ছড়ানো ছোট বড় কালো পাথর—কোনটা যেন বসবার বেদী, কোনটা যেন শোবার খাট। পা ছড়িয়ে পাথরের ওপর বসে তেল মাখি।

নদীর নীলাভ জলে ছোট ছোট ঢেউ। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ তীরের দিকে আসে আর পালিয়ে যায়। পাখার ঝাপটা টেনে জলের তরঙ্গ তুলে ছুটে ছুটে যায় এদিক থেকে ওদিকে। যেন শিশুরদল লুকোচুরি খেলে। দেখতে ভারি মজা লাগে। অপলক নয়নে চেয়ে থাকি।

নদীর নির্মল অতি শীতল জলে ডুব দিতেই শরীর যেন অসাড়

হয়ে আসে। তবুও ভাল লাগে। দেহের ক্লান্তি মেটে।

ব্যানার্জিদা তীরে দাঁড়িয়ে মাছ দেখে। ঠাট্টা করে বলি কি ব্যানার্জিদা জিবে কি জল এসে গেল নাকি? ব্যানার্জিদা ঘাড় নেড়ে বলে এগুলো ভেজে খেতে বেশ লাগে—তাই না।

খাবেন নাকি? পেলে কে না খায়। হাসতে হাসতে বলি হোটেলওয়ালাতো বলেছে মাছ ভাত খাওয়াবে। ব্যানার্জিদা বেশ খুশীর মেজাজ নিয়ে বলে তাহলে বলুন নিশ্চয়ই এই মাছই দেবে।

সেতো বটেই। তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে নিন। দেরী করবেন না। ওদিকে সেনের হয়ে গিয়েছে। দেখুন কেমন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। এখুনি হয়তো চেঁচাবে।

জলে পা ঠেকিয়েই ব্যানার্জিদা চীৎকার করে ওঠে। বলে ওঃ কি ঠাণ্ডা! এ জলে স্নান করলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। আপনারা কি করে স্নান করলেন। ওরে বাবা! অরুণ দেখছি সাবান মাখছে। নাঃ আমি আর স্নান করবো না। বরঞ্চ মাথাটা ধুয়েনি। ওরে নাড়ু তুইও যে জলে নেমে পড়লি।

ব্যানার্জিদার কাণ্ড দেখে অজিত ও স্বপন দু'মগ জল এনে ওর গায়ে ঢেলে দেয়। ব্যানার্জিদা তারস্বরে চীৎকার করে বলে মরে গেলাম মরে গেলাম। সেন ওদের তালিম দিয়ে বলে দে ভুঁড়ি-দাসকে ধাক্কা মেরে জলে নামিয়ে।

ওদের ধাক্কায় ভুড়মুর করে ব্যানার্জিদা জলে পড়ে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! যেন বিরাট পাথর গড়িয়ে পড়লো জলে। নিমেষে শান্ত জলের বুকে উঠলো সাদা ফেনায় পূর্ণ বিশাল ঢেউ। ক্ষণিকেই আবার সব মিলিয়ে গেল।

স্নান সেরে হোটেলে আসি। খেতে বসেই ব্যানার্জিদার নাক সিটকানি শুরু হয়। হোটেলওলাকে ডেকে ভীষণ বকাবকি করতে থাকে। বলে একি মছলিকা ঝোল হুয়া? এ ঝোল কি মানুষে খায়। সেতো ব্যানার্জিদার হিন্দী শুনে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্যানার্জিদার আচরণে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়। অজিত না থাকতে

পেরে ওকে ধমক দিয়ে বলে এখানে বসে কি তুমি বাড়ীর রান্না খেতে চাও। খাওয়ার যখন অতই পরিপাটি তখন পাহাড়ে এলে কেন? কলকাতায় থাকলেইতো পারতে। পাহাড়ী অঞ্চলে এর থেকে ভাল খাবার কোন মতেই আশা করা যায় না।

আমিও ব্যানার্জিদাকে বলি যদি পাহাড়ে এসে সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে না চলা যায় তবে উদ্দেশ্য সফল হয় না। আমরা হিমালয়ে আসি নৈসর্গিক শোভা দেখতে। সেটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। খাওয়া দাওয়া যতটুকু না হলে নয় সেটুকুতেই সন্তুষ্ট হতে হয়। ভাল মন্দ বিচারের সময় এখন নয়।

ব্যানার্জিদা গজগজ করতে করতে বলে তাই বলে পয়সা দিয়ে এই রকম রান্না করা জিনিষ কোন রকমেই খাওয়া যায় না।

সুধেন্দু মুচকে মুচকে হাসে। তাকাতেই বলে এ যে একেবারে দ্বিতীয় শিবনাথ দাস এসে হাজির হ'ল। অরুণ পাতের খাবার ফেলে সুধেন্দুকে জিজ্ঞাসা করে তুই কি সেই বড় সাহেবের কথা বলছিস যে পাহাড়ে এসে মাংস, ডিম, মিঠাই, বাটার টোষ্ট খেতে চায়। সুধেন্দু ঘাড় নাড়তেই ও উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে।

পাহাড়ে ঘোরা লোকেদের মধ্যে শিব দাস এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক। যে দলের সঙ্গে সে যায় সেই দলের প্রত্যেকেই তাকে নিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে দ্বিতীয়বার তাকে আর কেউ দলে নিতে চায় না। সেও আবার অন্য দল খোঁজে।

সত্যি শিব দাস এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। কলকাতায় থাকাকালিন এমন ছল চাতুরী ও কলা কৌশলের মাধ্যমে নতুন নতুন দল ধরে—তা সত্যি দেখার মত। যাবার আগে সেই দলের লোকজনের সঙ্গে এমন মেলামেশা শুরু করে যা দেখে বোঝাই যায় না যে তার সঙ্গে কারুর পাহাড়ে গিয়ে ঝগড়া হতে পারে। পাহাড়ে ঘোরা লোকেদের মধ্যে দাসের মত এত কূটবুদ্ধি সম্পন্ন লোক খুবই কম দেখা যায়।

প্রত্যেকটি দল পাহাড় থেকে ঘুরে তার নামে একটা না একটা

অভিযোগ আনেই। কখনও দেখেছি ঝুড়িঝুড়ি অভিযোগ। কিন্তু, কলকাতায় এসে তার সামনেও যদি সেই অভিযোগের কথা বলা হয়, সে গায়ে মাখেনা।

পাহাড়ে তাকে যাই খেতে দেওয়া হোক না কেন তাতেই নাক সিটকায়। রুটী দিলে বলে পাহাড়ের এই উচ্চতায় কেউ কি রুটী খেতে পারে। এখানে চাই মাংস লুচি। তাছাড়া কথায় কথায় থ্রেপটিন বিস্কুট চায়। ঘুম ভেঙে চায় বয়েলড ডিম। বাটার টোষ্ট। শেষপাতে সন্দেশ ইত্যাদি। কিন্তু কলকাতায় দেখা যায় বাবু দিব্যি গাছতলার চা, কচুরি ইত্যাদি খাচ্ছে।

একবারের এক মজার ঘটনা মনে পড়ে। সেবারে শিব দাস এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেই একই পন্থায় দলের লোকেদের মন জয় করে নিয়ে নিজের বাড়ীতে মালপত্র গোছগাছ করার বন্দোবস্ত করেছে। দলের লোকেরাও বেশ খুশী। কারণ মালপত্র গোছগাছ করতে একটু প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন হয়। কলকাতাতে ক'টা লোকই সেরকম জায়গা দিতে পারে। তাছাড়া পাঁচজনের ব্যাপার। সবসময়ই বাড়ীতে লোকের কলগুঞ্জন —ক'জনই বা সহ্য করতে পারে। তাই সে যখন নিজে থেকেই সে সুযোগ দেয় তখন আর কে ছাড়ে। দলের সকলেই এককথায় রাজী হয়ে যায়।

বেশ প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলে। লোকেরা ভাবে এবার বোধহয় শিব দাসের সঙ্গে কারুরি গণ্ডগোল হবে না।

কিন্তু অভিযান থেকে ফিরে আসার পরই শুনি এক বিচিত্র কাহিনী।

ট্রেন থেকেই নাকি শুরু হয় তাদের মধ্যে মনোমালিন্য। অভিযাত্রীর দল সাহায্য হিসাবে অনেক কিছু পেয়েছিল। তার মধ্যে গায়েমাখা সাবান, পাউডার ইত্যাদিও ছিল। সদস্যরা যখন ট্রেনে সাবানের খোঁজ করে তখন দাস নীরব। ওরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়। যাইহোক কোন রকমে ট্রেনের সফর শেষ করে স্টেশনে নামে।

পয়সার সাশ্রয় করার জন্য নিজেরাই মালপত্র ধরাধরি করে বাসের ছাদে ওঠায়। দাস পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফরমাশ করে। এতে সকলে বিরক্ত হয়। বাস থেকে নেমেও সেই একই আচরণ।

কিন্তু দাসের একটা ব্যাপাব খুবই লক্ষণীয়। সে সব সময়ই দলের নেতাকে তোয়াজ করে চলে। তার সঙ্গে এত মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে যাতে নেতা কোন রকমেই তাব প্রতি যেন বিরূপ না হয়। নেতাও তার সংস্পর্শে এসে অন্য বন্ধুদের কথা ভুলে যায়। খানিকটা জমিদাব ও তার পেয়াদার মত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জমিদারবাবু যেন পেয়াদাব কথায় ওঠেন বসেন।

যাইহোক এই ভাবে কয়েক দিন কেটে গেল। হাঁটা পথ শুরু হ'ল। যাত্রার প্রারম্ভে সকল সদস্য নিজ নিজ রুকস্যাক গোছগাছ করতে থাকে। পাহাড়ী পথে টুকিটাকি সবই সঙ্গে নিতে হয়। টর্চেরও প্রয়োজন। সদস্যবা কেউই টর্চ নিয়ে আসে নি কারণ সাহায্য হিসাবে সেটাও নাকি তাবা পেয়েছিল। তাই টর্চের খোঁজ নিতেই দাস তাদের ধমক দেয়। এতে ওবা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়।

পবেব অবস্থা আবও শোচনীয়। তেল সাবান ইত্যাদি ছাড়া আরও অনেক জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না। মাংস, ডিম এমন কি ডাক্তাব তাব ওষুধেব বাক্স খুলে বহু দামী দামী ওষুধও পাচ্ছেনা। যাইহোক কোন রকমে তাবা পাহাড় থেকে ঘুরে আসে। আবার এক মজাব ঘটনা ঘটে। কুলিদেব মাহিনা দেওয়ায় সময় অর্থেব ভীষণ টানাটানি পড়ে। নেতা ও দাস দু'জনেই যায় সাজসরঞ্জাম ফেবৎ দিয়ে ইন্সষ্টিটিউট থেকে তাদেব গচ্ছিত টাকা উঠিয়ে আনতে। প্রায় হাজাব টাকাব মত ফেরৎ নিয়ে এসে বলে এখন ও টাকা ফেবৎ পাওয়া যাবে না। কলকাতায় গেলে পাওয়া যাবে। ওনারা মনি-অর্ডাবে পাঠিয়ে দেবেন।

উপায় না দেখে সদস্যরা যথা সর্বস্ব দিয়ে একরকম অর্দ্ধাহারে কলকাতায় ফিবে আসে।

কলকাতায় ফিরে দাস নিখোঁজ। কয়েক মাস বাদে তারা

দাসকে চেপে ধরে। হিসাব চায়। কিছুই দিতে পারে না। বলে মাংস ডিম পচে গেছে। ওষুধ...। নীরব থাকে। ওরা বলে সেটাও কি সেই 'জীর্ণধন কথা' গল্পের ইঁদুরে লোহার দাঁড়ি-পাল্লা খেয়ে নেওয়ার মত? দাসমশাই চুপ করে বসে থাকে।

গল্প করতে করতে বাস স্ট্যাণ্ডে আসি। সেন ও অজিত হো হো করে হেসে ওঠে। বলে দাসমশাইকে একবার আমাদের সঙ্গে আসতে বলো না। তাহলে...। অরুণ সেনের কথা শেষ না হতেই বলে তাহলে তুই কি করবি। ঐরকম প্যাঁচালো লোকের দলে পড়ে দেখবি তুইও হাবুডুবু খাচ্ছিস। সেন একটু তাচ্ছিলের সঙ্গে বলে আরে না না। আমি থাকলে দেখবি ঐসব লোকের স্বরূপটা সকলের সামনে ঠিক প্রকাশ করে দেব। অরুণ আবার কি বলতে যায়। আমি বাধা দিই। কারণ ব্যানার্জিদা কাহিনীটা শুনে মনঃক্ষুন্ন হয়। তাই তাড়াতাড়ি ব্যানার্জিদাকে গিয়ে বলি আমি আদৌ তোমাকে উদ্দেশ্য করে গল্পটা বলিনি। সুখেন্দু হঠাৎ দাস সাহেবের কথা বলায় আমার ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। ব্যানার্জিদা সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বলে আমি তোমার গল্প শুনে একটুও রাগ করি নি। রাগ হয়েছে হোটেলওয়ালার ওপর। একেবারেই রান্না করতে জানে না। সকলেই হাসে। ব্যনার্জিদা বলে আমিতো বার বার নেতাকে হাত করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু নেতা যে আর বাগ মানে না। আমিও হাসি। বলি তাহলে তো বিসমিল্লায় গলদ। অরুণ ঠাট্টার ছলে বলে আরে নেতাকে খুশী করতে হলে ভাল মন্দ খাওয়াও। নেতার যাবতীয় খরচা বহন কর। তবে তো। তা না করে শুধু মুখে ভালবাসা দেখালে কি হয়! কিছু খরচ কর।

সেন গর্জে উঠতেই ব্যানার্জিদা বলে দেখ দেখ—নেতাকে কিছু বলারই উপায় নেই। আবার হাসির রোল ওঠে।

এদিকে বাসের সময় হয়ে আসে। মালপত্র তুলে বাসে বসি।

সুখেন্দু আবার দাসের গল্প তোলে। আমি ধমক দিই। সে বলে

গল্পটা আরম্ভ করে শেষ না করলে চলবে কেন। পুরোটা শোনাও। ব্যানার্জিদা বেশ ভাল দেয়। সুখেন্দু শুরু করে।

লোকে বলে দাসের সঙ্গে সকলেরই ঝগড়া হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়।

—ঠিক নয়! বল কি!

আরে আমি যা বলছি তা ঠিকই। গলায় গলায় ভাব আছে একজনের সঙ্গে। সে আবার কে!

আছে আছে সে সেই পঞ্চানন।

পঞ্চানন!

সুখেন্দু বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলে পঞ্চাননকে চিনলে না। সেই পঞ্চানন রায়—যাকে আমরা পাঁচু বলে ডাকি।

অজিত ও সেন একটা দমকা হাসি হেসে বলে সেই পাঁচু!

সুখেন্দু বলে শোন তাহলে এক মজার কাহিনী।

সেবারেও দাস সাহেব এক অভিযাত্রী দলে ভিড়ে পাহাড়ে গিয়েছে। ওর যা কাজ তাই করবার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু সেরকম পাত্তা সে বছর পায়নি। অনেক চিন্তা ভাবনা করে মাথায় বুদ্ধি আঁটে। কিন্তু কিছু আর করে উঠতে পারে না। দিনের পর দিন কাটে। অভিযান আর যেন শেষ হয় না। এদিকে দাস সাহেবের তো নাভিশ্বাস উঠেছে। কারণ পাঁচুকেও বলে রেখেছে যে তার সঙ্গে যাবে। তাই মাঝ পথে সে ত'র জন্য অপেক্ষা করবে। দাস এই অভিযান সেরেই ওখানে গিয়ে হাজির হবে। দিন তার ক্রমেই এগিয়ে আসছে। অভিযাত্রীদের ফেরার সময়ও হয়ে গেছে। কিন্তু পাহাড়ে হিসাব অনুযায়ী তো চলা ফেরা যায় না। কখনও সময় বেশী লাগে কখনও দিন কয়েক আগেই হয়তো অভিযান শেষ হয়।

অভিযাত্রীদের ফিরতে তখনও দিন কয়েক বাকী। দাস একদিন অতি ভোরে উঠে চম্পট দেয়। অবশ্য চলে আসার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে আসে। তাতে সে সব অভিযাত্রীকে

ধীর গতি সম্পন্ন বলে দোষারোপ করে। আর সেই জন্যই সে দলের অপেক্ষা না করে নিজের পথ ধরে। অভিযাত্রীদল সেই স্থানে ফিরে এসে সেই চিঠি দেখে অবাক। কারণ দাস পাহাড়ে হাঁটার সময় সব সময়ই পেছিয়ে থাকে। তবে সে কোন সময়ই স্বীকার করে না যে সে আর হাঁটতে পারছে না। পাছে লোকে কিছু বলে সেই জন্য সে এমন ভাব দেখায় যা সত্যি দেখার মত। দলের লোক ছাড়া অন্য কেউ দেখলে ভাববে সে পুরো দলটিকে পরিচালনা করে নিয়ে চলেছে। যেতে যেতে সুন্দর উপদেশ দেয়। রাম তুমি এগিও না। হরি ধীরে ধীরে ওঠো। ওরে জগা তুই বসলি কেন ইত্যাদি। কিন্তু দলের লোক জানে সে যদি তাঁবুতে ফিরে আসে তবে তারা ধরে নেয় সকলে পৌঁছে গেছে। তাই দলের নেতা তাঁবুতে ফিরেই খোঁজ নেয় দাস ফিরেছে কিনা। আর এবারে দাসই সেই অভিযোগ দলের লোকেদের উপর চাপিয়ে দিয়ে চম্পট দেয়।

ব্যানার্জিদা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে সুখেন্দুকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে দাস পাঁচুর জন্যে অভিযান ছেড়ে পালালো!

সুখেন্দু হাসে। বলে সেইজন্যইতো বলেছি একমাত্র পাঁচুর সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব।

কি ব্যাপার বলতো! কি আর ব্যাপার—যার সঙ্গে যার মজে মন। দাস অপরকে হাত করবার চেষ্টা করে আর রায় সাহেব দাস সাহেবকে খোশামোদ করে। খাওয়ানো, সেবা করা আরও কত কি। পাহাড়ে অভিযানের জন্য সেও ফিকির খোঁজে। একবারতো সেও অভিযানে যায়। আর সেই সুযোগ নিয়ে অফিস থেকেও বেশ কিছু টাকা সাহায্য হিসাবে আদায় করে।

—টাকা আদায় করে!

আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। সে টাকা কি আর অভিযানে খরচ হয়। সে টাকা দিয়ে জামা প্যান্ট ঘড়ি ইত্যাদি কেনা হয়। এমন কি ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটও করে।

আমি সুধেন্দুকে ধমক দিয়ে বলি কি হচ্ছে কি? তুই যে বাসে বসে গল্পদাদুর আসর বসালি। মুখরোচক গল্পের পাছে তাল কেটে যায় তাই স্বপন ও অজিত আমাকে উল্টে প্রতিবাদ করে।

সুধেন্দু হাসে। বলে দাসমশাই এরকম কাণ্ড অনেকবারই করেছে। একবার তার এক বন্ধু পাহাড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাস তাকে সেইখানেই ফেলে পালায়। এমন কি তার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাবারও রাখে না। সে ব্যাচারিতো মহাবিপদে পড়ে।

খাবারের কথা শুনেই ব্যানার্জিদা সেন ও মনোজকে বলে দেখো ভাই আমি যেন খাবারের ব্যাপারে ফাঁকি না পড়ি। হাসিতে সকলে ফেটে পড়ে। বাস ছাড়ে।

*　　　*　　　*

বাগেশ্বর ছেড়ে চলেছি এখন ভাড়ারির দিকে। সেখান থেকে হাঁটাপথ ধরে এগিয়ে যাব পিণ্ডারীর দিকে। পথের মধ্যে মধ্যে ডাক বাংলো আছে। সেই জন্য থাকার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আগে থেকে সেগুলো বুক না করতে পারলে একটু অসুবিধা হতে পারে। আমরা কলকাতা থেকে চিঠি লিখে সেগুলোর পারমিট পেয়েছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ ট্রেন লেট থাকায় নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম থেকে একদিন পিছিয়ে পড়েছি তাই ইচ্ছে আছে হাঁটাপথে সেটা মেকাপ করে নেব।

সরযূ নদী ধরে বাস চলেছে। মাঝে মাঝে চড়াই আর উৎরাই। পাহাড়গুলো কখনও কাছে আসে। কখনও দূরে সরে। কখনও নদী এগিয়ে আসে। তার জলধ্বনির সঙ্গীতে দেহ মন চাঙ্গা করে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নদী যেন ডাকে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে জলের ওড়না উড়িয়ে নাচে যেন কোন পাগলিনী মেয়ে। স্বচ্ছ সবুজ জলের বুকে সাদাসাদা ঢেউ তুলে হাসে সে—খিলখিলিয়ে।

সোনালী বালি, কৃষ্ণকালি মাছ, সাদা ফেনামাখা ঢেউ, সবুজ

জলরাশি—সবাই যেন ডাকে। অস্ফুট ছন্দে যেন বলে আয়রে—আয়রে ভাই আমাদের সাথে। মন যেন কেমন করে ওঠে। হতভম্ব হয়ে বসে থাকি।

আবার কোথায় যেন তারা পালিয়ে যায়। বনবীথির মধ্যে দিয়ে বাস চলে।

আলো-ছায়া মাখা পথ। বাতাসের মৃদু হিল্লোলে পত্র পল্লবে যেন ঝিরঝির সিরসির এক মধুর সঙ্গীতের ছন্দ ফোটে। ছায়া নিবিড় গাছের কোটরে বসে পাখী ডাকে—কুব কুব রব তুলে।

সোনালী রোদ হাসে। মাঠে মাঠে নবীন ফসল দোলে। যেন শ্যামল কনক রঙের বিচিত্রিত বসনে, বিলাসিনী বিনম্র বালিকা বধু বিনোদিনীর সাথে বসে বিমুগ্ধ নয়নে বাক্যালাপ করে।

আঁকাবাঁকা পথ। দু'দিকে গাছের সারি। ঘন সবুজের সমারোহ। পথের পাশে গ্রাম। কয়েকখানি চালা। ঘরের ছাদে ও উঠানে বিছানো শস্য। রোদে শুকাচ্ছে। কোথাও দেখি দাওয়ায় বসে মেয়েরা কুলোয় করে শস্য ঝাড়ছে। কোথাও দেখি পাহাড়ী মেয়েরা কাঠ কুড়ায়। কেউবা ঘাসের বোঝা বাঁধে। কোথাও দেখি পুরুষেরা জমিতে লাঙল দেয়। মেয়েরা শস্য কাটে। কাজের ফাঁকে বিড়ি টানে। গাল ভরা ধোঁয়া ছাড়ে। কেউবা আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চায়। কি যেন ভাবে। সরম লাগে। লজ্জার হাসিতে এ ওর ঘাড়ে মুখ লুকায়। দেখতে ভারি ভাল লাগে। ফিরে তাকাবার আগেই বাসের গতিতে তারাও যেন মিলিয়ে যায়।

বাস চলেছে। ধুলো উড়ছে যেন পিছন ধেয়ে। সারা শরীর ধুলোয় ধূসর। তবুও যেন মজা লাগে। গাড়ী নাচে। গোঁ গোঁ শব্দ তোলে। অরুণের ভাত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। দূরে দেখা যায় পাহাড়ী গ্রাম। সারি সারি চালা। বেলা তখন সাড়ে তিনটে বাস পৌঁছায় ভাড়ারিতে (১৬ মাইল)।

॥ ৪ ॥

প্রাণময়ী স্বচ্ছ সলিলা সরযূর কোলে ভাড়ারি এক পাহাড়ী গ্রাম। সবুজ গাছের শান্ত শ্যামলিমা আর নদীর ঘুম পাড়ানি গানে মুখরিত গ্রামখানি মানুষের মনে মুক্তির উচ্ছ্বাস জাগায়।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা নির্জন পরিবেশ।

নদীর কূলে কূলে পাইন ও দেওদারের বন। বিশাল তাদের আকার। গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোকের ঝিলিমিলি, ডালে ডালে শাখে শাখে বসে পাখীরা মিষ্টি মধুর সুরে ডাকে। মন মাতায়। প্রাণ জুড়ায়।

পিণ্ডারী যাবার পথে বাস রাস্তার এটাই শেষ সীমা। এবার শুরু হবে আমাদের পদযাত্রা। অবশ্য এখান থেকে বাসে শ্যামাধুরা (৪৮৫০´/১৮ মাইল) যাওয়া যায়। তবে বর্তমানে বাস আরও ১২ মাইল পথ এগিয়ে মুনসিয়ারি পর্যন্ত যাচ্ছে।

বাস স্ট্যাণ্ডের গায়েই সারি সারি দোকানপাট। হাঁটা পথের টুকি-টাকি সব জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। তাছাড়া চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি তো আছেই। তবে দাম একটু বেশী।

বাস থেকে নামতেই ঘোড়াওয়ালা ও কুলির দল এসে এমন ভাবে ছেঁকে ধরে যেন মনে হয় এখুনি আমাদের রওনা হতে হবে। কিছু বলার আগেই দেখি ওদেব সরিয়ে দিয়ে একজন সামনে এসে নমস্কার জানিয়ে বলে ম্যায় লক্ষ্মণ সিং।

লক্ষ্মণ সিং এ অঞ্চলের গাইড তথা কুলিদের এজেন্ট। পরিচয় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একগোছা কাগজ বের করে দেখায়। তার মধ্যে থেকে দেখি কলকাতার মাউন্টেনীয়ার্স ক্লাবের থারকোট অভিযানের নেতা সুনীল চৌধুরীর দেওয়া একটা সার্টিফিকেট। ১৯৬৯ সালে ঐ অভিযান সংগঠিত হয়। তবে থারকোট অভিযান সফল হয়নি। অভিযাত্রী দল এক অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

লক্ষ্মণ সিং এর সঙ্গে পরিচয় হাওয়ায় খানিকটা আশ্বস্ত হই। তবে তাকে বলি আমরা অভিযাত্রী নই। সে অভিজ্ঞতাও

আমাদের নেই। আমরা এসেছি পিণ্ডারী হিমবাহ দেখতে।

ও মৌজে সিগারেট টেনে বলে কুলিতো নেবেন।

আমি হাসতে হাসতে বলি সে তো নিশ্চয়ই। কুলি ছাড়া ও পথে যাব কি করে।

অরুণ এগিয়ে এসে লক্ষ্মণ সিংকে বলে আগে থাকার ব্যবস্থা করি পরে সব কথা হবে।

লক্ষ্মণ সিং একগাল হেসে বলে ঠিক ঠিক বাবুজি। পরেই সব কথা হবে।

কাপকোটের বাংলো কতদূর জিজ্ঞাসা করায় সে আমাদের নিয়ে চলে। ভাড়ারি থেকে আধ মাইল মত হবে। সরযূর উপর পুল পেরিয়ে ওপারের রাস্তা ধরি। বাঁদিকে নদীর খাদ। ডানদিকে ক্ষেতখামার। গ্রামের ঘর বাড়ী। নদীর ধারে ধারে ইতস্ততঃ ফুলের বাহার। কোথাও দেখি গাঁদা ফুলের সমারোহ। কোথাও লতানে গোলাপ, সূর্যমুখী, কসমসের বিচিত্র বাহার। গাছের ডালে বসে সাদা কালো ডোরাকাটা ছোট ছোট পাখী শিস দেয়। পায়ের শব্দে এস্ত হয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় নীল আকাশের বুকে। ক্ষণিকের সৌন্দর্যের ছটায় মন যেন আকুল হয়ে ওঠে। আনন্দে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাই।

পথ চলে এঁকেবেঁকে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে। চারিদিক সবুজে সবুজ। ক্ষেতের পর ক্ষেত। যেন প্রকৃতির গায়ে জড়ানো শ্যামল উড়নি। আলপথ ধরে এঁকেবেঁকে চলি। মন যেন দুলে দুলে ওঠে। স্নিগ্ধ বাতাস। নদীর কলধ্বনি। প্রকৃতির শ্যামলতা ক্লান্ত মনে পুলক জাগায়।

ছায়া নিবিড় পথ। কত সুন্দর। কত সুখকর। নদীর কিনার ধরে চলি। দূরে দেখা যায় বাংলোখানি। যেন সবুজ পাইনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে কোন এক রহস্যময় রাজপ্রাসাদ।

যত এগিয়ে যাই ততই যেন ভাল লাগে। কোথাও দেখি কুটিরের ছাদে লাউ, কুমড়ো ঝোলে। কোথাও দেখি শাক সবজির

ক্ষেত।. কখনও কানে আসে মুরগীর কোঁকড়কো ডাক। কখনও দেখি পাহাড়ী ছেলে মেয়ে পিছু নেয়। অবাক হয়ে আমাদের দেখে। হাসে। ফিরে তাকাতেই থমকে দাঁড়ায়। আবার পিছু পিছু আসে।

কাপকোট এক প্রাচীন জনপদ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৭৫০´ উঁচুতে অবস্থিত। কয়েক হাজার লোকের বাস। কৃষি কাজই এদের প্রধান উপজীবিকা। ধান, গম, আলু আর নানান শাক সবজির চাষ হয়। ঘরে ঘরে গরু মহিষ, ছাগল ভেড়া, মুরগীও রয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ওরা আলমোড়ার বাজারে চালান দেয়। ছিমছাম সুন্দর গ্রামের ঘর বাড়ী। চারিদিকে যেন শান্তির প্রলেপ টানা।

কাপকোটে একটা ছোট হাসপাতাল আছে। সময় সময় আলমোড়া ও রাণীক্ষেত থেকে ডাক্তার সার্জেনরা আসেন। চিকিৎসা করতে। কোন কোন সময় অপারেশানও হয়। পোষ্ট অফিস, সারি সারি দোকান বাজার—সবে মিলে একে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সরযূর প্রবাহগীতি আর প্রকৃতির শ্যামল শোভায় একে চিত্রের ন্যায় সুন্দর করেছে। প্রকৃতিরাণী এখানে যেন সদা হাস্য মুখে বিরাজ করেন।

বাংলোয় আসি। লক্ষ্মণ সিং চৌকিদারকে ডাকতে যায়।

সুন্দর বাংলো। সামনে শ্যামল কোমল ঘাসে ছাওয়া মাঠ। ফুলের বাগান। সৌরভে আমোদিত পরিবেশ। নীচে সরযূর চঞ্চল প্রবাহ। উচ্ছল উল্লোলিত। চারিদিকে সারি সারি পাহাড়। যেন একে অপরকে জড়িয়ে আছে। কোনটা ধূসর, কোনটা কালো, কোনটা সবুজ। যেন দিগন্তব্যাপী শত রঙের আলপনা আঁকা। তাদের কোল জোড়া কৃষিক্ষেত। ধাপে ধাপে নেমে এসেছে সমতলের দিকে। শস্য শ্যামলা। যেন সাজানো বাগান। তারি মাঝে আঁকাবাঁকা গ্রামের পথরেখা।

মানুষের কোলাহল নেই, আছে নদীর কলতান। পাতাঝরার আওয়াজ। আর হাওয়ায় ভেসে আসা কত সুরের প্রতিধ্বনি।

পাখী ডাকে। নানান সুরে। দূরে দেখি রাখাল ছেলে চরায়

ধেনু। কালো সাদা ডোরাকাটা কত তাদের রঙ। ছোট ছোট গরু। গলায় তাদের ঘণ্টা বাঁধা। কচি কচি ঘাসের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। টুং টুং ঘণ্টা বাজে। যেন সুরের লহরি তোলে। যত দেখি ততই যেন হারিয়ে যাই প্রকৃতির রূপের মাঝে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। অপলক নয়নে চেয়ে থাকি শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে। জননী বসুন্ধরা যেন স্মিত হেসে পথিকের মন ভোলান।

মাঠে মাঠে ধান। বনফুলে সাজানো বনভূমি।

গাঁয়ের মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করে। ফসল তোলে। কত তাদের গালভরা হাসি। কি মিষ্টি চাউনি। যেন প্রাণের কথা শোনায়।

ঘুরে ফিরে দেখি বাংলোটিকে। যেন সবুজের প্রচ্ছদপটে ছবির মত আঁকা। আলো আর ছায়া। কুয়াশা আর রোদ যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে তাকে। যেন চলেছে আমার মন নিয়ে ঐ নীল আকাশের দিকে।

এই মধুর পরিবেশে নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি। লক্ষ্মণ সিং চৌকিদারকে নিয়ে আসতেই চমক ভাঙে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পারমিটখানি বের করে বলি গতকাল আমাদের আসার কথা ছিল। কিন্তু একদিন দেরী হয়ে গেছে। আর আজও যখন বাংলোখানি খালি পড়ে আছে তখন ঘর দু'টো যদি আমাদের দাও তাহলে খুবই ভাল হয়।

চৌকিদার মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে আজতো ডাক্তার সাহেব আয়েগা। আপকো ঠারনেকো জায়গা দেনা মুশকিল হায়।

আমি তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতো হয়ে আসছে আর কি আজ তোমার ডাক্তার সাহেব আসবে?

সে একটু চিন্তিত হয়ে বলে যদি না আসে তাহলে আমি আপনাদের ঘর খুলে দিতে পারি। বোঝেনতো বাবুজি আমি এখানকার নোকর।

শেষ কথাটা শুনে আর কিছু বলতে পারি না। আমরাও তো ঐ একই পথের পথিক। অপরের ক্ষতি করে ঘর নেবার ইচ্ছে

আমাদের নেই।

লক্ষ্মণ সিং আমাদের একটা ঘর দেবে বলায় সেদিকে রওনা হই। ফিরে যাবার আগে বাংলোটিকে শেষ বারের মত দেখি।

সুন্দর সাজানো গোজানো বাংলো। দু'টো মাত্র ঘর। মাথায় লাল টিনের ছাউনি। কাঠের শিলিঙ। মেঝেতে কার্পেট। জানলায় পর্দা। খাট-বিছানা, ফায়ার প্লেস—যেন রাজপ্রাসাদ।

বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে এসে দেখি ওরা সকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ওদের ওখানে বসতে বলে আবার আমি, অরুণ ও সেন যাই লক্ষ্মণ সিং এর সঙ্গে।

বাস স্ট্যাণ্ডের ওপরেই একটা দোতালা কাঠের বাড়ীতে এসে হাজির হই। সরযূর দিকে মুখ করা ঘর। নীচ তলায় দোকান। সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠি। লক্ষ্মণ সিং ঘরটা খুলে দেয়।

ঘরটা দেখেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। সারা ঘর ধুলোয় ভর্তি। অন্ধকার। ভ্যাপসানি গন্ধ। একটি মাত্র জানলা। মেঝেতে একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি পাতা রয়েছে। ঘরের সামনে ছোট কাঠের বারান্দা। নীচে সরযূ।

লক্ষ্মণ সিং নিজেই ঘরটা ঝেড়ে দেয়। বারজন এক সঙ্গে এই ঘরে থাকা যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ হয়। যাইহোক কোন রকমে রাতটা কাটাতে পারলেই হয়। মালপত্র নিয়ে ওপরে আসি। তাও সিঁড়ি দিয়ে সব মাল তোলা সম্ভব হয় না। দড়ি বেঁধে কিছু কিছু তুলতে হয়। বেশীর ভাগ মাল বারান্দায় রাখি।

সকলে ঘরে বিছানা পাতে। আমি লক্ষ্মণ সিংকে নিয়ে চায়ের দোকানে এসে বসি। ব্যানার্জিদা ও সুখেন্দু ঘরের এক কোণে বসে চিঠি লেখে। লক্ষ্মণ সিং সকলের চা ওপরে পৌঁছে দিয়ে আসে। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে আমি লক্ষ্মণ সিংকে আমাদের প্রোগ্রামটার কথা শোনাই।

কাল সকাল সাড়ে ছ'টায় রওনা হয়ে প্রথম দিনই খাতি যাব। পরের দিন ফুরকিয়া। তৃতীয় দিন পিণ্ডারী দেখে খাতি। তারপর

দিন লোহারক্ষেত। শেষ দিন ভাড়ারি।

অরুণ নীচে আসে। তার সঙ্গে পরামর্শ করে বলি দু'জন কুলি নেব আর গাইড হিসাবে তুমিই থাকবে আমাদের সঙ্গে।

প্রথমে সে রাজী হয়ে কুলিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। কুলিরাও মালপত্র দেখে যায়। কিছুক্ষণ বাদে লক্ষ্মণ সিং ফিরে এসে বলে তিনজন কুলি নিতে হবে তা'নাহ'লে দু'জনে এত মাল বইতে পারবে না।

আমি হাসতে হাসতে বলি কেদারনাথের পথে একাকজন কুলি ৩০/৪০ কেজি মাল নেয়—আর এখানকার লোকে তা পারবেনা। ও হেসে আবার কি যেন বলতে যায়। আমি তাড়াতাড়ি ওর কথা এড়িয়ে সম্মতি দিই। ওর সঙ্গে বেশী কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার কারণ ও যত কথা বলে ততই মুখ দিয়ে বিকট গন্ধ বের হয়। সব সময়ই নেশায় চুর। তবে এমনি লোকটার স্বাস্থ্য ভাল। বেশ গাঁট্টাগোট্টা। মুখশ্রীও মন্দ নয়। নাকটা একটু চ্যাপটা। আর মুখে সদা সর্বদা হাসি।

মিনিট কয়েক বাদে আবার ঘুরে এসে বলে বাবু তিনজন কুলিতে হবে না—ঘোড়া নিতে হবে। শুনে তো মাথায় হাত আবার ঘোড়া! বল কি! সে মাথা চুলকায় আর বলে বাবু ঘোড়া নিতেই হবে। তা'না হ'লে তো যাওয়া সম্ভবই নয়।

এদিকে কুলিদের মুখের দিকে চেয়ে সহজেই বুঝতে পারি ওরা রাজী আছে। কিন্তু লক্ষ্মণ সিং ওদের এই কাজে নিযুক্ত করে নিজে কমিশন নেয়। তাই যত বেশী কুলি বা ঘোড়াওয়ালাকে নিযুক্ত করতে পারবে ততই ওর পোয়াবারো। কমিশনের অঙ্কটা মোটাই হবে। সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে কুলি নিয়োগের ব্যাপারে এই কমিশনের প্রথা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। গাইডরা তাদের মনমত লোক ঠিক করে তাদের মজুরি থেকে বেশ কিছু টাকা কেটে নেয়। যদি কেউ তা না দিতে চায় তাহলে সে আর কাজ পায় না। কেদারনাথের পথেও ঠিক ঐ নিয়মই

দেখেছি। এখানেও পরে জগৎরামের কাছে ঐ একই কথা শুনেছি।

সাধারণতঃ পাহাড়ীদের আমি খুবই ভালবাসি। তাদের সততা, সরলতা সব সময়ই আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু ওদের এই নিয়মটা আমার মনে বড় ব্যথা দেয়। একজন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পয়সা রোজগার করবে আর অপরজন বিনা পরিশ্রমে তার থেকে ভাগ বসাবে। এ নিয়ম কোন সময় উঠে গেলে সুখী হব।

তাই কুলিদের মুখের-হাবভাব-দেখেই আমি তাকে বলি ঘোড়া নেওয়া সম্ভব নয়।

দু'জনাই নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ সেন চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে—শীগগির ওপরে আয়। অজিতও চেঁচাতে শুরু করে।

ডাক শুনে ভাবি বোধহয় কিছু ঘটে গেল। তাড়াতাড়ি আমি ও অরুণ ওপরে উঠে এসে দেখি সেনের হাতে একটা চিঠি। ব্যানার্জিদা সেটা কেড়ে নেবার জন্য ব্যস্ত। সেও চেঁচাচ্ছে খুব খারাপ হয়ে যাবে। ইয়ারকির একটা সীমা আছে। শীগগির ফেরৎ দাও। সেনও ছাড়বার পাত্র নয় সেও একবার পড়বে। অজিত ও স্বপন তালে তাল দিচ্ছে।

আমি আসতেই ওরা ঘিরে ধরে। সেন বলে একবার তুই বল আমি সকলকে পড়ে শুনাই। ব্যানার্জিদা বলে দীপকবাবু এ কি অন্যায়। সেন পরের চিঠি ছিনিয়ে নেবে কেন? সহ্যের একটা সীমা আছে।

বলি ব্যাপার কি? ব্যানার্জিদা চিঠি লিখেছে আর সেটাই তোমাদের পড়ার ইচ্ছে! কিছু কি মজার কথা লেখা আছে! হাবভাব দেখে তো আমারই শুনতে ইচ্ছে করছে। তবে ব্যানার্জিদার যদি আপত্তি না থাকে।

অরুণ বলে কি ব্যানার্জিদা এটাই তো আনন্দ। এতে নিশ্চয়ই এমন কিছু ব্যাপার নেই যা আমরা শুনতে পারি না। যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পড়া বন্ধ করে দেয়া হবে।

ব্যানার্জিদাকে নীরব দেখে বলি কি ব্যানার্জিদা কথা বলুন।

এইতো হেসেছে। তবে তো সব ঠিক হায়। পড়ে যাও সেন।

সেন সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু করে।

ভাড়ারি

........., ১৯৷১৷৬৯

তোমার কাছ থেকে আজ আমি অনেক দূরে। সভ্যতার যন্ত্রযানের শেষ সীমানায়। এখন থেকে শুরু হবে পথ-পরিক্রমা। তুমি হয়তো ভাবছো বন্ধনযুদ্ধে তুমি পরাজিত। খাঁচার পাখী আজ যেন ফুরুৎ করে উড়ে গেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সাথীহারা মন যেন সব সময়ই খুঁজে বেড়ায় তোমাকে। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন সঙ্গীহীন বলে মনে হচ্ছে। তুমি হয়তো বলবে এ আমার বুজরুকি। হয়তো বা তাই। কিন্তু তোমার কি মনে পড়ছে না পুরীর সমুদ্র তীরে আমাদের সেই প্রথম দেখার কথাগুলো। সেই ঢেউয়ের পর ঢেউ। কতবার চেষ্টা করেও পরাজিত হয়েছিলাম তাদের কাছে। আছড়ে পড়েছিলাম তোমার সাথে বালুকা বেলায়। সেই দুর্নিবার ঢেউয়ের ধাক্কায় টেনে ছিল তোমাকে আমার কাছে। আজ আবার সেই ঢেউ সরিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে তোমার থেকে বহু দূরে।

জানি না সমুদ্র কি চেয়েছিল—আর কুমায়ুন কি চায়? সব সময়ই যেন নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। তাই ঘরের এক কোণে বসেছি তোমাকে লিখতে।

কাঠগুদাম থেকে আলমোড়ার পথে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শুরু হয় কুমায়ুনের খেলা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এতই মধুর যে নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলাম না। মনকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে হিমালয়ের কন্দর থেকে কন্দরে। আশ্চর্য হয়ে যাই নিজের মনকে ধরে রাখার ক্ষমতাও নাই। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে পাহাড়ের বুকে। মেঘের পাতলা চাদরে দিগন্ত অস্পষ্ট। 'দূরে শত সহস্র জোনাকীর আলো—যেন অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়েছে। প্রথমে হতভম্ব হয়ে যাই। একি জোনাকী! না

আলমোড়া শহরের আলো। তুমি কি ভাবতে জানি না! আমি চোখ ফিরাতে পারি নি। অনেক চেষ্টা করেছি চোখ বন্ধ করতে। কিন্তু কই? শত চেষ্টাও বৃথা।

তুমি হয়তো ভাববে যে তুমি থাকলে তোমার ঘাড়ে ঢুলে পড়তাম। কিন্তু ঢোলাতো দূরের কথা—চোখের পাতাগুলো যেন সব সময়ই টেনে ধরে রেখেছে। ছোট বেলার সেই মাষ্টার-মশায়ের ভয়ে চোখ খোলা নয়। প্রকৃতি যেন খেলনা দিয়ে সব সময়ই মন ভুলিয়ে রাখে।

বাস থামতেই আবার তোমার কথা মনে পড়ে। আলমোড়া ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে করে না। মন যেন পালিয়ে বেড়ায় সেই পুরীর সমুদ্রতীরে। কানে শুধু ভেসে আসে সমুদ্রতীরে বসে তোমার সেই প্রথম গানখানি 'এই বালুকা বেলায়…।'

কাল সারারাত মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আজ আর তা মনে হচ্ছে না। কুমায়ুন যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিকেতন। এরূপে মায়া আছে। মোহ আছে। তাইতো দল ছাড়িয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তার কাছে—আরও কাছে। সব সময়ই যেন ডাকছে। বলছে যেন চলে আয়, চলে আয় আমার কাছে। ভয় কিসের? কি হবে সঙ্গী? আমিতো আছি—তোর পথ প্রদর্শক। আমিইতো তোর সঙ্গী। চেয়ে দেখ কত পাহাড়ী রয়েছে আমার কোলে। অভাব হবে না তোর—যা চাইবি তাই পাবি। শরীর তোর ক্লান্ত। মন ভারাক্রান্ত—কুচ্ পরোয়া নেই আমিতো তোর সঙ্গে। মুখ তোল চেয়ে দেখ আমার সৌন্দর্য—ভরে যাবে মন। আবার জোর পাবি, অবসাদ যাবে মুছে। পিপাসা পেয়েছে? পান কর সুমিষ্ট জল। আমার হৃদয় গলে গেছে। কিরে কথা বলছিস্ না যে। সামনে দেখ আমার কি রূপ! কেমন সেজেছি গয়না পরে। দেখ চেয়ে দেখ খোঁপায় আমার মুক্ত মালা। কিরে চুপ করে রইলি যে। মন ভরেছে? ভাল লেগেছে আমার কৌসানী নাম। বুঝেছি। চল আরও এগিয়ে চল। দেখবি

আমার কোলে গরুড়, বৈজনাথ, বাগেশ্বর। দেখবি আমার বুকে কোশী, গোমতী, গরুড়গঙ্গা, সরযূ আর কত কি? দেখ আমার হৃদয় গলা জলে অসংখ্য মাছ। কেমন তারা আনন্দে আত্মহারা। নীল জলে কেমন তারা পাখনার ঝাপটা টেনে খেলে বেড়াচ্ছে। আর ঘুমোস না। চোখ খোল। কান পেতে শোন পাখীর কলরব। কিরে নির্বাক কেন? এখন কি তুই সাথীহারা?

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মুসৌরির লাল টিব্বার কথা। সে দিন তুমি অপলক নয়নে চেয়েছিল সেই রূপোলী মুকুটের দিকে। বলেছিলে যদি পাখীর মত ডানা মেলে উড়ে যেতে পারতাম…। পেরেছিলে কি সেদিন উড়ে যেতে? মন কি চেয়েছিল লালটিব্বা থেকে নেমে আসতে? আজ আমি এসেছি সেই রূপোলী রূপের টানে। চলেছি আরও কাছে। তুমি হয়তো প্রশ্ন করবে তাহলে তুমি কি আমায় ফেলে চলেছো অন্য কোন নতুন প্রেয়সীর টানে? ঠিক তাই ছুটেছি যেন আলেয়ার পিছনে। এ যেন নিশির ডাক।

হরিদ্বারের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। গঙ্গায় নামতে কি রকম ভয় করেছিল? ধরেছিলাম শক্ত করে চেন্‌টা। ডুব দিতেই ক্লান্তি দূর। আজ আবার সেই কথা মনে পড়েছিল গোমতীর নীল জলে গা ডুবাতে। কিন্তু আজ তুমি নেই—সাথী নেই। ছুটে চলেছি কুমায়ুনে—সেই ধ্যান গম্ভীর দেবাদিদেবের কাছে। কত তুচ্ছ আমরা! কত ভয় আমাদের মনে! কত সংকীর্ণতা!

কি যেন এলোমেলো হয়ে গেল। আমি কি ভুল বকছি? আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? না—না—না। থাক্ ওসব কথা। কাজের কথা বলি। আশা করি, তুমি ভালই আছ। আমি …। মনে হয় সুদূর পথ পরিক্রমার খবর কাল থেকেই দিতে পারবো। আজ এখানেই শেষ করছি। ইতি—

চিঠিটা পড়া শেষ না হতেই অরুণ চেঁচিয়ে বলে অপূর্ব! অপূর্ব!

অজিত সায় দেয়। ব্যানার্জিদা তোমার পেটে পেটে এত ছিল!

এতক্ষণ পরে দত্তগুপ্তও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সে বলে

কিন্তু কই 'ইতি' লিখে নামটা লিখলে না তো!

সেন হেসে বলে 'ইতি' আর কি—নাড়ুগোপাল।

হাসিতে সকলে ফেটে পড়ে। সুধেন্দু তাড়াতাড়ি মগ হাতে দৌড়ায়। বলে যখন আসর জমেছে তখন এক রাউণ্ডকফি হওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি নীচের চায়ের দোকান থেকে গরম জল এনে সুধেন্দু কফি করে। চানাচুর সহযোগে আরামে খাই।

এদিকে কফির মগ হাতে পেয়ে অজিতের ভাব এসেছে। সেও গুনগুনিয়ে গান ধরেছে।

নেসকাফে—নেসকাফে—নেসকাফে
তুমি আছ আমার সাথে
কি অপূর্ব তোমার স্বাদ
দূর কর ক্লান্তি অবসাদ।

অজিতের গান শুনে আবার সকলে যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হাসির পর হাসি। বলি আজকে কি এখানে কবি সাহিত্যিকের আসর বসলো নাকি? সকলে আবার হাসে। অজিত লজ্জা পায়।

লক্ষ্মণ সিং আসে সঙ্গে কুলিদের নিয়ে। মালপত্র দেখে। আবার সেই এক কথা ঘোড়া নিতে হবে। আমি কোন রকমেই রাজী হই না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ওরা চলে যায়।

সেন, মনোজ ও সমীর নীচের হোটেলে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে যায়। অরুণ ও সুধেন্দু জিনিষপত্র গোছগাছ করে। আমি বারান্দায় এসে হেলান দিয়ে বসি।

দিনের শেষ। সূর্যদেব তখন আকাশ রাঙিয়ে বিদায় নিতে চলেছেন। মৃদু মন্দ বাতাস আর পাখীর গানে ভরে গেছে প্রকৃতির আঙিনাখানি। মন্থর শান্ত সন্ধ্যার নীরব ছায়া নেমে আসছে ঘন বনে। পূরবীর সুর যেন বেজে উঠেছে আকাশে। মিটমিট করে জ্বলে সন্ধ্যা তারা। যেন সাঁজের প্রদীপ জ্বালায়। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে আসে। গাঁয়ের কুটিরে কুটিরে টিমটিমে আলো জ্বলে। অন্ধকার। কানে আসে শুধু ঝি ঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক আর সরযূর

অবিরাম কল-কল্লোল। কৃষ্ণকালো যবনিকার বুকে দেখা যায় নদীর ইশারা। ক্ষীণ আলোর রেখা চলেছে এঁকেবেঁকে—আপন মনে। ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে।

বসে আছি। দেখছি নিসর্গ শোভা। দূরে পাহাড়-শীর্ষে উঠেছে চাঁদ। নক্ষত্রের বাসরে জেগেছে যেন মধ্যমণির মত। স্নিগ্ধ কিরণ, মধুর কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে সরযুর জলে। ঝিলমিল করে আলোকমালা।

উৎক্ষিপ্ত ঢেউ আছড়ে পড়ে কূলে কূলে। সাদা সাদা দুধের মত ফেনা তোলে। বুকের ভেতরে যেন কত শত ছোট ছোট তরঙ্গ ওঠে আর নামে। মনমুকুরে ফুটে ওঠে মানালির দৃশ্যখানি। সেই বিপাশার জলসাঘরের প্রতিচ্ছবি। নদীর দিকে চেয়ে দু'চোখ যেন তন্দ্রালু হয়ে আসে।

হঠাৎ বিকট শব্দ করে লরী এসে থামে। গাছের ডালে ডালে যত বিশ্রামরত পাখী ছিল ভয় পেয়ে ত্রস্ত পাখা মেলে ইতস্তত: আকাশে ছড়িয়ে পড়ে সবাই মিলে। আমারও তন্ময়তা কাটে।

সন্ধ্যা তখন সাতটা। চারিদিক নিঝুম। পথেও কোন লোক দেখি না। সবাই যেন ঘুমে অচেতন।

পাহাড়ী অঞ্চল। এটাই এখানকার রীতি। এরা অতি ভোরে ওঠে আর সন্ধ্যা লাগতেই শুয়ে পড়ে। একদিকে যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল অপর দিকে পয়সারও কিছু সাশ্রয় হয়। আলো জ্বালাতে হয় না। তবে অবশ্য পাহাড়ের বহু অঞ্চলে কেরসিন পাওয়া যায় না। যদিও বা কোথাও একটু আধটু মেলে তারও যা দাম—তা কেনার ক্ষমতাও ওদের নেই। পাহাড়ীরা বড়ই দুস্থ। যা কিছু রোজগার তা শুধু খাদ্যেরই জন্য। তাতেই তাদের কুলায় না। কেরসিনের কথা ওরা চিন্তাই করতে পারে না।

এদিকে হোটেলওয়ালা বার কয়েক ডেকে গেছে। তাই আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়ি। যাবার আগে সুটকেশগুলো নিয়ে পাশের মুদিখানার দোকানে রেখে আসি। ফেরার পথে নেব।

স আমাদের মালগুলো তার ঘরে রেখে দেবে এবং তার জন্যে প্রতি মাল পিছু ২৫ পয়সা ভাড়া দিতে হবে। একটা লিষ্ট করে তার কাছে মালপত্র জমা দিয়ে হোটেলে আসি।

ভাত আর লাউয়ের ঝোল দিয়ে নৈশ ভোজ সমাধা করে ঘরে ফিরে আসি। প্রচণ্ড কুয়াশা ও হিমেল হাওয়ায় ঠাণ্ডাটা বেশ জাকিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি শোবার উপায় নেই। রুকস্যাকগুলো ঠিকমত গুছিয়ে নিতে হবে। রেশনের বস্তাগুলো আগে থেকেই ঠিক করা আছে। কেবল সকালে উঠে বেডিঙ্ বাঁধা হবে। যে যার কাজ করছে এমন সময় আবার লক্ষ্মণ সিং ও কুলিরা আসে। মালপত্র ওজন করে দেখে। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। আবার সেই কথা—ঘোড়া নিতে হবে। চার্জ ৭৫৲। বেগতিক দেখে দলের সকলের সঙ্গে আলাপ করে স্থির করা হয় একটা কুলি ও একটা ঘোড়া নেয়া হবে। এর পর লক্ষ্মণ সিং তার পাওনাগণ্ডার কথা নিয়ে বসে। জিজ্ঞাসা করায় সে তার মজুরি ২৫০ টাকা বলে বসে। তাছাড়া প্রতি কুলিকে ৪৫৲ দিতে হবে। ওর কথা শুনে সকলের তো মাথায় হাত! বলে কি! তখন তাকে বলি আমরা মহাজন বা শেঠ আদমি নই যে তোমাকে অত টাকা দিতে পারবো। খেটে খাওয়া মানুষ। অফিস কাছারীতে চাকরি করি। সামান্য সঞ্চয় নিয়ে বেড়াতে এসেছি।

সে আবার আরম্ভ করে আমি সুনীল চৌধুরীর দলের সঙ্গে ছিলাম, অন্য দলেও গিয়েছি—তাদের কাছ থেকেতো এই রকমই পেয়ে থাকি। তবে আপনারা কেন দেবেন না।

তখন আমি তাকে বলি আমরা কোন অভিযাত্রী দল নই। কারও কোন সাহায্য নিয়েও আসিনি। তাছাড়া তুমি একটু আগে যে খাবারের ফিরিস্তি দিয়েছো তাও আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। যে সব বাবুরা পাহাড়ে বাটার টোষ্ট, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি ছাড়া চলতে পারে না—তারাই তোমাকে এসব খাবার দিতে পারবে। তারা বহু সাহায্য পায়; তাদের পক্ষে

সম্ভব। আমরা খিচুড়ি ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারবো না।

ও আমার কথায় একটু ক্ষিপ্ত হয়ে বলে খানা নেহি লে আয়া, বোতল ভি নেহি লে আয়া—তব পাহাড় মে কিঁউ আয়া ?

অরুণও দপ্ করে রেগে উঠে বলে কি কি খাবার আনবো তাও কি তোমার কাছে শিখতে হবে। তুমি কি এমন উঁচু দরের লোক যে তোমাকে রাজকীয় খাবার দিতে হবে। বোতল ছাড়া যখন চলতে পারনা তখন ঐসব বোতল বাহিনীর সঙ্গে যেয়ো—তাতে তোমার সুবিধা হবে। আমাদের কোন গাইডের প্রয়োজন নেই। কুলিতেই কাজ হবে। সে রাগে গজগজ করতে করতে চলে যায়। দলের সকলেই ওর আচরণে ও অন্যায় আবদারে ক্ষুণ্ণ হয়।

সত্যি কথা বলতে কি আজকাল বেশীর ভাগ অভিযাত্রী বা তরুণদল যারা পাহাড়ে ঘোরে তাদের মধ্যে অনেককেই দেখেছি সঙ্গে ঐ বোতল নিয়ে চলতে এমন কি এও শোনা যায় যে ওরই সংগতি করার জন্য তারা এতই ব্যস্ত যে পর্বতশীর্ষ নাগালের কাছে পেয়েও তারা সব কিছু ভুলে যেতে বসে। কিন্তু তারা ভুলে যায় মাউন্টেনিয়ারিং-এর নিয়ম অনুযায়ী ঐ বস্তুটি একেবারেই বর্জনীয়।

ক্রমে রাত বাড়ে। সকলেই চিন্তিত। কাল সকালে কুলিরা বিগড়ে বসতে পারে। তাছাড়া কুলি ছাড়াও এক পা যাবার উপায় নেই। সেনদেরতো বিরাট লটবহর।

নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে কোন রকমে রাত কাটে।

॥ ৫ ॥

আকাশ তখনও অন্ধকার। কুয়াশার মায়াজাল যেন বিছিয়ে আছে প্রকৃতির অঙ্গে। জাদুর ছোঁয়া লেগেছে যেন সর্বত্র। রাতের নীরবতা ভাঙতে শুরু করে নি। আকাশ বন পাহাড় সব কিছুই আবছা হয়ে আছে। সবই যেন অদৃশ্য প্রায়। কুয়াশার চাদর টেনে গ্রামখানিও যেন মুখ লুকিয়ে আছে। ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু তন্দ্রা কাটেনি। পাখীরও গান কানে আসে না। ওরাও যেন সুখনিদ্রায় মগ্ন। সোনার পরশে জাগবে ওরা একে একে।

পথেও কোন লোক দেখিনা। বাসের শব্দও কানে আসে না। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। একমাত্র জেগেছে সরযূ। সুরের তাল তুলে, প্রভাতী বন্দনা গীত গেয়ে কেমন চলেছে দুলে দুলে এঁকেবেঁকে। চলেছে অভিসারিকা প্রিয় সন্দর্শনে। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে। চলেছে রাত্রি উষার আলোয় বিলীন হতে।

দেখতে দেখতে সূর্যের রক্তিম রশ্মি এসে ঘুম ভাঙায় পৃথিবীর। বিচিত্র সুরের আলাপে মেতে ওঠে বনবীথি। জাগেন প্রকৃতি। জেগে ওঠে প্রাণ। সূর্যদেব ওঠেন নীল আকাশে। গৈরিক বসন পরে। মাথায় তাঁর মেঘের উত্তরীয়। যেন সন্ন্যাসী বেশে হাজির হলেন নবোদিত সূর্য। অন্তরের প্রণাম জানাই।

বন্ধুরা কুলির প্রতীক্ষায় উন্মুখ। রাত থাকতে বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করে রাখা হয়েছে। কুলিরা আসলেই হয়।

অবশেষে কুলিরা আসে। যাত্রার প্রথমেই বাধা পাই। লক্ষ্মণ সিং আবার প্যাঁচ কষতে শুরু করে। কেউ আজ লোহারক্ষেত ছেড়ে ঢাকুরি যাবে না। কুলির মজুরি বাড়াতে হবে।

এদিকে বেলা হয়ে আসছে। অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই ওরা লোহারক্ষেত ছেড়ে ঢাকুরি যাবে না। অনেক বোঝাই। আমাদের একদিন দেরী হয়ে গেছে। বাংলোগুলো যে যে তারিখে বুক করা আছে তার থেকে একদিন পিছিয়ে পড়েছি। প্রথম দিনটা একটু কষ্ট করলে আমরা ঠিক ঠিক বুকিং তারিখগুলো পেয়ে যাব। ফলে থাকার কোন অসুবিধা হবে না। লক্ষ্মণ সিং এর প্যাঁচে পড়ে কুলিরাও সে কথা বুঝতে চায় না।

এদিকে সেনের রণচণ্ডী মূর্তি। বলে দরকার নেই কুলির। সুধেন্দুও রাগে গজগজ করছে। মুখ দিয়ে তার ঠিকমত কথা বেরচ্ছে না। হাঁটাপথে মাথা যে সব সময় ঠাণ্ডা রাখতে হয়—সেকথা সবাই যেন ভুলে গেছে।

অরুণ ভীষণ বিরক্ত বোধ করে তার রুকস্যাকটা আমার পিঠে

দিয়ে নিজে আমাদের বেডিংটা কাঁধে নিয়ে বলে চল কুলির প্রয়োজন নেই। লোহারক্ষেতে গিয়ে সব ঠিক করবো। সকলেই তখন অরুণের দেখাদেখি সাধ্যমত মাল নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিতে থাকে। অমনি দু'জন ছুটে এসে বলে বাবুজি আমরা যাব। পরিবেশ শান্ত হয়। চা খেয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই। লক্ষ্মণ সিং এর এই আচরণ আমি কোন দিনই ভুলতে পারবো না। ফিরে এসেও অনেকের মুখেই ওর এরূপ ব্যবহারের কথা শুনেছি।

*　　　*　　　*

সকাল তখন সাতটা। নন্দাদেবীর জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করি। কুলিদের অনুরোধে আজ লোহারক্ষেতেই বিশ্রাম নেয়া হবে।

সামনে পথ। একটা ওপরে অপরটি নীচে। ওপরেরটি শ্যামাধুরার আর নীচেরটি লোহারক্ষেতের। সেই পথেই চলেছি। বাঁ দিকে সরযূ। নদীর স্বচ্ছ নীল জল। ছোট ছোট ঢেউ। বুক ভরা নুড়ির মেলা। তীরে সারি সারি গাছ। কূলে কূলে ক্ষেত। দূরে পাহাড়ের সারি। গায়ে গায়ে অরণ্যের বাসা।

পথ চলে শস্য শ্যামল মাঠের মাঝ দিয়ে। দু'পাশে চাষের ক্ষেত। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সাজানো। যেন কে নিখুঁত করে সাজিয়েছে সযত্নে। পাশ দিয়ে বয়ে যায় সরযূ। আপন উদ্বেল আনন্দে। চলেছে কলস্বনা অজানার বুকে নিজেকে হারাবে বলে। পথ চলি। আর চোখ মেলে দেখি। মন যে তবুও ভরে না। মনে হয় চোখের আড়ালে ঐ পাহাড়ের পিছনে কি যেন অদেখা স্বর্ণখনি লুকিয়ে আছে সঙ্গোপনে। দেখার আশায় প্রাণ উন্মুখ। মন ছুটছে আগে থেকে সেই রূপের সন্ধানে।

সকালের সোনা ঝরা রোদ ঝরছে গাছের ফাঁক দিয়ে। শ্যামল মাঠে। সোনালী গমের ক্ষেতে। সবুজ পাইনের ডালে ডালে। ঘাসের ডগায় ডগায় ভোরের শিশির মুক্তোর মত ছড়িয়ে আছে পাখী ডাকে কুহুকুহু। নদী গায় কুলকুল কলকল সুরে। স্নিগ্ধ বাতাস। ভেজা ঘাসের সোঁদা গন্ধে মন আকুল করে। প্রসন্ন

চিত্তে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলি।

সবুজ মাঠের মাঝে মাঝে রামদানার চাষ। লালে লাল হয়ে আছে। বাতাসে গাছগুলো দোলে। মোরগ ঝুঁটির ন্যায় লাল লাল ফুলগুলো কেমন আবেগে এ ওর ঘাড়ে ঢুলে পড়ে। যেন লজ্জাবতী লতা লজ্জায় লুটিয়ে পড়ে।

এপারে পথ। ওপারে পাহাড় চলেছে সমান্তরাল। মাঝে নদী। যেন গাঁটছড়া বাঁধা। ওপারে নদীর গায়ে অরণ্যের ইশারা। কচি ঘাসে ছাওয়া মাঠ। আর ঢেউ খেলানো শস্য ভরা ক্ষেত। বনফুলের শোভা। ফুলে ফুলে লতায় পাতায় শুধু ছোপ ছোপ রঙের বাহার।

ব্যানার্জিদা, নাড়ু, পানু অনেক পিছিয়ে। সঙ্গে আছে জগৎরাম আর ঘোড়াওয়ালা ধরম সিং।

পথ ঘুরে আসে। চারিদিকে পাইনবন। পাহাড়ের গায়ে তাদের নিবিড় বসতি। দূরে দেখা যায় ছোট ছোট গ্রাম। তারাও যেন চুপ করে বসে আছে কারও প্রতীক্ষায়। কাঠ পাথরের ঘর। সামনে এক ফালি দাওয়া। কাঠের খুঁটি বেয়ে উঠেছে লাউ, কুমড়োর লতা। এপাশে ওপাশে লেবুগাছের ঝোপ, বেগুন আর টমেটোর মেলা। আঙিনার কোণে কোণে সারের স্তূপ। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আপন মনে এক্কা দোক্কা খেলে। যাত্রী দেখলেই ছুটে আসে। হাতদু'টি বাড়িয়ে পয়সা চায়। না দেয়া পর্যন্ত পিছন পিছন চলে। বাবুজি পইসা দিজিয়ে। শেঠজী, সাহেব কত অনুনয় করে

শিশুবদল নিজেরাই ভালভাবে এখনও চলতে শেখেনি। তারি মধ্যে কেউবা কাঁখে তার সমান ওজনের বোনটিকে নিয়ে চার হাত মেলে চলছে আমাদের সমান তালে। কারও মুখে আধ-ফোটা বুলি। আমতা আমতা করে সেও বিনতী জানায়।

নদী একটু একটু করে দূরে সরে। সোনালী ক্ষেতের মাঝ দিয়ে পথ। নয়নে স্নিগ্ধতা আনে। উৎসাহ পাই। বুক ভরা আনন্দ

নিয়ে এগিয়ে চলি। পথের পাশে এক বৃদ্ধার চায়ের দোকান। বৃদ্ধা আমাদের দেখে সস্নেহে ডাকে। আও বেটা চায়ে পিও। অজিত ও স্বপনের চা খাবার ইচ্ছে হয়। সকলে পিটের বোঝা নামিয়ে বসি।

চা করতে করতে বৃদ্ধা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে কাঁহা যায়েগা বেটা।

উত্তরে বলি পিণ্ডারী।

শুনে একটু যেন অবাক হয়ে আবার বলে কাঁহা—কিঁউ যাতা?

হাসি আর বলি ঘুমনেকো লিয়ে যাতা।

বেড়ানোর কথা শুনে বৃদ্ধা যেন আরও বেশী অবাক হয়। বলে বেড়াতে! না সরকারী কাজে! ওতো নন্দাভগবতীকা স্থান।

সেন আমাকে ধমক দেয়। কিন্তু আমি বুড়ির মনের কথা বুঝে উত্তর দিই মাইজি নন্দাভগবতীকা দর্শন কে লিয়েই উধার যাতা।

আবেগ ভরে বলে সাচ্ বাত।

চা খেয়ে আবার যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হই। বুড়ি পিছু ডাকে থোড়া ঠ্যার। দাঁড়াই। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সামনের গাছ থেকে গোটা কয়েক শশা ছিঁড়ে আমার হাতে দিয়ে বলে লে যা বেটা রাস্তামে খায়েগা। হাম গরীব আদমী আউরতো কুচ্ দেনে নেহি সেকতা। এ লেলে বেটা।

বুড়ির স্নেহ ভরা কথায় মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। ক্ষণিক নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অন্তরে যেন কিসের ছোঁয়া লাগে। শশা ক'টা নেবার ইচ্ছে না থাকলেও নিতে হয়। এতে পিঠের বোঝা আরও খানিক বাড়ে।

পথ চলি আর মনে মনে ভাবি কি অদ্ভুত এদের ব্যবহার! কি মধুর সম্পর্ক এরা গড়ে তোলে! ক্ষণিকের পরিচয়ে মনে হয় কতদিনের আত্মীয়।

অদ্ভুত এদের বিশ্বাস! নন্দাদেবীকে এরা সর্বশ্রেষ্ঠা দেবী রূপে কল্পনা করে থাকে। যদিও সমগ্র কুমায়ুন গাড়োয়াল তথা সমগ্র হিমালয়েই শৈব ধর্মের প্রাধান্য তবু কুমায়ুন গাড়োয়ালের অধি-

বাসীরা নন্দাদেবীকে একটু পৃথক করে দেখে।

নন্দাদেবী মঙ্গলময়ী, কল্যানদাত্রী। তাদের যাবতীয় ক্রিয়া কর্মে নন্দাদেবীকে স্মরণ করে থাকে। কালীভক্ত বাঙালীর মত এরাও নন্দাদেবীকে আপনার করে কাছে টানে।

হিমালয় দেবদেবীর আলয়। ভৌগলিক দিক থেকে হিমালয়কে বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক করা হয় যেমন কাশ্মীর হিমালয়, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ, কুমায়ুন-গাড়োয়াল, নেপাল হিমালয়, সিকিম ও ভূটান। আবার এই সব বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা শিবের উপাসক হয়েও যেমন নিজস্ব দেবদেবীর কল্পনা করে তেমনি কুমায়ুন গাড়োয়ালের অধিবাসীরা নন্দাদেবীকে তাদের নিজস্ব দেবীরূপে কল্পনা করে। যেমন লাহুলীরা বিশ্বাস করে গেফান পর্বত শীর্ষে থাকেন তাদের গেফান দেবতা। সিকিম হিমালয়ের লোকেরা কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাবরুডোম প্রভৃতি শিখরগুলিকে দেবতা জ্ঞান করে। তেমনি কুমায়ুন গাডোয়ালবাসী এই অঞ্চলের বিভিন্ন পর্বত শিখর-গুলিকে নন্দাদেবীর আবাসস্থল রূপে কল্পনা করে থাকে।

হিমালয় কন্যা পার্বতী তথা নন্দা। সমগ্র হিমালয়ই তাঁর আবাসস্থল। তাই দেবতাত্মা হিমালয় হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র। কিন্তু যেহেতু এরা নন্দাদেবীকে আপনার বলে মনে করে সেইজন্য এদের বিশ্বাস নন্দাদেবী থাকেন এদেরই গৃহকোণের পর্বত শিখরে। তাই এরা এই অঞ্চলের পর্বত শিখরগুলিকে নন্দাদেবীর নামের সঙ্গে যুক্তকরে ভক্তি নিবেদন করে।

এই অঞ্চলের তথা সমগ্র ভারতের উচ্চতম শিখর নন্দাদেবীকে (২৫৬৪৫´) তারা নন্দাভগবতীর আবাসস্থল রূপে কল্পনা করে। নন্দাকোট (২২৫১০´), নন্দাখাত (২১৬৯০´), নন্দাঘুন্টি (২০৭০০´) প্রভৃতি পর্বতগুলি নন্দাদেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত।

এরা এইসব পর্বতশিখরগুলিকে অতি পবিত্র বলে মনে করে। কেউ যদি ঐসব শিখরে আরোহণ করে তা'হলে এরা ক্ষুণ্ণ হয়। তারা মনে করে দেবীর আবাসস্থলে মানুষের পদচিহ্ন পড়া অমঙ্গলের

লক্ষণ। এতে নন্দাভগবতী বিরূপা হন। বিপর্যও অবশ্যম্ভাবী। তবে যদি কেউ দর্শনের অভিপ্রায়ে তার নিকটে যায়—তাতে এরা খুশীই হয়। ফিরে আসলে তাদেরকে পুণ্যবান বলে মনে করে।

নন্দাভগবতীকে নিয়ে এদের প্রচলিত লোকগীতি, গাথাগান ও প্রবাদগুলি কিছুটা অবাস্তব মনে হলেও শুনতে ভাল লাগে।

নন্দাদেবীকে উদ্দেশ্য করে বহু উৎসব পালপার্বন প্রচলিত আছে। যেমন নন্দাষ্টমী, নন্দাজাত প্রভৃতি। বাঙালীর যেমন সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব তেমনি এদের নন্দাজাত।

এই নন্দাজাত দু'রকমের। ছোটি নন্দাজাত ও বড়ি নন্দাজাত। ছোটি নন্দাজাত প্রতিবছর ভাদ্র আশ্বিন মাসের অষ্টমী তিথিতে কুমায়ুন-গাড়োয়ালের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিপালিত হয়। তবে এই উৎসবের প্রধান স্থল হচ্ছে রূপকুণ্ডের পথে বৈদিনী বুগিয়াল। সেখানে নন্দাদেবীর একটা ছোট্ট মন্দির আছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে নন্দপ্রয়াগের নিকট কুরুড় গ্রাম থেকে তীর্থযাত্রীর দল সুসজ্জিত পাল্কিতে নন্দাভগবতীর মূর্তি নিয়ে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে বৈদিনীতে যায়। সেখানে দেবীর পূজা হয়।

আর বড়ি নন্দাজাত অনুষ্ঠিত হয় আনুমানিক বারো বা তার চেয়ে কিছু বেশী বছর অন্তর। এটা অবশ্য নির্ভর করে সময় তিথি ইত্যাদির উপর। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কর্ণপ্রয়াগের নিকট নৌটি গ্রাম থেকে নন্দাদেবীর ডোলা নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রা বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে এগিয়ে যায় রূপকুণ্ড ছাড়িয়ে হোমকুণ্ডে। সেখানে হোম সম্পন্ন করে তারা ফিরে আসে। এই উৎসব এদের কাছে অতি পবিত্র। এতে যোগ দিতে পারলে তারা ভাগ্যবান বলে মনে করে।

কিন্তু এই নন্দাজাত আর আমাদের দুর্গোৎসবের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে।

বাংলা শাক্ত পদাবলী-সাহিত্যের দুই ধারা। একটি শ্যামা বিষয়ক অপরটি উমা বিষয়ক। শ্যামাসঙ্গীত ভক্তিরস প্রধান।

আর উমা বিষয়ক গানগুলি বাৎসল্য রসে ভরপুর।

জগন্মাতা উমা গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর রাণী মেনকার কন্যারূপে চিত্রিতা। কন্যার প্রতি পিতামাতার স্নেহের অনির্বচনীয় রূপটি সকল সঙ্গীতে প্রতিভাত।

উমা বিষয়ক গানগুলি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। আগমনী ও বিজয়া। উভয় সঙ্গীতেই স্নেহময়ী জননী মেনকার মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যকে চিরমধুর রূপ দান করে থাকে।

আগমনী গানে বৎসরান্তে মা মেনকা ও কন্যা উমার মিলন দৃশ্য। বহু সাধ্য সাধনার পর মা মেনকা বিবাহিতা কন্যাকে পতি-গৃহ থেকে বৎসরান্তে তিনদিনের জন্য নিজের গৃহে আনেন। তখন চতুর্দিকে আনন্দের সাড়া পড়ে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে মাতা-কন্যার মিলন এক আনন্দরসের সৃষ্টি করে। তিনটে দিন উৎসব আনন্দে অতিবাহিত হবার পরই কন্যা ফিরে যায় স্বামীগৃহে।

বিজয়া সঙ্গীতে স্নেহের দুলালী উমাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে উতল কান্নায় মা ভেঙে পড়েন। তাই বিজয়ার দিনটি আমাদের চোখে করুণ। নবমী রজনীর অবসান যেন মন মানতে চায় না।

কিন্তু এদের ধারণা পার্বতী বা নন্দা বৎসরান্তে পিতৃগৃহ ছেড়ে ক'দিনের জন্য পতিগৃহে যান। তাই এদের গানগুলো পতিগৃহ যাত্রা মুখর এবং নন্দজাত উৎসব পতিগৃহে যাত্রারই উৎসব। আমাদের মত দুর্গার আগমনী উৎসব নয়।

এলোমেলো কত কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলি। হোঁচট খাই। বন্ধুরা ডাকে। পথ গ্রামের মধ্যে দিয়ে ঘুরে যায়। দু'দিকে সারি সারি কুটির। ক্ষেত খামার। নয়নে স্নিগ্ধতা আনে মনের আনন্দে বন্ধুদের সাথে এগিয়ে যাই। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের ডাকে থামতে হয়।

তিনি বাড়ী থেকে আমাদের দেখে আলাপ করতে বেরিয়ে আসেন। অমায়িক ভদ্রলোক। সুশ্রী চেহারা। আধা বৃদ্ধ। হেসে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় যাচ্ছি। উত্তরে বলি পিণ্ডারী

হিমবাহ দেখতে। শুনে খুবই আনন্দ পান। আক্ষেপ করে বলেন আমার আর দেখা হল না। মিলিটারীতে থাকাকালিন বহু জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু ঘরের কাছে পিণ্ডারী সেটা এখনও দেখা হয় নি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন সত্যি আপনারা ভাগ্যবান।

ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখে তাঁকে বলি চলুন না আমাদের সঙ্গে—ঘুরে আসবেন। তিনি হাসেন। বলেন বললেই কি আর যাওয়া হয়। দেখি যদি অন্য এক সময় যেতে পারি। এখনতো রিটায়ার্ড করে বসে আছি। সময়ের তো আর অভাব নেই। তবে যাওয়াটাই আর যেন হয়ে উঠছে না। সুযোগ এলেই বেরব।

হাত দু'টো ধরে তিনি আমাদের যাত্রার শুভ কামনা করেন। ওনাকে ছেড়ে সবে ক'য়েক পা এগিয়েছি আবার পিছু ডাকেন। থামতে হয়। দেখি ছোট একটুকরি কমলালেবু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই বলেন এগুলো নিয়ে যান পথে খাবেন। ভাল লাগবে। মুখ বদলাবে।

ভদ্রলোকের বাড়ীটাও যেমন ছিমছাম তেমনি সামনের বাগানটাও ভারি সুন্দর। কমলালেবু গাছে ভরা। গাছগুলো লেবুর ভারে যেন নুয়ে আছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন সবুজ বনে আগুন লেগেছে।

অতগুলো লেবু দেখে ভদ্রলোককে বিনম্রভাবে বলি অল্প কিছু দিন। এতো নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে সবগুলোই নিতে হয়। উনি আবার গাছ থেকে ছিঁড়ে আনতে যান। আমরা বাধা দিই। ভদ্রলোকের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই। ভাবি এরা কি মানুষ! না অন্য কিছু।

হাত নাড়তে নাড়তে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি। বাঁকের মুখে তিনিও অন্তরালে চলে যান। নদী এখন দূরে সরে গেছে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে।

সকালের সোনালী রোদ। মিঠে মিঠে বাতাস। মনে প্রফুল্লতা আনে। উৎসাহে এগিয়ে চলি। দু'দিকে ক্ষেত। মকাইয়ের

চাষে লাঙ্গ হয়ে আছে মাঠ। কোথাও দেখি সবুজ যবের ক্ষেত। বাতাসে শীষগুলো কেমন দুলে দুলে ওঠে। যেন আনন্দে ঢেউ খেলে যায় মাঠের পর মাঠে। ভারি ভাল লাগে। দু'চোখ মেলে দেখি শস্যশ্যামলা জননী বসুন্ধরাকে। অন্নদায়িনী যেন ক্ষুধার্তের প্রাণ বাঁচাতে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর ভাণ্ডার।

শহরের কোলাহল নেই। নেই কোন মানুষের ভিড়। শুধু প্রাণ ভরে দেখি উন্মুক্ত নীল আকাশ, প্রকৃতির শ্যাম শোভা আর ঐ পাহাড়ীর দল। আহা কি পরম আনন্দে রয়েছে এরা!

কুটিরের আঙিনায় বসে গোটাকয়েক পাহাড়ী। মৌজে হুঁকো টানে। মনের মত একটি সুখটান টেনে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে একগাল হাসি হেসে অপরকে বাড়িয়ে দেয় হুঁকোটি। মুহূর্তেই যেন তাদের গল্প জমে ওঠে।

চারিদিক চোখ মেলে শুধু দেখি আর দেখি। মন যেন ভরে না। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজের মেলা। শোভনা ধরিত্রী যেন হরিত সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠেছেন। দু'দিকে পাইনের বন চলেছে যেন দূর থেকে বহুদূরে।

পথ ক্রমে নেমে আসে নদীর তীরে। পথের বাঁকে মস্তবড একটা পুল। নীচে সরযূ যেন উন্মত্ত গর্জন কবে আকাশ বাতাস মাতিয়ে বেখেছে। পাথরের বুকে শত আঘাতেও যেন তার নিবৃত্তি নেই। নিরন্তর বেজে চলেছে তার নৃত্য শিঞ্জিনী।

এপারে পুলের মুখে দু'চারখানা চালা। চায়ের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ক্ষণিক দাঁড়াই। ব্যানার্জিদারা অনেক পিছিয়ে ছিল তারাও আসে। এক রাউণ্ড চা খেয়ে ওপারেব বাস্তা ধরি।

চড়াই পথ। অতি ধীরে ধীরে উঠি। এপারে সরু পাথর ও কাঁকর মেশানো পথ। পাহাড়ের সারি। ওপারে পাইনের বন। চড়াই আর চড়াই। ডানদিকে বিরাট খাদ। তাকালেই যেন গা শিউরে ওঠে। সারি বেঁধে পিছু পিছু উঠি। অরুণ আমি সুধেন্দু, স্বপন, অজিত সমান তালে চড়াই ভেঙে উঠতে থাকি।

সেন ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে। পান্নুর নতুন জুতো। পায়ে অসংখ্য ফোসকা পড়েছে। হাঁটতে ওর কষ্টই হচ্ছে। ব্যাচারি ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে আমাদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু না পেরে আবার পিছিয়ে পড়েছে। পথ ঘুরে ঘুরে ওঠে। নদী যেন পাশ কাটিয়ে সরে যায়।

আবার উৎরাই পথ আসে। ধূসর পথের রুক্ষতা কমে। দূরে দেখা যায় সেই শ্যামল সবুজ প্রান্তর। ক্ষেত খামার। যতই এগিয়ে চলি ততই যেন পাইন ও দেওদার গাছগুলো কাছে আসে। বেলা বাড়ে। সূর্যের তেজও প্রখর হয়। গরম অনুভব করি। ফুল-হাতা সোয়েটারগুলো খুলে রুকস্যাকে রাখি।

নদী যেন আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলে। কখনও দেখি বনের আড়ালে, পথের বাঁকে গ্রামের মাঝে হারিয়ে যায়। কখনও দেখি তার স্বচ্ছ জলের বুকে ঢেউয়ের মালা। তীরে সশব্দে আঘাত করে। আবার কলকল নিনাদে উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলে। কখনও দেখি বুকে তার পাথরের সারি। ধাক্কার পর ধাক্কা খেয়ে দুধের মত ফেনা তোলে। কখনও দেখি সবুজ মাঠের কিনার ঘেঁষে চলেছে নদী।

আবার কাছে এসেছে শীর্ণা সরযূ। অগভীর নদীরেখা চলেছে যেন রূপোলী আলোর সেঁজুতি জ্বালিয়ে। ধীরে ধীরে বাঁকা স্রোত হারিয়ে গেল বনের আড়ালে।

গ্রামের পাশ দিয়ে চলি। পথে পথে ফুলের সমারোহ। যেন বাসকসজ্জা পাতা। বর্ণালীর প্রলেপনে আঁকা আলপনা। দেখি কলাবন। ছোট ছোট গাছে বড় বড় কাঁধি ঝোলে।

দূর আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। সবুজ ধূসর পাহাড়ের গা ঘেঁসে ঘেঁসে চলেছে তারা কেমন খুশীর মেজাজ নিয়ে। মন যেন পালিয়ে বেড়ায় আনন্দের দোলনা দিয়ে। হঠাৎ কানে আসে রিমরিম ঝিমঝিম শব্দ। চেয়ে দেখি বাঁদিক থেকে নেমে আসে এক ক্ষীণ ঝর্ণা। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, ঘুঙুরের ঝুমঝুম

শব্দ তুলে, পথের মাঝ দিয়ে শস্য শ্যামলা ক্ষেতের পাশ কাটিয়ে, হাসির বাঁধ ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে শীর্ণা সরযূর বুকে।

একটু দূরে দেখা যায় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটি প্রাসাদ। ভাবি এই বুঝি আজকের যাত্রার পরিসমাপ্তি হ'ল। ঐ বোধহয় লোহারক্ষেতের বাংলো। ধীরে ধীরে পিচ্ছিল পথ পার হয়ে আসি। ভুল ভাঙে। বাংলো নয় ইস্কুল বাড়ী।

বিদ্যার্জনের উপযুক্ত স্থানই বটে। চারিদিক সবুজ গাছে ঘেরা। দূরে সারি সারি ঢেউখেলানো পাহাড়। সামনে ছোট্ট এক-ফালি সবুজ মাঠ। তাতে নানা মরসুমী ফুলের শোভা। কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীর কাকলি। ঝর্ণার ঝুমঝুম শব্দ। সত্যি এই শান্ত পরিবেশে মন প্রাণ যেন একাত্ম হয়ে ওঠে সেই অসীমের ধ্যানে।

ইস্কুল আজ বন্ধের দিন। ছাত্র নেই। মাষ্টারমশাই'ও নেই। নেই কোন সুর করে পড়ার গুঞ্জন ধ্বনি। স্কুল বাড়ীটি'ও যেন ছুটীর মেজাজে নিশ্চিন্তে দিব্যি ঝিমিয়ে পড়েছে।

পিঠের বোঝা নামিয়ে শান্ত ছায়ায় বসি। অরুণ ওয়াটার বট্ল নিয়ে সামনের ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে আসে। ঝিরঝিরে হাওয়া আর ঠাণ্ডা জল পানে দেহ মন সতেজ হয়ে ওঠে। পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করি।

এই মধুর পরিবেশে বসে থাকতে থাকতে স্বপনের মন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে আপন মনে রবীন্দ্র সংগীত গায়।

আমারে ডাক দিল কে ভিতর-পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ওই শিউলিশাখে মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের পানে॥
ঘরছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল ম'জে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে খবর যে তার পৌঁছল রে
ঘরছাড়া ওই মেঘের কানে॥

স্বপনের গানে মনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। দু'চোখ যেন মোহ-ময় হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় যেন সারাদিন ধরে এই সবুজ আঙিনায় দেহখানি এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকি। দু'চোখ ভরে দেখতে চাই সুন্দরী প্রকৃতির গালভরা হাসি মুখখানি। যেন স্নিগ্ধ মধুর পরশ দিয়ে পথিকের পথ-ক্লান্তি ভুলায়।

অরুণ তাগিদ দেয়। আবার চলতে থাকি।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। ইতস্ততঃ বনফুলের বর্ণালী। সারি সারি গাছ। পাহাড়ের পর পাহাড়। ভুবন ভরা আলো। মন-মাতানো মিঠে মিঠে বাতাস। প্রকৃতিরাণী যেন থেকে থেকে স্নেহ-স্পন্দন দিয়ে যান। আনন্দের আবেশে পথ চলি। ভাবি প্রতি বাঁকে বাঁকেই আর কত কি দেখবো। দেখবো লুকিয়ে থাকা প্রকৃতির বিচিত্র বাহার। অজানা আনন্দে হৃদয় যেন টইটম্বুর হয়ে ওঠে।

পথে এক পাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হয়। অরুণ তাকে জিজ্ঞাসা করে লোহারক্ষেতের বাংলো আর কত দূরে। লোকটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে সামনের চড়াইয়ের পরই দেখতে পাবেন বাংলো।

চড়াই পথ কাছে আসে। আলগা পাথরের রাস্তা খাড়া উঠেছে। পাকদণ্ডীর পথে ধীরে ধীরে উঠি। মাঝে মাঝে পাথর-গুলো নড়ে ওঠে। সংযত হই। একটু দম নিয়ে আবার পা বাড়াই। ঘুরে ঘুরে যখন চড়াইয়ের শেষ সীমায় এসে পৌঁছাই তখন ডানদিকের ভ্যালির আচম্বিত শোভায় মন মুগ্ধ হয়। সবুজ ভ্যালির মাঝে সুন্দর বাংলোখানি দেখা দেয়। পাশ দিয়ে বয়ে যায় এক শীর্ণা স্রোতস্বিনী। পারাপারের জন্য দু'টো কাঠ ফেলা আছে। ধীরে ধীরে সেটা পার হয়ে লোহারক্ষেতের বাংলোয় আসি (৫৭৫০'/৯ মাইল) তখন বেলা এগারটা।

॥ ৬ ॥

লোহারক্ষেত। এক গ্রামের নাম। গ্রামটি খুব বড় না হলেও আশেপাশের গ্রামের মধ্যমণি।

পাহাড়ের কোলজোড়া শান্ত সুন্দর গ্রাম। বিস্তীর্ণ সমতল-ভূমি। গাঁয়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যায় এক স্রোতস্বিনী। আর এক পাশে একটু দূরে সরযূ। যেন জলের বর্ডার এঁকে চলেছে সে এঁকেবেঁকে।

চারিদিকে দিগন্ত জোড়া চাষের ক্ষেত। কোথাও কচি যবে সবুজ শ্যামল। কোথাও পাকা ধানের সমারোহে সোনালী হলুদ। কোথাও খাঁ খাঁ করে মাঠ দারুণ শূন্যতায়। ধান কাটা হয়েছে সারা। নতুন ফসল মাঠের মাঝে স্তূপাকার করে রাখা আছে। যেন রাশি রাশি ভারা ভারা।

কুটিরেব পাশে, পাহাড়ের কোলে কোলে, স্রোতস্বিনীর তীরে তীরে বড় বড় গাছের সারি। যেন প্রকৃতির কচি শ্যামল শাড়ির বুকে গাঢ় সবুজের নকশা কাটা। আর তার মাঝে লাল ছাউনি দেওয়া সুন্দর বাংলোখানি। যেন শান্ত শ্যামলতার মাঝে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলজ্বল করে।

লোহারক্ষেতের বাংলোটি বড়ই সুন্দর। দূর থেকে আরও বেশী ভাল লাগে। মনে হয় যেন নীল আকাশের প্রচ্ছদপটে আঁকা এক রঙিন ছবি।

বাংলোটি দু'টো স্তরে বিভক্ত। উপরের স্তরে বেশ বড় দু'খানি ঘব। কাঁচের সার্সী দেওয়া জানলা দরজা। তাতে ফুলকাটা বঙিন পর্দা দেওয়া। ঘরের সামনে প্রশস্ত বারান্দা। সারি সারি রঙ-বেরঙের চেয়ার পাতা। গা এলিয়ে দিয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখার এক অপূর্ব জায়গা। সামনে সবুজ লন। ফুলের বেড। গাছে গাছে পাখীর বাসা। ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। প্রতি ঘরে ফায়ার প্লেস, টেবিল চেয়ার, খাট বিছানায় সাজানো যেন রাজপ্রাসাদ।

নীচের স্তরে চারখানা ঘর। এক লাইনে তিনখানা আর

অপরটি ডানদিকে। নীচের এই তিনখানা ঘরের দু'খানা কুলিদের থাকার জন্য আর অপরটি রান্নাঘর। ডানদিকের ঘরটি যাত্রীদের থাকার জন্যই তৈরী হয়েছে। সব ক'টি ঘরই পাকা ইটের গাঁথনি আর মাথায় লাল টিনের ছাউনি দেওয়া। পাশে কলের জলের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজন হলে বাসনপত্র এমনি কি তেলের খরচ দিলে টেবিল ল্যাম্পও পাওয়া যায়। ঘর ভাড়া দৈনিক দু'টাকা। আলমোড়ার নির্মান বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে তারিখ জানিয়ে চিঠি লিখে বাংলো রিজার্ভ করা যায়।

সুউচ্চ পাহাড়। পাইন দেওদার আর শ্যামল কোমল মাঠের স্নিগ্ধ শোভার মাঝে বিরাজ করে বাংলোখানি। যেন গালভরা হাসি হেসে পথিককে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

আর বাংলোর আঙিনাখানি! সেতো নব যৌবনের উন্মাদনায় যেন পাগল। সবুজ ভেলভেটে ঢাকা। পাশ দিয়ে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে অঝোরে ঝরে নির্ঝরিণীর নির্মল জলধারা। আকুল করা গান গেয়ে গেয়ে চলেছে সে সরযূর বুকে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। আহা! কি অপূর্ব পরিবেশ! এ যেন শান্ত প্রকৃতি নিজেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ।

আমাদের দেখে চৌকিদার বেরিয়ে আসে। পকেট থেকে পারমিট খানি বের করে দেখাই। একদিন আগে পৌঁছবার কথা। চৌকিদার সেটার উপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে—আপকো বুকিংতো খতম হোগিয়া। আজতো ডাগদার সাহাব আয়েগা। আপকা কামরা দেনেকো বহুৎ মুশকিল হোগা।

আমি তাকে অনুরোধ করে বলি যদি ওপরের ঘর না দিতে পারা যায় তাহলে নীচের একটা ঘর আপাততঃ দিলে ভাল হয়। চৌকিদার কিছুক্ষণ ভেবে মাথা চুলকিয়ে একটা ঘর খুলে দেয়।

খুবই ছোট ঘর। মালপত্র নিয়ে বারজন একসঙ্গে থাকাও কষ্টকর। সুধেন্দু অসুবিধার কথা জানাতেই অরুণ বলে দেখা যাক্ না—ডাক্তার সাহেব আসুক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

সেন, ব্যানার্জিদা, নাড়ু, পান্নু বা কুলিরা কেউই এখনও আসেনি।

সোনালী রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে সবুজ আঙিনাখানিতে। মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বসি। রুকস্যাক থেকে তেল গামছা বের করে আরামে তেল মাখি।

একদল ছোট ছেলেমেয়ে মাঠে খেলা করে। টুকটুকে গোলাপী রঙ। মিটমিটে চাউনি। সুন্দর স্বাস্থ্য। মনভরা স্ফূর্তি। অথচ, খেলার উপকরণ পাথর, ছেঁড়া সিগারেটের প্যাকেট আর পুরানো টিনের কোটো। বেশ ঘুরে ফিরে খেলে। আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকে হাসে। আবার মুখ ঘুরিয়ে সাথীদের সাথে কেমন সুন্দর খেলা করে।

তেল মাখা দেখে ওদের যেন কি মনে হয়। আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে। কাছে ডাকি। একে একে নাম জিজ্ঞাসা করি। ওরা হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। কচি কচি গালে খিলখিলে হাসি—যেন গাছভরা আধফোটা গোলাপের কুঁড়ি বাতাসে নড়ে। হঠাৎ অরুণ জামা খুলতে উঠে দাঁড়ায়। ওরা ভয় পেয়ে দেয় ছুট। হাত নেড়ে ইশারা করে ওদের ডাকি। আবার কাছে আসে। লজেন্স দিই। চুপ চাপ বসে। সুর করে গান গায়।

মিষ্টি বাতাস। রোদের সুখস্পর্শ। আর শিশুদের গুন গুন গানে দু'চোখে যেন অসময় তন্দ্রা নেমে আসে। মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ি। আবার চমকে উঠি। অরুণ ডাকে। স্নান সেরে গাছের ছায়ায় বসি।

এদিকে কুলিরাও এসে গেছে। চৌকিদার কাঠের ব্যবস্থা করেছে। সেন, স্বপন ও জগৎরাম রান্নার কাজে ব্যস্ত। আমাদের এ বেলায় আর রান্নার ঝামেলা নেই। যা হবে রাত্রে। এ বেলায় পাউরুটী, ডিম সিদ্ধ ও মিঠাই সহযোগে খাবারের পর্ব শেষ করেছি।

দেখতে দেখতে পাহাড়ী শিশুদের ভিড় বেড়েছে। ব্যানার্জিদা বিশাল ভুঁড়িতে বেশ ভালভাবে তেল বুলাচ্ছে। নাড়ু তার গা

হাত পা টিপে দিচ্ছে। আজকের হাঁটাতেই ব্যানার্জিদা ক্লান্ত। নাড়ু যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তার ক্লান্তি দূর করার।

বাচ্চাগুলো বেশ কৌতূহলী নয়ন মেলে গোল হয় দাঁড়িয়ে ওদের দেখে। আমরাও দেখি।

ওদের ছায়ায় ব্যানার্জিদাকে আচ্ছন্ন করে। সেতো বিরক্ত হয়ে, হাত পা নেড়ে বলে কি দেখছিস বাবা—একটু সরে যা, রোদটা আসুক। ওরা ভয়ে সরে যায়। আবার ফিরে আসে। ব্যানার্জিদা জোরে ধমক দেয়। যেন হুঙ্কার তোলে। ওরা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়। আবার দেখি গুটি গুটি আসে। মিটিমিটি হাসে।

যত দেখি ততই যেন মনের কোণে জীবন্ত হয়ে ওঠে গালিভার লিলিপুটের কাহিনী। এ যেন সেই লিলিপুটের দেশ।

ধরম সিং ও জগৎরামের ঘর এই গ্রামে। ধরম সিং-এর ছেলে মেয়েরা এসেছে তার বাবার খোঁজে। সে মাঠে ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে ঘরে যায়। জগৎরাম এখনও যেতে পারে নি। রান্নার ব্যবস্থা করছে। সেও যাবে। অগ্রিম চারটে টাকা চেয়েছে। ঘরে দিয়ে আসবে।

আমি অরুণ ও সুধেন্দু ওপরের বাংলোর বারান্দায় এসে বসি।

পাতলা রোদ এসে পড়েছে ফুল বাগানে। লাল হলদে সাদা বেগুনে ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে যেন সোনা ঝরেছে। সবুজ দূর্বাদলে গাছের পাতায় পাতায় কেমন সোনালী আলোর আভা ঝলমল করে। কোণের লেবু গাছটি ফলে ও পাখীর ভারে যেন নুয়ে আছে। অসংখ্য ছোট ছোট পাখীর কিচির মিচির রবে মধুর পরিবেশ যেন মুখরিত। বিচিত্র তাদের আকার! কত তাদের রঙের বাহার! কোনটা চড়ুই পাখীর মত। কোনটা মুনিয়ার ন্যায়। কোনটা বা দোয়েলের মত। সবুজে হলুদে, লালে আর কালোয়, সাদা আর ধূসর, ডোরা কাটা আকাশী রঙের শোভা। যেন সবুজ গাছের ডালে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটেছে।

অবাক হয়ে দেখি। সুধেন্দু চেয়ার টেনে বসে। আচম্বিত

শব্দে ওরা ঝাঁক বেঁধে ফুরুৎ করে হাল্কা রঙিন পাখা মেলে উড়ে যায় নীল আকাশে। আহা কত তাদের রূপের ছটা!

বসে থাকি। দু'চোখ ভরে দেখি মমতাময়ী প্রকৃতিকে। কত রূপের পসরা দিয়ে সাজিয়েছেন এই লোহারক্ষেত গ্রামখানিকে।

মন আনচান করে। আবার উঠে বাংলোর পিছনের রাস্তা ধরে ঘুরতে বেরই।

ক্ষেতের পাশ দিয়ে পথ ক্রমেই ঘুরে ডানদিকের খাড়া পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। প্রচণ্ড চড়াই। ঐ পথ ধরেই কাল যেতে হবে ঢাকুরি।

মেঠো পথ ধরে ঘুরি। পথের ধারে একটা ছোট কালভার্ট। তার গায়েই পোষ্ট অফিস। এ অঞ্চলে যত গ্রাম আছে সবেরই ডাক বিলি করা হয় এই পোষ্ট অফিসের মারফত। হাঁটা পথে ডাক পিওনরা চিঠিপত্র আনা নেয়া করে। এক একটা ডাক পিওনের কর্মক্ষেত্র সেই হিসাবে চার পাঁচ বর্গমাইল জুড়ে। আর সেই জন্যই সপ্তাহে একবারের বেশী চিঠি বিলি করা সম্ভব হয় না।

পথের ধারে ছোট লাল রঙের ডাকবাক্সটি দেখে অরুণ ও সুধেন্দুর চিঠি ফেলার কথা মনে পড়ে। সেইসব নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আজ জমা পড়লো। পোষ্ট অফিসের সামনে এসে দেখলাম তালা বন্ধ। আজ দশেরার দিন, বন্ধ থাকারই কথা।

দশেরা পাহাড়ীদের একটা বড় উৎসব। এর পরের বড় উৎসব দেওয়ালি। সেদিন পাহাড়ী অঞ্চলগুলি যেন আলোর মালায় সেজে ওঠে। দেওয়ালির কথা মনে হতেই, মনে পড়ে শৈলরাণী সিমলার কথা। সেবারে দেখেছিলাম সিমলার দীপাবলী উৎসব। আলোয় আলোয় সারাটা শহর যেন জেগে উঠেছিল। পাহাড়ের মাথা থেকে নীচু পর্যন্ত ধাপে ধাপে সাজানো বাড়ীগুলোতে যেন জোনাকির হাট বসেছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

পথের দু'দিকে ফসল ভরা মাঠ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ক্ষেতে কাজ করে। কৃষি কাজই এদের প্রধান উপজীবিকা। ক্ষেত

খামারগুলো দেখে মনে হয় এ অঞ্চলের মাটিও উর্বর।

পথ চলি আর অবাক হয়ে দেখি কৃষক বধূরা কেমন আপন মনে ক্ষেতে কাজ করে। যেন ওদের কচি শিশুর মুখের পানে চেয়ে চেয়ে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখে। কাজের ফাঁকে তারা গান গায়। ভাষা বুঝি না। জানি না গানের মানে। তবুও যেন ভাল লাগে। অবাক হয়ে শুনি। স্থির হয়ে আসে চলার গতি। সব ভুলে পথের ধারেই দাঁড়িয়ে থাকি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে।

আমাদের দিকে চোখ পড়তেই ওরা গান থামায়। লজ্জায় মুচকে মুচকে হাসে। ওড়না দিয়ে আধখানা মুখ ঢেকে আবার কাজ শুরু করে। শীত আসছে। তাই ফসল তোলার কাজে ওরা ব্যস্ত। পাকা মকাইতে ওদের টুকরিগুলো লালে লাল হয়ে আছে।

সত্যি এই পাহাড়ী মেয়েগুলোর কঠোর পরিশ্রম দেখে বিস্মিত হতে হয়। ক্ষেতে লাঙল চালানো ছাড়া বাকী সব কাজই প্রায় মেয়েরা করে থাকে। স্বাস্থ্যবতী কর্মকুশলা কৃষাণীদের এই অসাধারণ নিপুনতার কথা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। ক্ষেতখামার ঘর সংসার সবই তারা এক হাতে সামাল দেয়। এদের কর্মদক্ষতার তুলনা হয় না। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও ওদের মুখের কোন পরিবর্তন হয় না। কোন ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে না। সর্বদা সেই লাল গাল দু'টো যেন হাসিতে ভরে থাকে।

আমাদের দেখে এক বুড়ো হুঁকো হাতে এগিয়ে আসে। হাত তুলে নমস্কার জানায়। জিজ্ঞাসা করি এটা কি তোমার ক্ষেত? হেসে বলে এটা ছাড়া পাশেরগুলোও আমার। সেখানে আলু হয়েছে।

সুধেন্দু একটা সিগারেট দিতেই বুড়ো খুবই খুশী হয়। ক্ষেত থেকে গোটা চারেক শালগম তুলে এনে হাতে দেয়। পয়সা দিতে যাই। কিন্তু কিছুতেই নেবে না। অদ্ভুত এদের ব্যবহার! এরা গরীব হলেও মানুষকে আপনার করে নিতে জানে। শহরের মানুষের মত এরা নয়। এরা সহজ সরল। এরা সৎ।

লোহারক্ষেত কৃষিপ্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম। চারিদিকে শ্যামল

শোভা। ক্ষেতের পর ক্ষেত।

পাহাড়ী অঞ্চলে কৃষিযোগ্য ভূমি তৈরী করতে মানুষকে অসীম পরিশ্রম করতে হয়। পর্বতগাত্রে সিঁড়ির মত ধাপ কেটে কেটে ওরা চাষের জমি তৈরী করে। তাতেই তারা নানা ফসল ফলায়। দূর থেকে ঐসব চাষের জমিগুলো দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে তুলি দিয়ে আঁকা বিচিত্র রঙের আলপনা। কি ভাবে ওরা কষ্ট ক'রে বন কেটে যে জমি বানায় তা সমতলের লোকেদের কল্পনাতীত। নালা কেটে দূর থেকে ঝর্ণার জল আনে। সময় উপযোগী শস্যের বীজ বপন করে। যতদিন না ক্ষেতের ফসল ঘরে উঠছে ততদিন যেন এদের বিশ্রাম নেই। বন্য পশু পক্ষীর মুখ থেকে ফসল বাঁচানো এক কঠিন কাজ। তার ওপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কখনও ধস নামে। কখনও বা বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

স্নিগ্ধ শ্যামল মাঠঘাট, ছায়াশীতল ঘন গাছপালা। পাশ দিয়ে বয়ে যায় স্রোতস্বিনী। গাছে গাছে পাখী। যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে বঙ্গজননীর স্নেহার্দ্র মুখের প্রতিচ্ছবি। সেই 'মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর'।

শান্ত নিরালা পরিবেশে মন্থরগতিতে এলোমেলো হাঁটতে বড়ই ভাল লাগে। ভাবি কত কথা। এটাতো জগৎ রামের গ্রাম! এটা ধরম সিং এর ঘর। এ যেন তাদের স্বপ্নপুরী। এ তাদের মাতৃভূমি। সুখ দুঃখের সাথী। ওরা কাল যাবে গ্রাম ছেড়ে ওপরে—আমাদের সাথে। তাইতো গেছে ওরা ঘরে। স্ত্রী পুত্র পরিবারের খবর নিতে। খাবারের ব্যবস্থা করতে। তাইতো ওরা আজ লোহারক্ষেত ছেড়ে ঢাকুরি যেতে রাজী হয়নি। অদ্ভুত এদের জীবন! এরা যেন পাহাড় আর প্রকৃতিতে গড়া।

বেলা পড়ে আসছে। সূর্য সরে গেছে পাহাড়ের কোলে। মিঠে মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দূরের ভ্যালিতে সোনার পরশ লেগেছে। অপর পাহাড়ের কোলে ছায়া নেমেছে। যেন অপূর্ব জাদুর ছোঁয়া লেগেছে পাহাড়ে পাহাড়ে।

চায়ের সময় হয়ে আসে। বাংলোয় ফিরি।

সেনরা সবে খেতে বসেছে। জগৎরাম তার ঘরে গিয়েছে। সুধেন্দু রান্নাঘরে ঢুকেছে কফির জল গরম করতে। আমরা মাঠে এসে বসি। একে একে সকলেই আসে। বেশ জমাটি আসর বসে।

এদিকে গ্রামের অনেক লোকই এসেছে। ডাক্তার সাহেবকে দেখার জন্য। তিনি অবশ্য এখনও এসে পৌঁছাননি।

ওরাও মাঠের এককোণে বসে বেশ গল্প জমিয়েছে। চৌকিদারও আছে। জগৎরাম ও হায়েদ সিং ফিরে এসে ঐখানেই বসেছে। নিশ্চিন্তে বিড়ি টানে। একটান টেনে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে খুকুর-খুকুর কেশে অপরকে এগিয়ে দেয়। ওরই মাঝে সুখ দুঃখের গল্প করে।

বসে ওদের কথা শুনি। আবার ব্যানার্জিদাকে দেখি। সেতো দিব্যি শুয়ে নাক ডাকছে। মিঠে হাওয়া। আর বিকেলের পড়ন্ত রোদে বসে সত্যি দু'চোখে ঘুমের আবেশ আসে।

ক্রমে বেলা গড়িয়ে গেল। বিকেল হয়েছে। আকাশ জুড়ে শুরু হয় নানা রঙের খেলা। মেঘের পাখায় পাখায় লাগে বিচিত্র বর্ণের বাহার। গোধূলির ম্লান অন্ধকারে আর সন্ধ্যার রক্তিম আভায় যেন চলেছে আলো ছায়ার অভিমানের পালা। বিদায় নিয়ে চলে গেছেন সূর্যদেব দূরে—ঐ পাহাড়ের আড়ালে। দিনান্তের আলোটুকু যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে আছে মাটির গায়ে। পূব আকাশে জ্বলে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতারা। দূরের পাহাড় যেন ঝাপসা হয়ে আসে। ঝোপে ঝাড়ে জ্বলে জোনাকির আলো। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক উঠেছে বনে বনে। তন্ময় হয়ে দেখি প্রকৃতির সান্ধ্য রূপ। হঠাৎ কানে আসে হেঁইয়ো হেঁইয়ো।

শব্দ শুনে অপেক্ষমাণ গ্রামবাসী যেন উৎসুক হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল্কি এসে থামে বাংলোর সামনে। ছ'জন পাহাড়ী ঘর্মাক্ত দেহে পাল্কি নামায়। গ্রামবাসীরা ভিড় করে দাঁড়ায়। বাচ্চা বুড়ো সকলেই এসেছে। যেন দেব দর্শনে।

ডাক্তারবাবু পাল্কি থেকে নামতেই চৌকিদার এক বিরাট সেলাম ঠোকে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে যায়।

ব্যানার্জিদা বসে বসে অবাক হয়ে দেখে ডাক্তার সাহেবকে। বিশাল দেহ। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। ঘাড় গর্দান মেদে ভরা। পরনে সরু পাজামা। গায়ে গলাবন্ধ ঢোলান সাদা কোট। মাথায় স্বদেশী টুপি। হাতে ছড়ি। চলার কায়দাও সেই রকমই দেখে আচমকা চেঁচিয়ে ব্যানার্জিদা বলে আরে বাপরে বাপ! এতো দেখেছি আমাদের মাননীয়···মহাশয়ের মত।

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে থাক্ থাক্ ব্যানার্জিদা—আর নয়। তুমিও কিছু কমতি যাও না।

আবেগ ভরে ব্যানার্জিদা বলে আরে একি ডাক্তার! আমার তো মনে হয় এর মাথার ভেতর শুধু ঘিউ আর রুটী ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করে পানুকে বলে যা তুই একবার তোর পাটা দেখিয়ে নে।

পানুও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে না বাবা আমার দরকার নেই। এখুনি হয়তো বলবে কাটনে হোগা।

সকলে হাসিতে ফেটে পড়ে।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এসেছে বিরাট বাহিনী। তারাতো হাঁক ডাক শুরু করেছে। চৌকিদার ভীষণ ব্যস্ত। আমাদের রান্নার জন্যে যে সব বাসনপত্র দিয়েছিল তার অধিকাংশই ফেরৎ নিয়ে যায়।

খানসামা ডাক্তারবাবুর চা জলখাবার নিয়ে ঘরে যায়। আমাদের এক রাউণ্ড কফি হয়। রাতের খাবারও তৈরী করে নিই। খিচুড়ি ও আলু পেঁয়াজ ভাজা। জগৎরাম সেটা নিয়ে আমাদের ঘরে রাখে।

দিনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। বাইরে বসার আর উপায় নেই। ঘরে ঢোকার পালা। কিন্তু এক সঙ্গে সকলে ঘরে ঢোকা মুশকিল। তাই উপায় না দেখে যাই ডাক্তার সাহেবের সাথে আলাপ করতে।

বাংলোর বারান্দায় তখন তিনি বিশাল বপুখানি এলিয়ে দিয়ে বসে ছিলেন। নমস্কার জানিয়ে পাশের চেয়ারে বসে আলাপ করি।

তিনি একজন চক্ষু চিকিৎসক। গ্রামের একজনের চোখ দেখতে এসেছেন।

কথার মাঝে তিনি আমাদের খবর জিজ্ঞাসা করায় বলি কলকাতা থেকে এসেছি পিণ্ডারী যাব বলে। বেড়াতে যাচ্ছি শুনে তিনি আনন্দিতই হন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন আমারও পিণ্ডারী দেখার ইচ্ছে আছে। ওনার কথা শুনে মনের ভেতরে যেন হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলক মারে। ভাবি আবার কি ইনি পিণ্ডারী যাবেন। আবার সেই বাংলোয় থাকার অসুবিধায় পড়তে হবে। তাই অতি সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করি কাল কি তাহলে পিণ্ডারী যাচ্ছেন? তিনি একগাল হেসে বলেন না না কাল আমি পিণ্ডারী যাচ্ছি না। কালতো ইধার সুঁই দেনে হোগা। অপারেশন ভি করনে হোগা। এ দফে হাম পিণ্ডারী যায়েগা নেহি। পিছু এক দফে ট্রাই করেগা। শুনে আশ্বস্ত হই। সুধেন্দু পাশ থেকে ফিসফিস করে বলে যাক্ বাঁচা গেল। তুই এখন আসল কথাটা পেড়ে ফেল। একটা ঘর ছেড়ে দিলে একটু আরামে থাকা যায়।

আমাদের ক্ষণিক নীরব থাকতে দেখে ডাক্তারবাবু নিজেই জিজ্ঞাসা করেন আপ দুসরা কই জায়গা মে ঘুমা? কেদার-বদ্রী গিয়া? সঙ্গে সঙ্গেই বলি গত বছরই কেদার-বদ্রী ঘুরে এসেছি।

আপ কেদার-বদ্রী দর্শন কিয়া! তবতো হাম আপকো পাশ কাহিনী শুনে গা। আপ কোন কামরামে উঠা?

হতাশার বুকে আলোর আভা দেখে মৃদু হেসে বলি ট্রেন ছ'ঘণ্টা লেটে আসায় আমাদেরও এখানে পৌঁছাতে একদিন দেরী হয়ে গেছে। তারওপর দলে বারোজন আছি। আর সেই জন্যই আজ বাংলোয় জায়গা পাইনি। তবে ঐ নীচের একটা ঘর পেয়েছি। এখন তো সেখানে সবাই বসে আছে। রাতমে থোরা তকলিব হোগা। উষমেই শো যায়েগা।

তিনি শুনে বলেন কাহে তকলিব করেগা। আপ ইধার মে চলা আইয়ে। দো বড়া কামরা হ্যায়। এক হাম লিয়া। দুসরা আপ লেলিজিয়ে। চৌকিদারকো হাম বোল দেতা।

ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে সকলেই আহ্লাদে আটখানা।

চোকিদারকে ডেকে আমাদের জন্য পাশের ঘরটি খুলে দিতে বলেন। মালপত্র নিয়ে সকলে ঘরে এসে বসে।

এদিকে আরও এক বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পিণ্ডারী থেকে ফিরেছেন। তাঁরা নীচের ডানদিকের ঘরে উঠেছেন।

সেখানে যাই তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে ও পিণ্ডারীর পথের খোঁজ খবর নিতে।

ভদ্রলোক সব সময়ই যেন আমাদের এড়িয়ে চলতে চাইছেন। আর ভদ্রমহিলা অনর্গল বক্‌বক্ করে চলেছেন। যতবারই ভদ্রলোকের নাম বা খবরাখবর নেবার চেষ্টা করি ততবারই দেখি ভদ্রমহিলা পিণ্ডারীর প্রশ্নে চলে যান। ঠিকানা ইত্যাদি কিছুই বলতে রাজী নন। শুধু ছেঁদো গল্প ফাঁদেন। যাইহোক তিনি কেবল বলেন যে তাঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন। আধাবৃদ্ধ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার আচরণে সকলেরই কৌতূহল জাগে।

সুধেন্দু ফিসফিস করে বলে এদের দেখে তো মনে হয় না স্বামী স্ত্রী। অরুণ বলে আরে না না—এরা হয়তো ইস্কুলের মাষ্টারমশাই আর দিদিমণি হবে। সেন অরুণের কথায় প্রতিবাদ করে বলে তা'হলে বলতে দোষ কি? আসলে এঁরা প্রেমিক-প্রেমিকার জুটি। হিমালয়ের এই গহন কন্দরে এসেছে হানিমূন করতে। অজিত আমার ঘাড়ে জোরে আঘাত করে বলে কপোত কপোতী।

জানি না বাবা অতশত কথা। শোন তোমরা ওর বকবকানি। ইংরাজীতে কি আবার বলছেন। দেখ সেটা আবার কায়দা কি না? আমি তার চেয়ে বারান্দায় গিয়ে বসি।

অজিত ও স্বপন আমার হাতখানা চেপে ধরে। বলে একটু দাঁড়িয়ে শুনে যাও না মজার গল্প।

ভদ্রমহিলা কায়দার সুরে বলেন Pindari is a very beautifull glacier. We found snow at Phurkia. ফুরকিয়া থেকে পিণ্ডারীর পথেও কিছু কিছু জায়গায় বরফ পেয়েছি। But it is very pleasant after all.

আর জানেন—খাতি এক অপূর্ব স্থান। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। দূরে হিমালয়ের রজত শুভ্র কিরীটমালা। শান্ত নির্জন পরিবেশ। অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরা। রাতের আলোয় আরও wonderful দেখায়। একটু গলার সুর নামিয়ে বলেন যেতে অবশ্য কষ্ট হবে তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। একদিনে না পারেন তো দু'দিনে যাবেন। আবার মৃদু হেসে বলেন আমরা অবশ্য খুব হাঁটতে পারি তো তাই একদিনেই পৌঁছেছিলাম।

হঠাৎ রান্নাঘর থেকে সেনদের প্রেসার কুকারের হুইসেলের শব্দ কানে আসতেই জিজ্ঞাসা করেন কি খাবার তৈরী করলেন। সেন হেসে বলে খিচুড়ি।

তিনি যেন শুনে অবাক হয়ে বলেন সেকি why don't you take any meat ?

সেন যেন একটু হতভম্ব হয়ে বলে এখানে মাংস কোথায় পাব ?

Strange ! আপনারা হিমালয়ে ঘুরতে এসেছেন অথচ টিনের মাছ মাংস কিছুই আনেননি। How you will keep your body warm ? দেখুন তো আমাদের এ সবের পাকা ব্যবস্থা।

অজিত বেশ রসিয়ে বলে আপনাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনারা হয় অভিযাত্রী না হয় শিকারী। তবে শেষটাই মনে হয় ঠিক।

অরুণ ধমক দিয়ে বলে কি হচ্ছে অজিত।

সেন একটু বিনয়ের সঙ্গে বলে কিছু মনে করবেন না সঙ্গে বোধ হয় ছোট খোকাও নিয়ে এসেছেন শরীর গরম করাব জন্য।

What do you mean by choto khoka ?

সুধেন্দু বলে আরে ছোট খোকা মানে বুঝলেন না—মালের

বোতল। অর্থাৎ হুইস্কি, জিন, রাম ইত্যাদি।

ভদ্রমহিলা হাসিতে যেন ডগমগ করে ওঠেন। খুশীর মেজাজ নিয়ে বলেন ছিল বৈকী। এক বোতল এনেছিলাম। আর ঐ বোতলটা ছিল বলেই ফুরকিয়ায় রাত কাটানো সম্ভব হয়েছে। সে যা ঠাণ্ডা তাতে ঐ বোতলটাই ছিল যেন আমাদের পরম বন্ধু। এখনও একটু তলানি পড়ে আছে সেটা আজ রাত্রেই····।

ভদ্রমহিলার কথাবার্তায় আমার বড় বিরক্ত বোধ হয়। আমি চলে আসি। সেনরাও চলে আসছিল, তিনি তাদের ডেকে বলেন শুনুন শুনুন—সকালে মুখে বেশ ভাল করে বোরোলিন মেখে, মাথায় টুপি দিয়ে বের হবেন। মাফলারটাও যেন জড়াতে ভুলবেন না। সেন গজগজ করতে করতে ফিরে আসে। বলে কথা শুনলে মনে হয় যেন...।

ঘরের দরজা খুলেই দেখি ব্যানার্জিদা, নাড়ু দিব্যি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছে। পান্নু পায়ের ব্যথায় কাতর। ওষুধ লাগাচ্ছে। টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। দত্তগুপ্ত মনোজ ও সমীর বসে চিঠি লিখছে। পাশের ঘরে ডাক্তার সাহেব সান্ধ্য ঘুমে অচেতন। তাঁর নাসিকা গর্জনে সারা বাংলোখানি যেন সরগরম। যেন শত শত সৈন্যের ফায়ারিঙের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

কম্বলখানি জড়িয়ে বাংলোর বারান্দায় বসি। চাঁদ উঠেছে নীল আকাশে। ঐ পাহাড়ের মাথায়। মধুর কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে দিক থেকে দিগন্তে। কুয়াশার মায়াজাল যেন বিছিয়ে আছে প্রকৃতির অঙ্গে। হাল্কা মেঘের দল আনন্দে কেমন দুলে দুলে পাড়ি দিয়ে চলেছে এদিক থেকে ওদিকে। চন্দন বর্ণা রাজকন্যার সলজ্জ মুখের উপর পাতলা ছায়া ফেলে কেমন চলেছে তারা ভেসে ভেসে স্নেহ চুম্বন দিয়ে। ক্ষণিক যেন ওড়নার তলে মুখ লুকায়। আবার দেখি অতি ধীরে সন্তর্পণে চাপা দেওয়া ওড়নাখানি অল্প ফাঁক করে টুল-টুলে হাসি হাসে। যেন মাতৃত্বগর্বের মহিমা ও প্রসন্নতার দীপ্তিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে।

ফুলের সুবাস। ঠাণ্ডা বাতাস। নদীর গুন-গুনানি আর তারাদের মিটিমিটি চাউনি। ঝিল্লির ঝনক আর জোনাকির ঝিলিমিলি আলো। চাঁদের স্নেহ মাখা কিরণস্নাত নীল আকাশ যেন মনের কথা জেনে অলক্ষ্যে অন্তরে প্রবেশ করে সুপ্ত মনের ঘুম ভাঙায়। রুদ্ধ দুয়ার যায় খুলে। সারাদেহ শান্তিতে ভরে ওঠে। মুগ্ধ নেত্রে নিবিষ্ট চিত্তে চেয়ে থাকি অসীমের দিকে। মন যেন ভেসে বেড়ায় ঐ মেঘদলের সাথে।

আজ বিজয়ার দিন। সুধেন্দু ডাকে। উঠে ঘরে যাই আলিঙ্গন করতে। নির্জন পাহাড়তলির মাঝে আজকের এই মধুর সম্পর্কটুকু এক অপূর্ব অনুভূতি জাগায়।

॥ ৭ ॥

ভোরে ঘুম ভাঙে। চেয়ে দেখি তরুণ তপন যেন পুরোহিত হয়ে এসেছেন আলোর অভিষেকে। পৃথিবীর কপালে মঙ্গল তিলক এঁকে দিতে। প্রভাতী আলোর রেখা এসে পড়েছে ধরণীর বুকে। রাত্রির অবসানে তারও ঘুম ভেঙেছে। সুরের জলসা যেন শুরু হয়েছে প্রকৃতিব অঙ্গনে। পাখীরা জেগেছে। জেগেছে বনভূমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে। মেঘের টোপর মাথায় দিয়ে গ্রামখানি যেন খুশীতে ডগমগ।

অদেখাকে দেখার আশায় চরণ ও মন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। চা খেয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হই।

সকাল ছ'টা। নন্দাদেবীর জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করি। বাংলোর ডান দিকের উত্তুঙ্গ চড়াই পথ ধরে যেতে হবে ঢাকুরি। আবার সেখান থেকে খাতি। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখি সেই উত্তুঙ্গ চড়াই। ভীষণ ভয়াবহ। যেখানেই পা ফেলি সেখানেই মাটি ও পাথর পায়ের তলা থেকে ঝুরঝুর করে সরে যায়। ডান দিকে তাকালে বুক যেন কেঁপে ওঠে। পথের গা থেকে নেমে গেছে বিশাল খাদ। অতি সন্তর্পনে পা ফেলে উঠি।

সোনালী রোদ ঝলমল করে। বিশ্ব প্রকৃতি যেন হাসতে

থাকেন। মন ভরা আনন্দের পসরা নিয়ে চলতে থাকি।

পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। ফিরে তাকাই। নীচে গাছপালার মধ্যে ফেলে আসা লোহারক্ষেতের বাংলোখানি দেখা যায়। চলার পথে একদিনের আশ্রয়। ক্ষণিকের পরিচয়। তবুও মনে হয় যেন কত কালের জানা শোনা ঘর বাড়ি। মনে মনে মনে ভাবি গৃহবাসের মায়ার বুঝি এমনই বন্ধন! যত চড়াই ভেঙে উঠি ততই যেন বাংলোখানি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়। ক্রমে দেশলাই বাক্সের আকার নেয়। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে দেখি। সবুজ বনের আড়ালে দেখা যায় তার লাল টিনের ছাউনিখানি। যেন সবুজের মাঝে প্রদীপ শিখার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে।

দেখি ক্ষেতখামার। যেন বিচিত্র বর্ণের কার্পেটে ঢাকা ধরিত্রীর অঙ্গ। কে যেন নিখুঁত করে সাজিয়ে রেখেছে সযত্নে। ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে সে দৃশ্য লুকায়। সম্মুখে ভয়ঙ্কর চড়াই। শিশিরে ভেজা পাইনের ঝরা পাতায় পথ ভীষণ পিচ্ছিল। এক পা এগিয়ে যেতে যেন তিন পা পিছিয়ে পড়তে হয়। তবুও বুকে বড় আশা। যাব পিণ্ডারী দেখতে। পা টিপে টিপে পথ চলি।

দুর্গম দুরূহ চড়াই ভাঙতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। পিপাসায় বুকের ছাতি যেন ফেটে যায়। জলের চিহ্ন দেখি না। ঘন ঘন দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে ইচ্ছে করে। মুখে ভিজে ছোলা পুরে আবার পূর্ণ উদ্যমে উঠতে থাকি। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এই বাঁকেই বোধ হয় চড়াই শেষ। সেখানে পৌঁছে দেখি আবার চড়াই।

চারিদিকে গভীর বন। পাখীর গানে গানে ভরে আছে বাতাস। যেন পথ ক্লান্ত পথিকের মন ভোলায়। উৎসাহ পাই। ধীরে ধীরে পাথরের বুকে পা ফেলে উঠতে থাকি।

শীতের সকাল। তবুও সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে। পথ বুঝি আর শেষ হবার নয়। শুধু চড়াই আর চড়াই। এ যেন দুরন্ত অভিযান।

গভীর বনপথ। দিনের আলোও যেন হারিয়ে যায়। নিস্তব্ধ

বনের মাঝে শুকনো পাতায় পাতায় ভাঙা ডালে কেবল নিজের পায়ের ধ্বনি শুনি। পাতা ঝরার মৃদু আওয়াজটুকুও যেন পরিষ্কার শোনা যায়। শুনি অদৃশ্য ঝর্ণার অস্ফুট কুলকুল কলরোল। বাঁক ঘুরতেই দেখি এক রূপোলী ক্ষীণ ঝর্ণা। পাথর থেকে পাথরে গড়িয়ে পড়ে মুক্ত গলা জল। পিঠের বোঝা নামিয়ে ক্ষণিক বসি। আরামে জলপান করি। বন্ধুরা আসে। আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠা।

রোদের তেমন তেজ নেই। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ যেন সামিয়ানা টাঙিয়ে পথের উপর ছায়া ফেলে। আদিম অরণ্যানী। নানা আকৃতির প্রকাণ্ড সব গাছের জটলা। তারি ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে সুনীল আকাশ। সামনের দৃশ্য যায় খুলে। পাহাড়ের পর পাহাড়। সারি সারি স্তব্ধ হয়ে কেমন দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা নেড়া রুক্ষ কঠোর। কোথাও পাহাড়ের গায়ে গভীর বনের সবুজ আচ্ছাদন।

নতুন পথ। নবতম বৈচিত্র্যের পুলকে মন ভরে। নবীন উৎসাহে এগিয়ে চলি।

দু'পাশে পাইন গাছের সারি। সবুজ ঘাস। নানান বনফুলের মেলা। মাঝে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে। যেন অজানা জগতের সন্ধান দিয়ে।

ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি আসে। রঙের নেশায়। ফুলে ফুলে মধু খোঁজে। গুনগুন করে মৌ-চোরের দল। ফুলের লতায় পাতায় ডালে ডালে যেন রঙেব মাতন লেগেছে। দূরে দিক্‌চক্রবালে দেখা যায় তুষারের গিরিশ্রেণী। সূর্যালোকে ঝিলমিল করে। প্রতি বাঁকে, প্রতি পদক্ষেপেই যেন নিত্য নতুন দৃশ্য। তবুতো মন ভরে না। দু'চোখে খালি দেখার নেশা। চড়াই পথে বাঁক ঘুরি। সে দৃশ্য যেন মুখ লুকায়।

সামনে দেখি আনন্দদায়ক শ্যামল কোমল তৃণভূমি। এ যেন প্রকৃতিরাণী ক্লান্ত পথিকের জন্য সুখ শয্যা পেতে রেখেছেন। ধীরে

চড়াইটুকু পেরিয়ে শ্যামল প্রান্তরে এসে বসি।

উপরে সুনীল আকাশ। নীচে কচি সবুজ গালিচায় ঢাকা মাঠ। চারিপাশ ঘিরে পাহাড়ের প্রাকার। ছড়ানো বনফুলের শোভা। শান্ত মনোরম পরিবেশ।

একফালি সোনালী সূর্যের প্রভা এসে পড়েছে সবুজ দূর্বাদলে। ভেজা ঘাসের ফলকে ফলকে যেন রামধনু রঙের খেলা চলে। মিষ্টি মধুর বাতাস এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ক্লান্ত দেহ যেন ক্ষণিকেই সতেজ করে। দু'চোখ কেমন যেন মোহময় হয়ে ওঠে। জননী বসুন্ধরার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করি।

জগৎরাম আসে। সেও বসে বিড়ি টানে। গল্প চলে। আবার যাত্রা শুরু। পথ খাড়া ওঠে। সমতলের মানুষ। অনভ্যস্ত পদ-চারণায় পা যেন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। তবুও নয়নের রূপ তৃষ্ণায় সে ব্যথা ক্ষণিকেই ভুলি। পাথরের পর পাথর। দল বেঁধে পিঁপড়ের সারির মত ওঠে সবাই পাহাড়ের মাথার দিকে।

কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। মুছে ফেলি। আবার হয়। পা চালাই দ্বিগুণ জোরে—তবুও পথটুকু যেন আর ফুরায় না। এ তেপান্তরের মাঠের আর যেন শেষ নেই।

ক্রমে আমরা ঢাকুরি খালের দিকে এগিয়ে যাই। খাল অর্থ গিরিবর্ত্ম। বনের পথ। দু'দিকে ঘন গাছের বন। সামনে অরণ্যলোকের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় নন্দাদেবী শৃঙ্গমালা। যেন সবুজের বুকে হীরকের আত্মপ্রকাশ। পাখামেলা পাখীর মত মেঘের দল চলেছে উড়ে উড়ে—ঐ নীল আকাশে। মন যেন রুদ্ধ দুয়ার খুলে ছুটেছে ঐ পথে। শুধু চাওয়া আর পাওয়া।

বাঁক ঘুরে কিছুটা আসতেই দেখি সুন্দর সবুজ একফালি মাঠ। অসংখ্য ভেড়ার পাল ঘাস খেয়ে বেড়ায়। আর গাছের ছায়ায় বসে পাহাড়ীরা তামাক খায়। সেদিকে ভাল ভাবে চাইতে না চাইতেই হঠাৎ দেখি দু'টো ধুমসো কালো কুকুর তড়িৎ গতিতে চিৎকার করে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। ভয়ে জড়সড় হয়ে

দাঁড়িয়ে পড়ি। যদিও জগৎরাম সঙ্গেই আছে তবুও ওদের আস্ফালনে বুকটা টিপটিপ করে ওঠে। জগৎরাম আমাদের দেখে হাসে। পাহাড়ীরা অদ্ভুত গলার শব্দ করে কুকুরগুলোকে ডাকে। কুকুর প্রভুভক্ত জন্তু। চেনা গলার আওয়াজ পেয়েই লেজ নামিয়ে সুড়সুড় করে পথ ছেড়ে ফিরে যায়। আমরাও ঢাকুরি খালে পৌঁছাই।

ঢাকুরি খালের উচ্চতা ৯৪০০ ফুট। লোহারক্ষেত থেকে পথও প্রায় মাইল পাঁচেক। কিন্তু হলে হবে কি। লোহারক্ষেত থেকে সুদূর প্রসাবী গিবিশিরার কোথাও এগার হাজার ফুট কোথাও বা তার চাইতে কিছু বেশী উচ্চতায় উঠতে হয়। সারা পথটাই চড়াই। বনের পথ। মাইলের তফাৎ যাইহোক না কেন উচ্চতার তফাৎ হাজার চারেক ফুট।

ঢাকুরি খাল। উচ্চতায় ৯৭০০´। গিরিবর্ত্মের উপরে এক-ফালি সমতল প্রান্তর। আর সেখানেই রয়েছে এক বিরাট কালো পাথর। এই পাথর খণ্ডের পাশেই বাঁশের মাথায় রঙিন কাপড়ের নিশান হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। পাথরেব আশেপাশে অসংখ্য ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো গাছের ডালে বাঁশেব খুটিতে মালার ন্যায় ঝুলছে। অসংখ্য ফুল দিয়ে সাজানো আছে পাথরটিকে। পিঠের বোঝা নামিয়ে তার পাশে গিয়ে বসি। মনে মনে ভাবি এই শিলাখণ্ডটিকে কি পাহাড়ীরা কোন দেব দেবী বলে মনে করে।

ঢাকুরি খালের একটু নীচেই একফালি সবুজ মাঠ। চারিপাশ গাছে ঘেরা। সেখানে অসংখ্য ভেড়ার পাল ঘুরে বেড়ায়। আর এককোণে পাহাড়ী যাযাবরদের অস্থায়ী ঘর।

অদ্ভুত এদের জীবন! বছরের বেশ কয়েক মাস ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে এসে থাকে এইসব বুগিয়ালে। খাবার-দাবার ছেলে-পিলে বৌ সঙ্গে নিয়ে এসে বাসা বাঁধে এইসব নির্জন এলাকায়। বুগিয়ালের ঘাস আর এই জল হাওয়ায় ভেড়া ছাগলগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচুর পশম সংগ্রহ করে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থেকে, শীতের আগে ওরা নীচে নেমে যায়। ছাগল ভেড়া

ও পশম বিক্রি করে এদের যা কিছু উপার্জন হয়।

জগৎরাম আসে। মালের বোঝা নামিয়ে প্রথমেই নতজানু হয়ে পাথরটিকে প্রণাম করে। বলে বাবুজি প্রণাম করিয়ে—ইয়ে নন্দাভগবতী।

জগৎরাম পকেট থেকে একটা লাল হলদে রঙের সুতো বের করে গাছের ডালে বেঁধে দেয়। গাছের পাতার উপর গোটা কয়েক লজেন্স সাজিয়ে ফুল তুলে এনে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে নন্দাদেবীর পূজো করে। আমরাও দু'হাত ভরে বনফুল তুলে এনে অঞ্জলি দিই। নন্দাভগবতীর পূজো হয়। প্রসাদ পাই।

জগৎরাম বসে বিড়ি টানে আর বলে বাবুজি নন্দাভগবতীর পূজো করে ওপরে উঠতে হয়। নইলে নন্দামাইজি বিরূপা হন। প্রতি পদে পদে বিপদ হতে পারে। যারা নন্দাভগবতীর পূজো না করে এই সব অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে তাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাণিও মরে অনেক সময়। নন্দাভগবতী জাগ্রতা দেবী। তাঁর অঞ্চলে যাচ্ছেন—অনুমতি নিন। নইলে ভীষণ বিপদ হতে পারে। তিনি অনুমতি দিলে তবেই তো আপনারা ঘুরতে পারবেন।

আশ্চর্য পাহাড়ীদের মন। নন্দাদেবী সম্বন্ধে অদ্ভুত এদের ধারণা। এই নন্দাদেবীকে উদ্দেশ্য করে কত গান, গাথা এরা সৃষ্টি করেছে। কত অলৌকিক কাহিনী এরা শোনায়। পৌরাণিক মিল থাকুক বা নাই থাকুক শুনতে বড়ই ভাল লাগে। এরা নন্দা-দেবীকে শক্তি সম্পন্না দেবী বলে মনে করে। এদের বিশ্বাস দেবীর করুণায় এরা সুখ দুঃখ ভোগ করে। সেইজন্য যে কোন কাজ করার আগে এরা দেবীর শরণাপন্ন হয়। এমনকি কারও রোগ ভোগ, অথবা ক্ষেতখামারে ফসলহানি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি হলে এরা মনে করে দেবী এদের প্রতি রুষ্টা হয়েছেন। তখন এরা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজো, মেষ ছাগল বলি দিয়ে থাকে।

জগৎরামের কথামত আমরাও ভক্তি ভরে নন্দাদেবীকে প্রণাম জানাই। মনে মনে দেবীর এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার জন্য

অনুমতি প্রার্থনা করি।

বসে দেখি প্রকৃতির নৈসর্গিক শোভা। চারিদিকে শ্যামল বন রাজি। সামনে দূরে হিমবান হিমালয়ের তুষারমৌলি শৃঙ্গমালা। নন্দাদেবীর যুগল শৃঙ্গ, নন্দাকোট আর পাঁওয়ালী দোয়ার পর্বত মালার পিছনে উঁকি দেয় নেপাল হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গমালা। যেন দিগবলয়ে প্রসারিত হিমালয়ের অন্তহীন শুভ্র কেশরজাল। সংখ্যাতীত শ্বেত চূড়ার উপর পড়েছে সূর্যরশ্মি। যেন গলিত গৈরিক প্রবাহ নামে দেবাদিদেবের কপাল বেয়ে। পরম বিস্ময়ে দেখি। যেন স্ফটিক স্তম্ভের উপর আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এতো স্বপ্ন নয়! মায়া নয়! এতো বিশ্ব শিল্পীর আলোক লীলা। মাথা নত করে প্রণতি জানাই।

সোনার আলোয় ভরে গেছে অগাদ আকাশ। সারাটা দিক্ দিগন্ত যেন রৌদ্রস্নাত। বিশাল বৃক্ষরাজির শ্যামল পাতায় পাতায়, বনফুলে ছাওয়া সবুজ মাঠে, কচি দূর্বাদলে ঝরেছে কেমন সোনার আলো। যেন প্রকৃতির আঙিনায় লেগেছে খুশীর আমেজ। সবুজে সোনায় মেলানো রেশমী শাড়ি পরে এসেছেন প্রকৃতিরাণী পথিকের মন ভোলাতে।

বাতাস কেমন দোল দিয়ে যায়। দোলা লাগে ফুলের বনে। দোল দেয় আমাদের মনে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকি শাশ্বত সুন্দর হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর রূপের দিকে। যেন শুভ্র সমুজ্বল টানা টানা রূপোলী চোখ মেলে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে—কাছে আয়, কাছে আয় বলে। কুয়াশায় কখনও অবলুপ্ত কখনও সূর্যকিরণে প্রতিভাত শিখরগুলি যেন মনের সাথে লুকোচুরি খেলে। অবুঝ মন সেতো আর বোঝে না। চায় সে দু'হাত দিয়ে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে ডুব দিতে ঐ রূপের অঙ্গনে। কেমন যেন আত্মভোল্লা করে তোলে।

মাঝে মাঝে চোখ পড়ে সবুজ মাঠে। ভেড়ার দল আপন মনে নিরুদ্বিগ্নে ঘাস খেয়ে বেড়ায়। বাতাসে ভেসে আসে তাদের

গল ঘুন্টির টুংটুং রিণিরিণি সুরের ঝঙ্কার। নির্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে আমাদের কানে।

বাতাসে ওড়ে পতাকাখানি পতপত করে। যেন মনের মাঝে উড়ায় কে বিজয় কেতন। ভাবি কত কথা। নিঃশ্বাস পড়ে। নীরবে বসে দেখি।

এ অঞ্চলে দেব মন্দিরে বা ধর্মীয় স্থানে যে সমস্ত পতাকাগুলি দেখা যায় সেগুলো বৌদ্ধ-গুম্ফার পতাকার ন্যায়। পতাকার কাপড়গুলো আড়াআড়ি ভাবে না বেঁধে লম্বাভাবে বাঁধা হয়। এ ধরনের পতাকা দার্জিলিঙের বৌদ্ধ গুম্ফায় বা অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠে দেখা যায়।

আকাশের দু'কোণ থেকে মেঘেরা চলেছে ভেসে ভেসে। চলেছে তারা যেন ধূসর পতাকা উড়িয়ে শিখবদেশের দিকে। ঘন মেঘেব জালে দেবাদিদেব যেন লুকিয়ে পড়েছেন। আবার দেখি তাঁব ত্রিনয়নের জ্যোতিচ্ছটা। মন যেন আঁকুপাঁকু করে ওঠে।

জগৎরাম খুশীর মেজাজ নিয়ে, হাত দু'টো শূন্যের দিকে তুলে গান ধরেছে 'ও নন্দামাইয়া…।' মাঝে মাঝে গায় আর কাহিনী বলে। হাত দিয়ে দেখায় গিরিরাজের উজ্বল দীপ্তি আর মেঘের খেলা। নিজের মনেই বলে কি অপূর্ব দৃশ্য! এযেন নন্দাভগবতী আবেগ ভরে মহাদেবের সাথে প্রেমালাপ করছেন। ঐ দেখুন নন্দামাই যেন হাত দিয়ে মহাদেবের চোখ দু'টো চেপে ধরেছেন। চারিদিক অন্ধকার।

যত দেখি আর শুনি ততই যেন মনটা হাল্কা হয়ে যায়। ও কাহিনী বলে।

শিব ধ্যানে মগ্ন। নন্দাভগবতী তাঁর সেবা যত্ন করে চলেছেন। মনে মনে খুবই ইচ্ছে শিবকে তিনি বিয়ে করবেন। শিবের রূপে তিনি মোহিত। কিন্তু সে কথাটা তিনি যেন মুখ ফুটে বলতে পারেন না। তাই তপস্যারত শিবের পরিচর্যায় তিনি মগ্ন হয়ে থাকেন। জল না চাইতেই জল এনে দেন। ক্ষিদে না পেতেই

ফল আনেন। নানা ফুল দিয়ে তাঁর আসন সাজান। বুকভরা আশা আর প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে সবসময়ই তাঁর পাশে থাকেন। দেখতে দেখতে শিবেরও মন মজে। দু'জনাই দু'জনকে আবেগে একে অপরকে স্নেহ চুম্বন করেন। নন্দাভগবতী তাঁর কোমল হাতখানি শিবে সারা শরীর বুলিয়ে দেন। আনন্দের হাসি হেসে শিবের কোলে লুটিয়ে পড়েন। পরিহাসচ্ছলে দু'হাত দিয়ে শিবের চোখ দুটো চেপে ধরেন। যেন ছোটবেলার সেই লুকোচুরি খেলা শুরু হয়। শিবের চোখ বন্ধ। পৃথিবী অন্ধকার। আলোকবিহীন পৃথিবীর সমস্ত মানব বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখে স্বর্গরাজ্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। একি সর্বনাশ! শিব মৃদু হাসেন। তাঁর ললাট থেকে তৃতীয় নয়নের উদ্ভব হয়। তীব্র জ্যোতি ঠিকরে পড়ে। এ জ্যোতি প্রবাহে শিব ও নন্দার মিলন ঘটাতে এসে কামদেব অর্থাৎ মদন ভষ্মীভূত হয়। দগ্ধ হয় হিমালয়। নন্দাভগবতী হিমালয়ের এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। একি হিমালয় দগ্ধ! তাঁর পিত্রালয়ের একি চেহারা! তিনি শোকে ক্ষোভে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ভাবেন একি করলাম! নির্বাক হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন। শিব ভালবেসে আবার নন্দাকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁদের বিয়ে হয়। হিমালয়ের সৌন্দর্য ফিরে আসে। পরে অনুতপ্ত মহাদেব মদনকে কৃষ্ণের প্রত্যুম্ন রূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন।

কাহিনী শুনতে শুনতে আবার ঝলমল করে রোদ ওঠে। আবার গিরিরাজ হাসতে থাকেন। আলোকজ্বল দীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মন ভরা আনন্দ নিয়ে পথ চলি।

ঢাকুরি খাল থেকে ঢাকুরি বাংলো প্রায় আটশো ফুট নীচে। ভীষণ উৎরাই পথ। এতক্ষণ যেমন কষ্ট করে চড়াই ভাঙতে হয়েছে তেমনি ঠিক উৎরাই। খাড়া নেমে গেছে। হুড়হুড় করে নেমে চলি। নিজেকে সংযত রাখাই কঠিন। পিঠের বোঝার ভারে পা ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর পড়ছে। সন্তর্পণে পা ফেলার চেষ্টা করি কিন্তু উপায় নেই। উৎরাই পথ যেন টেনে নামায়।

কখনও ঘাস কখনও পাথুরে পথ ধরে চলি। সামনে দূরে দূরে দেখা দেয় স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নানা বর্ণের পর্বতমালা তার পশ্চাতে দাড়িয়ে আছে বরফে ঢাকা শিখরগুলি। মনের আনন্দে যেন দৌড়ে নামতে থাকি। পানু প্রথম থেকেই অতি সন্তর্পণে নামছে। তার পায়ের অবস্থা অতি শোচনীয়। জুতো খুলে ফেলেছে। মোটা মোজা পড়ে হাঁটছে। পায়ের অসংখ্য ফোসকা ফেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। অজিত আমি সেন একই তালে চলেছি। অরুণ ও সুধেন্দু একটু এগিয়ে। দেখতে দেখতে এসে পড়ি সবুজ উপত্যকায়। কাঁচা মিঠে রোদে ভরে আছে সারাটা পথ। গাছের সারি। মধুর বাতাস। দূরে দেখা যায় ঢাকুরি বাংলো। দূর থেকে ভারি সুন্দর লাগে।

চারিদিকে প্রকৃতির শ্যাম শোভা। মাথায় সুনীল আকাশ। সোনাঝরা রোদ। সামনে তুষারমৌলি শিখরাবলি। তারি মাঝে ছোট্ট বাংলোখানি—যেন কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক অপূর্ব ছবি। পথ যত এগিয়ে যায় ততই মন বিস্ময়ে ভরে। ক্লান্তি অবসাদ সবই যাই ভুলে। বুক ভরে অসীম আনন্দে। সকাল তখন দশটা ঢাকুরির বাংলোয় (৮৬০০´/৬ মাইল) এসে পৌছাই।

হিমগিরির কন্দরে স্বর্গীয় শোভার মাঝে বিরাজ করে ঢাকুরি বাংলো। যেন মধুময় প্রকৃতির কোলে দোলে এক সুন্দরী ললনা।

গহন বনে ঘেরা। সবুজ তৃণভরা মাঠ। দূরে আকাশচুম্বী গিরিশ্রেণী। তুষারাবৃত শিখর। আশেপাশ ঘেরা পাহাড়ের শ্যাম অঙ্গে রেশমী আবারণ। সোনালী সূর্য। আর রূপোলী মেঘের পাখা মেলা বিচরণ। শিখরে শিখরে মনিঃপ্রভা। নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশ। এ যেন প্রকৃতির এক শব্দহীন দীপ্তি! কি মধুর না লাগে! পিঠের বোঝা নামিয়ে বারান্দায় বসি।

ছোট্ট বাংলো। একখানি ঘর। সামনে একফালি বারান্দা। পাশে সবুজ আঙিনা। তাতে ইতস্ততঃ মরসুমী ফুল ফুটে আছে। যেন প্রকৃতিরাণীর শ্যামল শাড়ির বুকে ফুল তোলা নক্সা কাটা।

চৌকিদার আরামে রোদ পোয়াচ্ছিল। আমাদের দেখে উঠে আসে। ঘর থেকে খান কয়েক চেয়ার বের করে দেয়। বসে দেখি সুন্দরী প্রকৃতির রমণীয়া দৃশ্য!

জগৎরাম আসে। চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে। ঢাকুরি বাংলোর নিকটে কোন নদী নেই। একটু দূরে একটা ঝর্ণা আছে। সেটাই একমাত্র জলের উৎস। চৌকিদার বালতি করে জল নিয়ে আসে। কাঠ ধরিয়ে চা করে। ক্ষিদেও পেয়েছে। অরুণ ও সুধেন্দু খাবারের ব্যবস্থা করে। পাঁউরুটি আর জেলি। কলকাতা থেকে সেগুলো নিয়ে এসেছি। ট্রেনে আসার সময় সেগুলো খুলে হাওয়ায় রাখা হয়েছিল। ফলে সেগুলো ইটের মত শক্ত হয়ে গেছে। তাতে পচে যাবার সম্ভবনা কমে যায়। এখন ঠাণ্ডার দেশে এসে পড়েছি আর তো ভাবনা নেই। চায়ে ভিজিয়ে এ ক'দিনের হাঁটা পথে দিব্যি খাওয়া চলবে।

ঢাকুরি বাংলো থেকে খানিক নীচে নেমে হু'টো পথ বেঁকে গেছে হু'দিকে। বাঁদিকেরটি সুন্দরডুঙ্গার। আর ডান দিকেরটি পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে গেছে পিণ্ডারী হিমবাহের দিকে। আমরা ঐ পথেই যাব।

ঢাকুরি থেকে সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকায় (১০৫০০´) যাবার পথটিও ভারি সুন্দর। সে পথে পড়বে জাতোলি গ্রাম (৮০০০´/১২ মাইল), ডুঙ্গিয়াঢণ্ড (৮ মাইল)। তারপরই সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকা (১০৫০০´/৯ মাইল)। সেখান থেকে আবার সুকরামে (১৩০০০´) যাওয়া যায়। সুকরাম যাবার হু'টো পথ আছে। একটা সুকরাম নালা ধরে। অপরটি বালুনি পর্বতের (১৬০০০´) কঠিন চড়াই ভেঙে। সুকবাম নালা ধরে যে পথ সে পথটির দূরত্ব ৩½ মাইল। তবে পথটি বিপজ্জনক। কারণ মাইকতোলীর শৈলপ্রাচীর থেকে অনবরত পাথর গড়ায়। তাছাড়া হু'এক জায়গায় নালা অতিক্রম করাও বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর বালুনি পর্বতের গা বেয়ে হাজার তিনেক ফুট চড়াই ভেঙে উঠে আসলে দেখা যায় সুন্দর

বালুনি বুগিয়াল (১২০০০´)। তারপর আবার চড়াই ভেঙে শুকরাম। এ পথের দূরত্ব ৬ মাইল।

হঠাৎ টুংটাং আওয়াজ শুনে বুঝতে পারি ধরম সিং ঘোড়া নিয়ে এসে গেছে। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক এই ধরম সিং। অল্প বয়স। ফর্সা রঙ। গাল দু'টো আপেলের রঙে রাঙানো। টানাটানা চোখ। সুন্দর সবল দেহ। পরনে পাজামা। পায়ে একজোড়া কেড্স। গায়ে অতি সাধারণ জামা। মাথায় কুলু ক্যাপ। আর সবচেয় ভাল লাগে ওর সদাহাস্য মুখখানি দেখতে। অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ।

ঘোড়াটা এসে দাঁড়ায়। মাল নামিয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেয়। সে এখন মনের সুখে ঘাস খেয়ে বেড়াবে। আর আমরা চিবাবো শুকনো রুটী।

কাজ সেরে ধরম সিং পাশে এসে বসে। সেন সিগারেট দেয়। মৌজে টেনে সকলের খবর নেয়। জিজ্ঞাসা করে কিয়া বাবুজি কই তকলিব হুয়া? মনে মনে ভাবি কষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই অপরূপ শোভার মাঝে সে কথা ভাববার আর অবকাশ নেই। তাই সংক্ষেপে বলি না।

এদিকে ব্যানার্জিদা, নাড়ু ও দত্তগুপ্ত এখনও এসে পৌঁছায়নি। সুখী ছেলে দত্তগুপ্ত। আজকের চড়াই ভাঙতে সে কাহিল হয়ে পড়েছে। মনোজ ও সমীর তাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সে বিরক্তই হয়।

চা হয়েছে। ঠাণ্ডায় চাই হচ্ছে একমাত্র প্রাণের সাথী। গরম চা পেয়ে সকলের মেজাজও ঠাণ্ডা হয়েছে।

ধূমায়িত চায়ের মগ হাতে বসে থাকি। উপোসী মন আর পিপাসু আঁখি মনের গহনে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির জীবন্ত ছবি আঁকার কাজে যেন ব্যস্ত। কত বিচিত্র আলপনার রঙে রাঙিয়ে গেছে সারা হৃদয়খানি। যত দেখি ততই মন মুগ্ধ হয়।

শান্ত সুন্দর নির্জন বনভূমির মাঝে এই ছোট্ট বাংলোখানি

মনটাকে যেন একান্তে কাছে ডেকে নেয়। বড় ভাল লাগে এই নিরালা পরিবেশটি। সাড়া নেই, শব্দ নেই—নেই কোন জন মানবের শোরগোল। আছে শুধু পাখীর কলকাকলি আর নীল দিগন্তব্যাপী অভ্রভেদী চিরতুষারাবৃত উন্নত মহান শৃঙ্গমালা। মেঘের অবগুণ্ঠন তুলে চক্রাকারে দেখা দিয়েছে পাঁওয়ালী দোয়ার (২১৮৬০´), থারকোট (২০০১০´), নন্দাকোট (২২৫১০´) নন্দাখাত (২১৬৯০´) আরও নাম না জানা অসংখ্য পর্বতমালা। আলোয় আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। দেখা দিয়েছে সুন্দরী সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকাটির কিছু অংশ। সবুজ শ্যামল ধরিত্রীর মাঝে দেখা দেয় আঁকাবাঁকা ক্ষীণ রূপোলী রেখা—সুন্দরডুঙ্গা নদী। যেন চিত্রপট। এই অচিন্ত্য আলোক সুন্দর রূপের মাঝে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি বারে বার।

মেঘেরা চলেছে কেমন ভেসে ভেসে। সবুজ পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। যেন তাদের সাথে মিতালী করে। চলেছে তারা মনের আনন্দে ঐ মণি ভাণ্ডারের সন্ধানে। আঁচলে আঁচলে তাদের সোনালী রেখা। গাল ভরা যেন তাদের হাসি। লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে কেমন গিরিরাজের পাদমূলে। সুদূরের পানে পাখা মেলে বিরহী মনও যেন ভেসে বেড়ায় মহাআনন্দে। সেও যেন আঁকতে চায় নীল আকাশের গায়ে নানা রঙের আলপনা।

হঠাৎ স্বপনের কথায় চমক ভাঙে। এই যে কৈলাস এসে গেছেন। মুখ তুলে দেখি ব্যানার্জিদাকে। চড়াই ভেঙে সে ক্লান্ত। মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সারা শরীরে দারুণ ক্লান্তির ছাপ। মুখের কথাও যেন জড়িয়ে গেছে। এসেই খাবার চায়। মনোজ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে।

সেনরা খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছে অনেক। কিন্তু পথের মাঝে খাবার জন্য সামান্য বিস্কুট ছাড়া আর তেমন কিছু আনেনি। ফলে দলের অনেকেরই এতে কষ্ট হয়।

মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে ক্ষণিক রোদ পোয়াই। মন মাতানো

হাওয়া আর প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য ছেড়ে আর যেন উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু জগৎরাম তাগিদ দেয়। উঠতে হয়। ব্যানার্জিদারা এখন বিশ্রাম করবে। ধরম সিং থাকলো। ওদের সঙ্গে আসবে। পান্নুও রয়ে গেল।

বেলা তখন সাড়ে এগারটা আমরা খাতির পথে রওনা হ'লাম।

* * *

সামনে ভীষণ উৎরাই। এঁকেবেঁকে পথটি বনের মধ্যে দিয়ে ক্রমেই নেমে গেছে। লোহারক্ষেত থেকে যতটা উচ্চতায় উঠেছিলাম প্রায় ততটাই নেমে চলেছি। দেহের ভারে পা দু'টো যেন ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। দু'দিকে চীর, পাইন ও দেওদারের ঘন বন। অন্ধকার। সূর্যালোকও প্রবেশ করে না। গা ছমছম করে। শুকনো পাতার খসখস শব্দ ও নড়বড়ে পাথরের ধ্বনিতে চমকে উঠি। ফিরে ফিরে দেখি আর দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলি। চারিদিক দৃষ্টির অন্তরালে। গাঢ় সবুজ গাছের ডাল পালায় ঘেরা ছায়া পথ। গাছে গাছে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায় মেশামেশি। সুনীল আকাশের মুখখানিও ভাল ভাবে দেখা যায় না।

কুমায়ুনের বনপথ ধরে ঘুরে ঘুরে নামি। শুকনো পাইনের সরু সরু ডাটি আর ঝরা পাতায় আকীর্ণ পথ। যেন কে পথিককে দেখে মাদুর বিছিয়ে রেখেছে। তারি উপরে পা ফেলে চলা। মাঝে মাঝে আলগা পাথর বিছানো পথ আসে। ধীরে ধীরে চলি। অরণ্যের সৌন্দর্য সুষমায় মন মাতায়। দেখার আনন্দে এগিয়ে যাই। দু'চোখ ভরে দেখি আর মনে মনে ভাবি শিকারী জিম করবেটের কথা।

ভারত বন্ধু পরদেশী এই মানুষটি সারাজীবন ধরে এ দেশকে সেবা করে গেছেন। তিনি ভালবেসেছিলেন আকাশ বাতাস বন জঙ্গল আর এদেশের মানুষকে। অতি শৈশবকাল থেকেই তিনি বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন কুমায়ুনের জঙ্গলে। ১৮৭৫ সালে নৈনিতালে জিম করবেটের জন্ম হয়। ছেলেবেলাটা তাঁর ঐ

খানেই কেটেছে। পড়াশুনাও করেছেন ঐ নৈনিতালেই। প্রকৃতির কোলেই যেন তিনি মানুষ হয়েছিলেন। সবুজ অরণ্যই ছিল তাঁর খেলা করার জায়গা। গাছ পালা, লতা পাতা, ফল ফুল, পশু পাখী সবাই ছিল তাঁর যেন খেলার সাথী। শোনা যায় তাঁর অষ্টম জন্মদিনে উপহার সরূপ পেয়েছিলেন একখানি রাইফেল! মহা আনন্দে সেই রাইফেলখানি উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বনে বনে। ভয় ভীতি কিছুই তাঁর ছিল না। ১৯০০ সালে তিনি জীবনে প্রথম মানুষ খেকো বাঘ শিকার করেন। সেই দিন থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ শিকারী হিসাবে। সারা জগৎ জুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসাবেও তাঁর যশ কম ছিল না। প্রতিটি গাছপালা, লতাপাতার সঙ্গে তাঁর যেন গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। এরাই যেন ছিল তাঁর প্রিয় বন্ধু। খেলার সাথী। দিবারাত্রি ঘুরে বেড়াতেন বনে বনে। সবুজ অরণ্যানী ছিল তাঁর লীলাভূমি— কর্মক্ষেত্র। এই অরণ্যময় জীবনের জ্ঞান এতই তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি অবিকল পাখীর মত শিস্ দিতে পারতেন। পশুদের ডাকও তিনি হুবহু নকল করতে পারতেন। এমন কি বাঘের ডাক ডেকে বাঘিনীকে পর্যন্ত ভুলিয়ে কাছে নিয়ে আসতেন। বিশ্ব প্রকৃতি ছিল তাঁর প্রাণের প্রেরণা। তাঁর কবি মনের স্বপ্নবাসর।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি শুরু করেন তাঁর সাহিত্য-সাধনা। সত্তর বছর বয়সে তিনি প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। অতি অপূর্ব সহজ সরল সুন্দর ভাষায় রূপকথার আমেজে ভরা আপন অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী তিনি লিখে গেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের পাতায় পাতায়। তাঁর লেখা 'ম্যান ঈটার্স অফ কুমায়ুন', 'দি ম্যান ঈটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ', 'মাই ইণ্ডিয়া' ও 'জাঙ্গল লোর' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি চিরকাল ধরে পাঠকদের মনে রোমাঞ্চকর রসের সন্ধান এনে দেবে।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। উত্তর প্রদেশের

পাহাড়ী মানুষদের সঙ্গে তাঁর যেন নাড়ির টান ছিল। তিনি ছিলেন তাদের বন্ধু, আত্মীয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি কুমায়ুন থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রেও গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি কুমায়ুন-গাড়োয়াল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন। কুড়ি বছর ভারতীয় রেলে চাকুরি করেন। ভারত বিভক্ত হবার পর তিনি চিরকালের জন্য এদেশ ছেড়ে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবিতে চলে যান। ১৯৫৬ সালে তিনি সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ক্রমে আমরা যেন সমতলের দিকে নেমে চলি। পথ আবার ঘুরে আসে। ডানদিকে মামুলী চড়াই পথ ধরে উঠি। পথের দু'পাশে সবুজ ঘাসে ঘাসে কেবল ফুলের মেলা। কত রঙ, কত রূপ! যেন সবুজ ঘাসের গালিচায় ছোট ছোট বনফুলের নক্সা কাটা। চারিদিকে অসীম শূন্যতা। উপরে গাঢ় নীল আকাশ। দূরের শৈল-শিখরে শিখরে যেন ইন্দ্রজাল বিছানো।

চনমনে রোদ ওঠে। বনদেবী যেন অলস নয়নে চোখ মেলেন। অচেনা কোন এক পাখীর ডাক শুনি। হঠাৎ ডাক থেমে যায়। নিস্তব্ধ বন আরও যেন স্তব্ধ মনে হয়।

পাইনের সুবাস, মিঠে মিঠে বাতাস, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ—চলার প্রেরণা আনে। আনন্দে পথ চলি।

চেয়ে চেয়ে দেখি মেঘের খেলা। দেখি আলোর সমারোহ। পর্বতগাত্রে পথশ্রান্ত জলভরা মেঘের দল কেমন বিশ্রাম করে। হিমগিরির শিখর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় তারা যেন আপন অভীষ্ট পথে। ধনুরীর পেঁজা তুলো রাশি রাশি যেন উড়েছে আকাশে। নীলে আর সাদায় যেন চলেছে মিতালী। চলেছে যেন তাদের মন দেয়া-নেয়া। বাঁক ঘুরি। হঠাৎ দেখি ঘন কুয়াশার আস্তরণ গেছে ছিঁড়ে। মেঘের আঁচলে আঁচলে সোনালী রঙের রেখা। সাদা সাদা মেঘের ভেলা ভেসে চলেছে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ের দিকে। যেন চলেছে তারা এদেশ ছেড়ে অন্য কোন-

খানে। কি প্রশান্ত পরিবেশ! কি মনোরম দৃশ্য!

বনের মাঝ থেকে হঠাৎ পাখীর ডাক কানে আসে। কি মিষ্টি সুরে গাইছে গান! যেন অব্যক্ত বাণী দূর থেকে ভেসে আসে। মনের কথা যেন বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। কত না বলা কথার মধুর ব্যঞ্জনা যেন আলো ছায়ার দলে খেলে বেড়ায়। চাওয়ার আগেই যেন পেয়ে যাই সব কিছু। পেয়ে যাই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য।

ক্ষণিক গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করি। নিমেষে পথ ক্লান্তি ভুলায়। অরুণ তাগিদ দেয়। উঠে আবার চলি। আঁকাবাঁকা পথ রেখা যেন স্বপ্নময় জগতের রোমাঞ্চে ভরা। কত পাখী, কত ফুল, কত রকমের গাছের সারি, কত শত মেঘের বলাকা ভেসে ভেসে আসে আর যায় নীলিমার বুকে। সোনালী সূর্য আর রূপোলী শৃঙ্গের ঝিকিমিকি প্রাণে কিসের ছোঁয়া দিয়ে যায়। রূপের নেশায় মন মাতায়।

পথ ঘুরে ঘুরে ওঠে। গাছের ছায়ায় ভরা। ধীরে উঠি। আবার ঢালু গা ধরে নামি। পথ চলে। ফুলের শোভা। আকুল করা পাখীর গানে ভরা নিবিড় বনস্থলী। অন্তর পুলকে ভরে। বাঁক ঘুরেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। আহা! কি অপরূপ সৌন্দর্য-বৈভব!

রাঙামাটি আর কাঁকর বিছানো পথ ঘুরে গেছে যেন বিরাট ঘোড়ার খুরের মত। খুরের এপারে আমরা আর ওপারে বহু দূরে দেখা দেয় লাল ছাউনি দেওয়া খাতির বাংলোখানি। ধাপে ধাপে সাজানো ফসল ভরা ক্ষেত। যেন স্বর্গের অপ্সরাগণ কোমল তৃণ-শয্যায় বসে রোদ পোয়াচ্ছেন। কত রঙ বেরঙের শাড়ির বাহার! যেন পাহাড়ের ধাপে ধাপে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের শাড়ির আঁচল-গুলো। বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ফসল দোলে। মনও দোলে স্বর্গীয় অনুপম শোভা দেখে। পথের পাশে ফুলেরা দোলে। যেন হাওয়ায় দোলায় দোদুল দোলে বনফুলের কুঁড়ি। স্নিগ্ধ সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। অন্তর যেন অলক্ষ্যে

কার স্নেহাশিস স্পর্শ পায়। বুকভরা আনন্দ নিয়ে অতি ধীর পদক্ষেপে চলি।

বার বার চেয়ে দেখি দূরের বাংলোখানি। সব ক্লেশ, সব শ্রম যেন নিমেষে হারিয়ে যায়। এ যেন পথক্লান্ত পথিকের মন ভোলায়। মনে হয় ঐতো আমার ঘর। কতকাল পরে যেন চলেছি আপন ঘর পানে।

পথের ডানদিকে ঘন শ্যাম বনভূমি। বাঁদিকে ঢেউ খেলানো নীচু নীচু পাহাড়ের পটভূমি। তারি গায়ে কোথাও চাষ আবাদ। কোথাও ধূসর। কোথাও তারি গায়ে কচি কচি তৃণে আচ্ছাদিত। দূরে দেখা দেয় খাতি গ্রামের ঘর বাড়ি। দেখায় যেন ক্যানভাসের গায়ে রঙ মেলানো এক নিখুঁত ছবি।

পথ চলি আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দেখি বহুরূপী হিমালয়ের অসীম সৌন্দর্য। কত রূপ, কত রঙ, কত বাহার! মেঘের জটা-জালের মাঝে চিক্ চিক্ করে হিমানী শিখর। যেন মনের সাথে লুকোচুরি খেলে পালিয়ে যায়। অবুঝ মন যেন মানে না। বাব বার খুঁজে বেড়ায় অসীমের মাঝে।

কি যে দেখি, কি যে ভাবি—তা নিজেই বুঝি না। এক অব্যক্ত আনন্দে পা যেন আপনা থেকেই চলে। ভাল লাগে রাঙামাটির ধুলো উড়িয়ে পথ চলতে।

অরুণ এগিয়ে যায়। আমরা ধীরে চলি। মিষ্টি বাতাস। ছায়ামণ্ডপে ঢাকা পথ। অন্তর যেন অতলে তলিয়ে যায়। দোলা লাগে স্বপনের মনে। মাতিয়ে তোলে কণ্ঠ সঙ্গীতে 'পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলে তব মাগো।' নির্জন পরিবেশে অপূর্ব সঙ্গীতে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি। তালে তালে পা ফেলে খাতির বাংলোয় (৭২৫০´/৬ মাইল) এসে পৌছাই তখন বেলা দেড়টা।

॥ ৮ ॥

স্বপ্নরাজ্য হিমালয়। আর খাতি সেই রাজ্যের রাজকন্যা। প্রকৃতিরাণী যেন একে মনের সকল মাধুরী উজাড় করে দিয়ে সাজিয়েছেন। এ যেন তাঁর আদরিণী সুন্দরী ললনা। সবুজ পাইন, চীর গাছে ঘেরা। পাহাড়ের পর পাহাড়। দূরে নীল আকাশের নীচে হাসেন গিরিরাজ। যেন মাথায় রূপোলী মুকুট পরে। সূর্যালোকের ঝিলিমিলি। আর রামধনু রঙে রাঙানো জননী বসুন্ধরার স্নিগ্ধ মুখের মধুর হাসি। কুঞ্জ ভরা পাখীর কাকলি আর উচ্ছল পিণ্ডারীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনিতে মুখরিত খাতির বাংলোখানি। যেন গাঢ় নীল আকাশের প্রচ্ছদপটে আঁকা এক অপরূপ আলেখ্য। নিত্য চলেছে এখানে জাদুর খেলা।

বাংলোর সামনে কানন ভরা ফুল। পাহাড়ের গাত্রদেশ জুড়ে ফুলের মেলা। যেন ফুলে ফুলে রঙে রঙে বর্ণালী বসন্ত বাহার।

সোনালী রোদে ভরা সবুজ গালিচা পাতা লন। মৌমাছির মৌ মৌ গুঞ্জনে ভরপুর এর হৃদয়। পাহাড়ে পাহাড়ে পাখামেলা মেঘের মেলামেশা। যেন চলেছে মিতার সাথে মিতালীর আকুলি ব্যাকুলি। অফুরান আনন্দ নিয়ে ভেসেছে শরতের মেঘ নীল নভস্তলে।

অতি শান্ত মনোরম পরিবেশ। মুগ্ধ পথিক যেন মর্মে মর্মে অনুভব করে জগৎ কত সুন্দর। প্রাণের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিটিও যেন খুঁজে পাওয়া যায় এরই আঙিনায় এসে। হারিয়ে যায় পথ-ক্লান্তি। আঁখি পল্লবে স্বপ্ন-মধুর রঙিন নেশা জাগায়।

ছিমছাম সুন্দর সাজানো গোছানো বাংলো। ঘরের চারিপাশ ঘিরে সরু বারান্দা। কাঁচের সার্সী দেওয়া জানলা দরজা। মেঝেতে সুন্দর ঝকমকে কার্পেট পাতা। ঘরের চারকোণে চারটে খাটিয়া, ফায়ার প্লেস, টেবিল চেয়ার, এটাচ বাত, ডাইনিং স্পেস—কি নেই! হিমালয়ের অন্তঃপুরে এ যেন স্বপ্নপুরী! ডান দিকে একটু নীচে কুলিদের থাকার ঘর ও রান্নাঘর।

বাংলো বন্ধ। চৌকিদারকে খুঁজি। ছায়াঘেরা বারান্দায় শুয়ে একজন দিব্যি ঘুমচ্ছিল অরুণ তাকে চৌকিদার ভেবে ডাকে। সে বলে চৌকিদার গ্রামে আছে ওখান থেকে তাকে ডেকে আনতে হবে। মালপত্র বারান্দায় রেখে আমি অরুণ ও সেন বাংলোর পিছনের রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে চলি।

পথের ছ'দিকে ক্ষেতের পর ক্ষেত। ডান দিকে পিণ্ডারীর ক্ষীন গতি। ওপারে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে শীর্ণকায় ঝর্ণা। ঝমঝম শব্দ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পিণ্ডারীর বুকে। মধুর অস্ফুট ধ্বনি। যেন শিশুর মুখে সরল হাসি।

পিণ্ডারী থেকে নালা কেটে নিয়ে আসা হয়েছে গ্রামের মধ্যে সেই একমাত্র জলধারা—পানীয় ও সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাঁচা মিঠে রোদ। ফুরফুরে বাতাস। গাছের পাতা কাঁপে। মধুর সঙ্গীতের তাল ওঠে। যেন জলসাঘরের প্রবেশপথ ধরে চলি।

দূর আকাশে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত চূড়ায় চূড়ায় যেন কুহকের ইন্দ্রজাল বিছানো। ছ'চোখে নবীনত্বের প্লাবন বয়।

নালার ধারে বসে মেয়েরা বাসন মাজে। স্নান করে। ওরই অবসরে আপন মনে গুনগুন গান গায়। যেন শত সহস্র ভ্রমরের গুঞ্জরণ ওঠে। থমকে দাঁড়াই। অবাক হয়ে দেখি ওদের স্নানের বৈচিত্র। মেয়েরা চুলগুলো সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে ভাল করে সাবান মাখিয়ে জল ঢালছে। কিন্তু গায়ের মলিনতা যেকার সেই রয়ে গেছে। এক বিন্দু জল গায়ে ঢালে না। শীতের দেশ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল বলেই বোধহয় এরা এইভাবেই স্নান করে।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতেই মোটাসোটা কুকুরগুলো তেড়ে আসে। ক্ষেতের কর্মরত লোক, গ্রামের বৃদ্ধ সকলেই আমাদের দেখে হাসে। ভয়ে জবুথবু। আবার ওরা ডাক দেয়। কুকুরগুলো সরে যায়। নিমেষে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে এসে ভিড় করে। টুকটুকে আপেলের মত লাল রঙ। কচি কচি পা ফেলে পিছু পিছু আসে। বিড়াল ছানার মত মিটমিটে চোখ তুলে চায়। যেন নতুন কিছু

দেখে। গালভরা হাসি। মনে অনাবিল আনন্দ নিয়ে চলে আমাদের সাথে সাথে। এক বৃদ্ধ চৌকিদারকে ডেকে দেয়। সেলাম ঠুকে সে হাজির হয়। গ্রাম ঘুরিয়ে দেখায়।

ছোট্ট গ্রাম—এই খাতি। মাত্র কয়েক ঘর লোক। কৃষি কাজই এদের প্রধান উপজীবিকা। গ্রামের চারিপাশ ঘিরে ক্ষেত-খামার। সোনালী ভুট্টার রঙে রাঙানো। আলুও এখানে প্রচুর হয়। ক্ষেতে ক্ষেতে শীতের আনাজও পর্যাপ্ত ফলে আছে। বিট, শালগম, মূলো ও নানা শাক্‌সব্জি। লতানো গাছের জাল পাতা রয়েছে যেন ঘরের চালে চালে। ঝুলছে লাউ, কুমড়ো, শিম। গ্রামের এককোণে রয়েছে মুদি কাম দর্জির দোকান। দোকানের বারান্দায় এক ভাঙা সেলাই মেসিনে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে সেলাই করে চলেছে এক বৃদ্ধ খলিফা। চোখে দড়ি বাঁধা চশমা, পরনে শততালি দেওয়া জামা। মেসিনে সেলাইয়ের তালে তালে কথার তুবড়িও ছুটেছে। ঘরের ভিতরে এক আধাবয়স্ক লোক সামান্য কিছু চাল ডাল তেল নুন বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে বসে আছে। আমরা সামান্য চাল, ক্ষেতের আলু, মূলো ও কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি কিনে ফিরে আসি।

জগৎরাম এসে পৌঁছিয়েছে। মনোজ ও সমীরকে দেখা যাচ্ছে। হাত নেড়ে তাদের স্বাগত জানাই।

জগৎরাম ও চৌকিদার চায়ের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে গেছে। এক বৃদ্ধ কাঠ দিয়ে যায়। অরুণ ঘরে বিছানা পাতে। বাইরের লনে এসে বসি।

দিনের আলো স্তিমিত হয়ে আসে। নীল আকাশে চলে আলোর খেলা। আঁধারের আঁচল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে মন দেয়া নেয়া। অন্ধকারে ছেয়ে আসছে বনভূমি। লতায় পাতায় গাছের প্রলম্বিত ছায়ায় ছায়ায় সারাটা দিক যেন ছায়ামণ্ডপে ঢাকা। ঝাঁকে ঝাঁকে রঙ বেরঙের রামধনুরঙা প্রজাপতির দল আসছে উড়ে। রঙের নেশায় তারা যেন পাগল। যেন উৎসবের

সাড়া পড়েছে সবুজ আঙিনাটিতে। ফিন ফিনে হাল্কা রঙিন পাখা মেলে বসেছে তারা ফুলের মধু খেতে। লাল হলদে, সাদা বেগুনে ফুলের উপর এঁকেছে তারা যেন শত রঙের আলপনা।

বাতাস কেমন দোল দিয়ে যায়। দোলে ফুল—হাসি মুখে। দোলায় দোলে প্রজাপতি আনন্দের পসরা নিয়ে। ফুলে ফুলে, লতায় পাতায়, ডালে ডালে যেন রঙের মাতন চলেছে।

গোধূলির ছায়া নামার আগেই পাখীরদল ফিরছে তাদের ঘরে। সারাটা নীল আকাশ জুড়ে ঘরে ফেরা পাখীর দল ডানা মেলেছে। তাদের কল কাকলি আর পাখার ঝাপটা টানার শব্দে আকাশ বাতাস বনভূমি যেন মুখর হয়ে উঠেছে।

দূরে ঐ গাঢ় নীল অসীম আকাশের বুকে একখণ্ড ছেঁড়া মেঘ ভেসে চলেছে। যেন নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ফিরছে তার কুলায়।

সবুজ ঢেউ দোলানো পাহাড়ে পাহাড়ে কুয়াশা যেন জাল পাতে। একে একে ঘিরে ফেলে মায়াজাল বিছিয়ে। চুপ চাপ বসে থাকি। চোখ মেলে দেখি। ভাল লাগে। আশ মেটে না।

জগৎরাম কফি দিয়ে যায়। আরামে খাই। কানপেতে শুনি পাখীর গান। সুরের ছোঁয়ায় আনমনা করে তোলে।

দিন শেষ হয়ে আসে। সূর্যদেব নামেন অস্তাচলে। কুয়াশার বুক চিরে আলতা ছোঁয়া আলোয় রাঙা পশ্চিম আকাশে শেষ বারের মত আর একবার দেখা দিল রাঙা সূর্য।

নীল আকাশের গায়ে দেখা দিলেন গিরিরাজ স্মিত হাসি মুখে। মনিঃপ্রভা প্রতিফলিত হ'ল শিখর থেকে শিখরে। রক্তিম রবি রশ্মি আলগোছে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে সেই শ্বেত শুভ্র চূড়ায় চূড়ায়। লাল আভার স্পর্শে হিমানী মণ্ডিত শিখরগুলি একে একে লাল হয়ে ওঠে। এ যেন টুকটুকে লাল চেলি পরে এলেন পার্বতী দেবাদি-দেবের সাথে প্রেমালাপ করতে। আহা! কি অনির্বচনীয় রূপ-গৌরব! আহা! কি শান্ত স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম শোভা! দিগ্‌বলয়ে যেন এক অপূর্ব রঙের মাধুর্য রচনা করেছে।

অস্তগামী সূর্যের লাল আলো এসে পড়েছে বনানীর শীর্ষদেশে। খাত্তির বাংলোর লাল চালে। সবুজ আঙিনার বুকে এঁকেছে ময়ূরকণ্ঠি রঙের আলপনা। ধুলোমাখা পাহাড়ী পথরেখায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—ধীরে ধীরে যেন অতি সঙ্গোপনে।

ঘোড়ার গলঘন্টার টুং টাং আওয়াজে চমক ভাঙে। চেয়ে দেখি ধরম সিং এসেছে। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে কাছে এসে বসে। এক গাল হেসে জিজ্ঞাসা করে কেমন লাগছে?

ভাষা নেই এ সৌন্দর্যকে প্রকাশ করার তাই বলি খুবই ভাল।

সেন ব্যানার্জিদের খবর নেয়। ধরম সিং বলে মোটাবাবুর খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তাই বাধ্য হয়ে আপনাদের জিজ্ঞাসা না করেই ঢাকুরিতে কিছু রেশন বের করে দিই। চৌকিদার বাবুদের রান্না করে দেয়। ফলে সেখান থেকে যাত্রা করতে কিছু দেরী হয়ে গেছে। বাবুরা আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।

চাল ডাল বের করে ওরা রান্না করে খেয়েছে শুনে সেন চেঁচিয়ে ওঠে। আমি ওকে ধমক দিয়ে ধরম সিংকে বলি তুমি ঠিকই করেছো। ধরম সিং ফ্যালফ্যাল করে চায়। সেন ও হেসে ওকে বলে আপ ঠিক কাম কিয়া—হাম আপকো কুচ বোলা নেহি। মোটাবাবুকো লিয়েই বোলতা।

সেনের হিন্দীতে সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। সুধেন্দু সেনকে বলে তোমার দলের ঐসব লোককে এখানেই রেখে যাও। ওরা আর হাঁটতেও পারছে না। ওদের নিয়ে গেলে বিপদ হতে পারে। ঐ ক'জনের জন্যে প্রোগ্রাম আপসেট হয়ে যাবে। অরুণ ও অজিত ঐ একই মন্তব্য করে। আমি হেসে বলি ওরা আসুক—দেখবে ওরা নিজেরাই বলবে যে আর যাব না। তখন সম্মতি জানালেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে বাঁকের মুখে ওদের চারজনকে দেখা যায়। হাত নাড়ি। দূর থেকে পানু ও দত্তগুপ্ত প্রত্যুত্তর দেয়। আধঘণ্টা পরে ওরা এসে পৌঁছায়।

সত্যি ওরা ক্লান্ত। দেখেই বোঝা যায় ব্যানার্জিদার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সোজা ঘরে ঢুকে খাটের ওপর চিৎপাত। নাড়ু পা থেকে তার জুতো খুলে দেয়।

ধরম সিং রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে।

গুটি গুটি সন্ধ্যা নেমে আসে পাহাড়তলির বুকে। আবছা অন্ধকারে চারিদিক অবলুপ্ত। প্রলাপী পাখীর কাকলিও আর কানে আসে না। তারা যেন অচেতন। ঝোপে ঝাড়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলে জোনাকির আলো। বন উপবন যেন মেতে উঠেছে ঝিল্লীর ঝনকে। বিচিত্র সুরের ঐকতানে ভরিয়ে তোলে হৃদয়। নিঝুম পাহাড়ের বুকে রূপোলী আলোর সেঁজুতি জ্বালিয়ে ওঠে চন্দ্রমা নীলিমার কোলে। জ্যোতির আলপনা এঁকে দেয় নীল নভস্তলে।

আহা কি মধুর স্পর্শ! কি শান্তিপ্রদ! কি সুখময় কোমল কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে যামিনী! এতো স্বর্গীয় অনুপম শোভা! নয়নে স্নিগ্ধতা আনে। অন্তর যেন তলিয়ে যায় অতল অনিলে।

সন্ধ্যা-দীপের শিখার মত একটি দু'টি করে গহন গগনে জ্বলে অগণিত তারার বাতি। সুন্দর আরও সুন্দর হয়ে ওঠে সান্ধ্য আরাধনা।

ঘরছাড়া মন যেন রূপের নেশায় বিহ্বল হয়ে ওঠে। চায় সে এই মুক্ত অঙ্গনেরই শ্যামল শয্যায় শুয়ে রাত কাটাতে। চোখে আজ মোহময় আবেশ ভরা।

বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশের কোণে। তারকাদলের মাঝে জ্বলে যেন রত্নদীপ শিখার মত। টুকরো টুকরো মেঘ ভাসে আকাশের গায়ে। মাঝে মাঝে ঢেকে দেয় চাঁদের স্নিগ্ধ মুখখানি। সাদা মেঘের আঁচলে আঁচলে লাগে রূপোলী রঙের ছোঁয়া। যেন জরির ফিতে দিয়ে বর্ডার আঁকা শুভ্র নিশানগুলো জেল্লা দিয়ে ওঠে। আবার দেখি চাঁদের হাসি।

কুহকী কুহেলী কেমন ঝালর দোলায়। মিটমিট করে চায় ভাঙা চাঁদ। এই বুঝি নিভে যাবে। রাত এলো। ক্লান্ত অবসন্ন

পথিকদের ঘুম পাড়াতে। শীতের দমকা হাওয়া ছুটে আসে। সারা দেহে শিহরণ লাগে। তৃণ শয্যা ছেড়ে উঠে ঘরে আসি।

ভিতরে মোমবাতির আলো জ্বলে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। কাঁচের সার্সী দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়েছে একফালি টিমটিমে আলোর রেখা।

উপোসী প্রজাপতি, ফড়িং ও রঙবেরঙের পোকামাকড় ফিনফিনে হাল্কা রঙিন নকশাকাটা পাখা মেলে এসেছে ছুটে আলোর দিকে। কাঁচের সার্সীর গায়ে এঁকেছে তারা বিচিত্র রঙের আলপনা। যেন শিশার গায়ে অঙ্কিত নিপুণ চিত্র শিল্পীর এক অপূর্ব চিত্রকলা। আহা! এযেন শিশমহলের দেওয়ালে আঁটা জলছবি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি জানালার দিকে। তৃষিত আঁখি ক্ষুদিত প্রাণ যেন রূপতৃষ্ণায় মেতে ওঠে। অন্তরের অতলে কত আনন্দের আবর্তন তোলে।

আলো জ্বলে। আনন্দে আপ্লুত আটক কীট পতঙ্গের দল যেন আকুল আকূতি জানায় আজকের আলোর আসরে আলপনার আলেখ্য আঁকার জন্য ভিতরে আসতে।

দেখি আর মনে মনে ভাবি আজকের এই ক্ষীণ আলো ওদের মনে কি দারুণ সাড়া জাগিয়েছে! ওরা যেন ঘর ছাড়া আনন্দে দিশেহারা। মেতেছে যেন মহোৎসবে। মনের গহন থেকে জানাই সাদর সম্বর্ধনা।

ওরা প্রকৃতির সন্তান। ওরা সুন্দর। ওরা নির্মল। ওরা আসে আমাদের সাথে পরিচয় করতে ওদের জীবনের শুভ লগ্নে— আমাদের প্রাণে দোলা দিতে।

এলোমেলো নানা চিন্তায় ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি। হঠাৎ দরজা খুলে ধরম সিং ও চৌকিদার কেটলি করে চা নিয়ে আসে। দরজা খোলা মাত্রই ঐ কীটপতঙ্গের দল ঝাঁকবেঁধে হু হু করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আলোর বুকে। যেন তারা সবাই মহাআনন্দে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখায় আত্মাহুতি দিতে

চায়। ফরফর শব্দ তুলে যেমনি বসে আলোর শিখায় অমনি পুড়ে টুপটাপ শব্দে পড়ে টেবিলের ওপর। এ আত্মবিসর্জন যেন তাদের কাছে মহাভাগ্যের কথা। এত হুড়হুড়ি এত তাড়াতাড়ি তারা নিজেদের নিঃশেষ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে যেন ওদেরই ভারে স্বল্প শিখা যায় নিভে। অন্ধকার।

যারা শহীদ হতে পারলো না তারা যেন মনের দুঃখে ফিরে যেতে লাগল তাদের গৃহকোণে। কেউবা পুনরায় সুযোগের আশায় আঁকড়ে রইলো দেওয়ালের গায়ে। বনবন শব্দ তুলে কেউবা ঘোরে সারা ঘরখানি। যেন মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে মরে।

অন্ধকারের মাঝে চায়ের মগ হাতে বসে থাকি মনের গহন কোণে কেমন যেন ব্যথা লাগে। আহা! ক্ষণিক আগেই দেখেছিলাম কত বিচিত্র তাদের আকার। কত রঙের আলপনা এঁকেছিল তারা কাঁচের সার্সীর গায়ে। ছুটে এল তারা মনের উদ্বেল আনন্দে। নিমেষেই তাদের প্রাণের স্পন্দনটুকু মুছে গেল। ঘন ঘন নিঃশাস পড়ে। ভাবি মানুষের জীবনের লীলাখেলাও বুঝি এই ভাবেই সাঙ্গ হয়।

চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই সুধেন্দু ডাকে। উঠে রান্না ঘরে যাই। কারণ একা জগৎবামের পক্ষে এতগুলো লোকের খাবার তৈরী করা সম্ভব নয়—তাই হাত লাগানো প্রয়োজন। কম্বল ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে রান্নাঘরে এসে বেশ আরাম বোধ হয়। ঠাণ্ডার দেশে গরম—সে যে কি আরাম তাতো মনই জানে। তবে কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় ঘরভর্তি। চোখ দিয়ে অবিরাম জল নামে। ওরই মধ্যে সুধেন্দু আলু পেয়াজ ভাজে। আমি খিচুড়ি তৈরী করি। সেন ও জগৎবাম রুটী তৈরী করে।

এবার স্টোভ বা প্রেসার কুকার কিছুই সঙ্গে আনিনি। ফলে বাংলোর ডেকচি ইত্যাদি নিয়ে কাঠের আগুনে রান্না বসেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কাঠ জ্বলে কিন্তু খিচুড়ি আর সিদ্ধ হয়না। চাল ডাল আলু সবই যেন আমাদের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে

আছে। এত কাঠ জ্বালিয়েও তাদের হৃদয় গলানো গেল না। এদিকে পেটও যেন আর মানতে চাইছে না। তারও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে খিচুড়ি নামিয়ে নিয়ে ঘরে আসি।

বাংলোয় পৌঁছান থেকে এখন অবধি এক মোটা ধুমসো কাল কুকুর সবসময়ই আমাদের পাশে পাশে ঘুরছে। লেজ নাড়ায়। প্রভুভক্ত জীব যেন বহুদিন বাদে প্রভুকে খুঁজে পায়। কিন্তু তবুও মন সরে না—গায়ে হাত বুলাতে। রান্নাঘরের বাইরেই শুয়ে ছিল। হঠাৎ দমকা বাতাসে বাতিটি নিভেযেতেই ঘরে ঢোকে। ভয়ে লাফিয়ে উঠি। ধরম সিং ছুটে এসে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেতো ছাড়বার পাত্র নয়। খাবারের আশায় লেজ দুলিয়ে হাজির হয়েছে ঘরের সামনে।

রাতের খাওয়া শেষ করে শোয়ার পালা। জগৎরাম ও ধরম সিংকে ডাকি ঘরে শোবার জন্য। কিন্তু ওরা হাসি মুখে প্রত্যাখ্যান করে। বলে বাবুজি ঘরে শুলে দম বন্ধ হয়ে আসে তাই আমরা বাইরে ঐ মাঠেই শোব। ওদের কথা শুনে প্রথমে একটু অবাক হই। ভাবি কি করে এই ঠাণ্ডায় ওরা ঐ ছেড়া একখানি বেড-কভার গায়ে দিয়ে শোবে! পরমুহূর্তে মনে হয় ওরা পাহাড়ী। ওরা হিমালয়ের সন্তান। ঝড় বৃষ্টি তুষারপাত—এদেরই সঙ্গে লড়াই করে ওরা বেঁচে থাকে। আমরা সমতলের মানুষ। ওদের সঙ্গ পেয়ে নিজেদের বন্ধু বলে মনে করি। হাঁটাপথে কোনই ভেদাভেদ থাকে না। মনে হয় ওরা আমার বহু পরিচিত বন্ধু। তাই নিজেরা ঘর শোব আর বন্ধু শোবে বাইরে! ভাবলে মন যেন কেমন করে ওঠে। তাই আবার বলি ঘরেতো জায়গা রয়েছে তবু কেন কষ্ট করে বাইরে শোবে। ওরা হাসে।

ঘরের ভেতরে ফায়ার প্লেসে গনগনে লাল আগুন জ্বলেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝে মিঠে গরম বড়ই আরাম লাগে। সেনরা সকলেই ফ্লাস্ক এনেছে। তাই ওরা রাত্রেই গরম কফি ওতে ভর্তি করে রাখে।

সবে শুতে যাব জগৎরাম এসে ডাকে। দরজা খুলে দিই। ও বলে কেউ রাত্রে বাইরে বেরবেন না। যদি প্রয়োজন হয় তবে ডাকবেন। সেন জিজ্ঞাসা করে বাঘ ভাল্লুক কি আসতে পারে? ও হাসে। বলে বাঘ ভাল্লুকতো হামেসাই আসে বাবুজি তবে ভয়ের কিছু নেই—আমরাতো বাইরেই আছি। ওদের কথা শুনে ব্যানার্জিদা ও দত্তগুপ্ত চেঁচিয়ে ওঠে। ভীত চিত্তে বলে বাঘ ভাল্লুক আসতে পারে! সুধেন্দু ধমক দেয়। বলে আসলে আসবে। বাইরে বের হবার কি দরকার আছে। ঘরের লাগাইতো বাথরুম। ওদের কথা শুনি আর মনে মনে ভাবি নৈনীতালের টুরিস্ট অফিসার মিঃ কমলের কথা। তিনি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন এ অঞ্চলের জঙ্গলে হামেসাই বাঘ ভাল্লুক দেখা যায়। সুতরাং সব সময়ই সাবধানে চলা প্রয়োজন। মনে পড়ে জিম্ করবেটের কথা। 'মোহন ম্যান ঈটার' শিকারের আগে বাঘ রাত্রে তাঁর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। অতবড় সাহাসী শিকারী করবেটও সেদিন ভয় পেয়েছিলেন।

থাক ওসব কথা। এদিকে অজিত ও স্বপন জেদ ধরেছে—ওরা পিণ্ডারী যাবে না। নাড়ু পান্নু, দত্তগুপ্ত ও ব্যানার্জিদাকে সেনতো আগে থেকেই এখানে থাকতে বলেছে। ওরাও রাজী। কিন্তু অজিত ও স্বপন যাবে শুনে সেনের মাথায় বজ্রাঘাত। ওদেরই ভরসায় ও পা বাড়িয়েছে আর ওরা যাবে না। শুরু হয় ওদের তর্ক যুদ্ধ। এ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ কারো কথায় রাজী হয় না। ওরাও যেতে চাচ্ছে না। সেনও ছাড়বে না। অবশেষে আমার শরণাপন্ন হয়। আমি কিছু বলতে যাবার আগেই সুধেন্দু ধমক দেয়। বলে চুপ করে থাক। ওরা যা ইচ্ছে করুক।

ওরা কথা কাটাকাটি করে। সুধেন্দু বাধ্য হয়ে বলে তোমরা যখন এখনও ঠিক করতে পারলে না কে যাবে আর কে যাবেনা তখন তোমার সকলেই এখানে থেকে যাও আমরা তিনজন ঘুরে আসি। প্রতিদিন ঝামেলা ভাল লাগেনা।

অরুণ বাতিটা নিভিয়ে দেয়। শুয়ে পড়ি। কিন্তু এই সাঁজের বেলায় শুলেই কি আর ঘুম আসে। সবে রাত আটটা। মনে হয় নিশুতি রাত এসে হানা দিয়েছে এই পাহাড়তলির বুকে। নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশ। কোথাও কোন সাড়া নেই শব্দ নেই। গাছের পাতাও বুঝি বাতাসে নড়েনা। অন্ধকার। নিস্পন্দ খাতি যেন অঘোরে নিদ্রা গিয়েছে।

শুয়ে এপাশ ওপাশ করি। প্রহরের পর প্রহর পার হয়ে যায়। তন্দ্রালু চোখের পাতায় পাতায় চুপিচুপি ঘুম নেমে আসে। আমিও হারিয়ে যাই যেন এক অচিন ঘুম পাড়ানীর দেশে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাতে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। ফায়ার প্লেসের আগুন যে কখন নিভে গেছে তা কেউ টের পাইনি। উঠে যে কেউ কাঠ ঠেলে দেবে তারও ক্ষমতা নেই। হাত পা সবই যেন অসাড়। গেঞ্জি থেকে আরম্ভ করে সোয়েটার, মাফলার, টুপি গরম মোজা সবই পরে কম্বল তলায় শুয়েছি তবুও যেন মনে হয় হিমশয্যায় শুয়ে আছি। টিনের চালে টুপটাপ আওয়াজ হয়। বুঝতে পারি শিলা বর্ষণ শুরু হয়েছে। জানিনা জগৎরামরা এখনও বাইরে আছে কিনা। ঠাণ্ডায় দরজা খুলে দেখে আসতে আর যেন ইচ্ছে করছেনা। কম্বল ছেড়ে আগুন জ্বালাতে উঠি। সেন কাঠ ধরায়। লিকলিকে আগুন জ্বলে ওঠে। গরম! মন খুশীতে ভরে। দেহে আমেজ আসে। ঘুম নামে আমার চোখে।

॥ ৯ ॥

রাত্রি তখনও প্রভাত হয়নি। ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার। বাইরে চলেছে প্রচণ্ড হাওয়ার মাতামাতি। সন্‌সন্‌ শব্দ আর হাড় কাঁপানি শীত যেন একজোট হয়ে আমার ঘুম নিয়েছে কেড়ে। ঘুম আসে না, তবুও চোখ বুজে থাকি। চোখ মেলে তাকাতে যেন ভয় হয়। অকারণে বুক দুরদুর করে। কম্বলের উপর কম্বল চাপিয়েও যেন শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।

অরুণের চোখেও ঘুম নেই। বুঝতে পারি সেও জেগে আছে।

একই ঘরে পাশাপাশি রয়েছি কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। মনে হয় দু'য়ের মাঝে অনেক ব্যবধান।

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসে। অস্পষ্ট আলো যেন চুপি চুপি ঘরে ঢোকে। টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখি। সবে সাড়ে পাঁচটা। কম্বল ছাড়তে হয়। প্রাতঃকালিন কাজ সেরে বেরতে হবে। বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করে তৈরী হয়ে নি।

বাইরে বেরিয়ে দেখি জগৎরাম ও ধরম সিং দিব্যি একটা পাতলা বেডকভার গায়ে দিয়ে ঘুমচ্ছে। চাদরের উপর সাদা হয়ে পাতলা বরফ পড়ে আছে। ভাবি ওরা কি জীবিত—না মৃত। দেখে মনে হয় এযেন সমাধির বেদীমূলে শুভ্র পুষ্পাঞ্জলি। ডাকতে যেন ভয় হয়। তবুও ডাকি। চাদর সরিয়ে হাসি মুখগুলো বের করে গুডমর্নিং জানায়। সত্যি আশ্চর্য এদের জীবন! শীতে তুষারপাতে এরা বিচলিত নয়। এরা যেন প্রকৃতির দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করেই বেঁচে আছে।

তৃণশয্যা ছেড়ে উঠেই জগৎরাম চায়ের ব্যবস্থা করতে যায়। আমি তাকে বলি চায়ের কোন প্রয়োজন হবে না। ফ্লাস্কে তো কফি আছে। তাই খেয়ে সকলে বেরিয়ে পড়বো।

সূর্য ওঠার আগেই বেরতে হবে। নইলে সূর্য উঠলে যেতে কষ্ট হয়। তাছাড়া বেলা হলে সাধারণতঃ বৃষ্টি ও তুষারপাত শুরু হয়। সুতরাং যতদূর সম্ভব সূর্য ওঠার আগে বেরিয়ে দুপুরের মধ্যেই বাংলোতে ওঠা প্রয়োজন। সেই ভেবেই অতি ভোরে উঠি। জামাকাপড় পরেই কালরাতে শুয়েছিলাম। তাই প্রস্তুত হতে বিশেষ দেরী হয় নি। মুখে ভাল করে বোরোলীন মাখিয়ে নিই। সকাল থেকেই আজ চোখে রঙিন চশমা এঁটে নিয়েছি। পকেটে লজেন্স, ছোলা ভিজে ইত্যাদি সবই ঠিক আছে। কেবল কফি চুমুক দিয়েই বেরিয়ে পড়বো। চুমুক দিয়েই বুঝতে পারি এটা গরম কফি নয়—এটা কোল্ড ড্রিঙ্ক।

সেন আক্ষেপ করে বলে এত কষ্ট করে ফ্লাস্কগুলো নিয়ে এলাম

হাঁটাপথে গরম কফি খাব বলে—আর তার কিনা এই অবস্থা।

সুধেন্দু হাসে। বলে এই ঠাণ্ডায় এসব ফ্লাস্ক কোন কাজেই আসে না। সকালে গরম চা না পেয়ে অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়। আমি হাসি। বলি নাই বা হোল গরম—ঠাণ্ডাতো বটে। হাঁটলেই সেটা পেটে গরম হয়ে যাবে। কষ্টের মধ্যেও সকলে হাসে। ঠিক হায়। কই বাত নেহি। এগিয়ে চল।

কাল রাতের গণ্ডগোল, ঝগড়া আর নেই। সকলেরই মনে আজ নতুন উদ্দীপনা, বুকভরা আশা। সকলেই যাবার জন্য প্রস্তুত। সেন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। খুশীতে সে ডগমগ। পুরো-দমে সে কাজে নেমে গেছে। মালপত্র গোছগাছ করে কুলির মাথায় চাপিয়ে ও একটু পরে রওনা হবে। ওর সঙ্গে ব্যানার্জিদারা আসবে।

সকাল তখন পনে সাতটা অজিত ও স্বপনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়ি। বাংলোর সামনে চড়াই পথ ধরে উঠতে থাকি। কুয়াশার ঘন অন্ধকারে চারিদিক অবলুপ্ত। পাহাড় পর্বত বনভূমির যেন এখনও ঘুমঘোর কাটেনি। অতি সন্তর্পনে ঘুরে ঘুরে বনময় পথ ধরে চলি। স্বপন ও অজিতের মনে আজ বিপুল উৎসাহ। ভুলেগেছে ওরা গত রাত্রের সব কথা। হাসিমুখে মনে স্ফূর্তি নিয়ে চলেছে এগিয়ে।

ওদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি হিমালয়েব আশ্চর্য মহিমা। এর সর্বত্রই যেন জাদুর ছোঁয়া লেগে আছে। এর পায়ের নীচে এসে দাঁড়ালে মানুষ যেন সব কিছুই ভুলে যায়। ভুলে যায় যত বিরোধ যত দুঃখ। ধুয়ে যায় যত মনের মলিনতা। মুছে যায় দেহের গ্লানি। ক্ষণিকেই যেন নতুন আশায়, উদ্দীপনায় ভরিয়ে তোলে মন। সবই যেন স্বপ্নের মত লাগে। প্রকৃতিব সৌন্দর্য সুষমায় তখন নিজেকে মন হয় কত তুচ্ছ।

হিমালয়ের এই মুক্ত অঙ্গনে এসে মনে হয় যেন প্রতিটি পাথব কাঁকর, গাছপালা, ফলফুল, পশুপাখী, গিরিনির্ঝর—সকলেই যেন ডাকে। মোহময় করে তোলে। গাছের ছায়া মনে হয় মায়া।

পাখীর গান—আকুল করে প্রাণ। নদীর চঞ্চল প্রবাহে যেন বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয়। পথের পাশে স্নিগ্ধ কোমল ফুলের শোভা। যেন গালভরা মিষ্টি হাসি হেসে পথিকের মন ভোলায়। সুনীল আকাশে আলো ছায়ার লুকোচুরি, মেঘের আবরণের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক মারা তুহিন শৃঙ্গমালা মনকে যেন দুলিয়ে তোলে। হাতছানি দিয়ে ডাকে। সত্যি হিমালয় ডাকে। এ ডাকে স্নেহ আছে, মায়া আছে, মোহ আছে। এ ডাক—পাগল করা ডাক। এ ডাকে জাদু আছে। এ ডাক যে একবার শোনে, একবার যে দেখে এর নৈসর্গিক শোভা, মরমে মরমে যে উপলব্ধি করে দেবতাত্মা হিমালয়ের মাহাত্ম্য—সে কি আর নীরব থাকতে পারে? এখানে এসে অবলার যেন বোল ফোঠে। পঙ্গু যেন চলার প্রেরণা পায়। বধির যেন শুনতে পায়। দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি ফেরে।

ক্রমে অন্ধকার সরে যায়। ঘন কুয়াশার আস্তরণ ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রভাত আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মঙ্গলময়ী কল্যাণী ঊষা তার আলোকচ্ছটার দীপ্যমান বরণডালি নিয়ে সম্মুখে সমাগতা। পূব আকাশে শুরু হয়েছে আলোর উদ্বোধন। কুমকুমের রঙে রাঙা সূর্যের প্রথম আলো এসে প্রথম চুম্বনখানি দিয়ে গেল গিরিরাজের কপালে। এঁকে দিল শত রঙের আলপনা নীল আকাশের গায়ে। বনে বনে পাখীর গানে গানে যেন বিচিত্র সুরের জলসা বসেছে।

প্রভাত হয়েছে। ঘুমভাঙ্গানো গানে যেন আকাশ বাতাস মুখর। যেন দেবতার নাম গান শুরু হয়েছে। এযেন শীতের সকালে লেপের তলায় শুয়ে আধোঘুমে আধোজেগে হরিগুণ গান গাওয়া প্রভাত ফেরীর সেই সুর ভেসে ওঠে। শিশু কালের সেই লুপ্ত চেতনা যেন আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসে। সেই গান—সেই চেনা চেনা সুর আবার যেন কানে আসে। আনন্দের হিল্লোলে চড়াই পথে উঠতে থাকি।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে চলেছে আলো আর অন্ধকারের লুকোচুরি।

ঝর্ণাধারার মত আলোর বন্যা কুয়াশা ভেদ করে স্বর্গ থেকে নেমে এলো মাটির বুকে। পায়ের নীচে যেন সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। শিশির সিক্ত নরম মাটির স্পর্শটুকু পথিকের মনে এক অপূর্ব শিহরণ জাগায়। দুলে দুলে পথ চলি।

বাঁদিকে বিশাল খাদ। নীচে পিণ্ডারী। ডানদিকে গভীর বন। অন্ধকার। সূর্যালোক সেখানে কোনদিন প্রবেশ করে কিনা জানিনা। গা ছমছম করে। একসঙ্গে পাঁচজন দলবদ্ধ হয়ে চলি। বনের ভেতরে সামান্য খসখস শব্দ হলে চমকে উঠি। এদিকে সেদিক ভাল ভাবে দেখি। আবার পা বাড়াই। হঠাৎ একদল হনুমান চোখে পড়ে। গাছের মগডাল থেকে অপর গাছে লাফ দেয়। সব সময়ই ভয়ভয় করে। নৈনীতালের টুরিষ্ট অফিসার মিঃ কমলের কথা বারবার স্মরণ করি।

'যদি সম্ভব হয় তবে অস্ত্র নিয়ে যাবেন। সবসময়ই চেষ্টা করবেন একসাথে যেতে। দলছাড়া হবেন না। কুলি গাইড সব সময় যেন সাথে থাকে।' কিন্তু মনে হলে হবে কি—জগৎরাম ও ধরমসিং আসবে সেনের সাথে। ওদের আসতেও কিছু বিলম্ব হবে। তাই যতখানি সম্ভব নিজেরাই দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছি।

পথ ধীরে ধীরে ওঠে। আকাশের গায়ে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ যেন হাসতে থাকে। কুয়াশায় কখনও অবলুপ্ত কখনও বা সূর্যকিরণে প্রতিভাত।

অকস্মাৎ দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। চোখ তুলে চেয়ে দেখি প্রভাত আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায়। তুষার ধবল শ্বেত কিরীটের মাথায় মাথায় যেন মাণিক জ্বলে। জ্যোতির্ময়।

আলো পড়েছে পথের মাঝে। ঘাসের ডগায় ডগায় ফোঁটা ফোঁটা শিশিরবিন্দু মুক্তের মত ঝলমল করে। অন্তর পুলকে ভরে। দুর্ভাবনা কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। সবই যেন স্বর্গের অনুপম শোভায় রূপ নেয়।

কত বিচিত্র গানে গানে মুখর হয়েছে প্রভাতী আকাশ। মুখর

হয়েছে বাতাস নদীর উচ্ছসিত কলরোলে। মনের আনন্দে মামুলী পাহাড়ী পথ ধরে চলেছি যেন কোন অজানা দেশে।

ঘাস পাথর, আর ঝরা পাতার উপর পা ফেলে মর্মর শব্দ তুলে চলেছি নিবিড় বন পথ ধরে। মুক্তির আনন্দে মন মাতাল। চোখে রঙের নেশা। বুকের বীণায় বাজে সুরের আলাপ। বিবাগী ভ্রমর যেন আপন আনন্দেই গুনগুনিয়ে উঠেছে। আনন্দে মাতোয়ারা পদযুগল চলেছে অবিরাম দ্রুত গতিতে। উপরে চেয়ে চেয়ে দেখি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ চলেছে আমাদের পথ দেখিয়ে। মনের অতৃপ্ত বাসনাটুকু নিয়ে চলেছে সে আনন্দলোকের উদ্দেশ্যে।

পথ ঘুরে নীচে নামে। হঠাৎ কানে আসে নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ। চেয়ে দেখি সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরছে রূপোলী ঝর্ণাধারা। ঝর্ণার উচ্ছল স্রোত ধারা আপন উদ্দামে, বুকভরা আনন্দ নিয়ে, সমুজ্বল রূপোলী রেখা টেনে, সবুজের বুক বিদীর্ণ করে, নেমে আসছে পথের মাঝে। হাসির লহরি তুলে সঙ্গীতের ছন্দ ফুটিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পিণ্ডারীর কোলে। যেন পাথর থেকে পাথরে ঝরছে অমৃত সুধা। শিশুর মত নির্মল হাসির রোল তুলে, দু'বাহু বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্নেহময়ী জননীর বুকে। আনন্দে মাও হাসে শিশুও হাসে।

নদীর কল-কল্লোল আর ঝর্ণার সুর মূর্ছনায় মনটা যেন উদাস মায়ায় ভরে ওঠে। শূন্যমনে উৎরাই পথে নামি। নদী যায় পাশ কাটিয়ে। পথ নামে 'V' এর আকারে। বাঁকের মুখেই ঝর্ণা। সবুজ বনের ভিতর থেকে পাহাড়ের গায় বেয়ে আছড়ে পড়ে নির্মল জলধারা পাথরের বুকে। প্রচণ্ড গর্জন তুলে গড়িয়ে পড়ে পিণ্ডারীতে। হাওয়ায় ওড়ে শত সহস্র জলবিন্দু। যেন জলের ওড়না ওড়ায়। নিমেষে চোখ মুখ ভরে যায় জলবিন্দুতে। রাস্তা পারাপারের জন্য ছোট একটা কাঠের পুল রয়েছে। ক্ষণিক সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করি। অবাক হয়ে দেখি সেই অপূর্ব ঝর্ণাধারাটিকে। প্রায় ১০০ ফুট উঁচু থেকে নেমে আসছে নীচে। সারা অঙ্গ জলের ছাটে ভিজে যায়—তবুও ভারি ভাল লাগে।

রুকস্যাক খুলে বিস্কুট বের করে সুধেন্দু সকলকে দেয়। অরুণ ঝর্ণার জল আনে। ঠাণ্ডা জল পানে দেহমন সতেজ করে।

সূর্যালোকের চিহ্ন নেই। অন্ধকার। শুধু কুয়াশার লুটোপুটি। চারিদিকে বিশাল বৃক্ষের সমাবেশ। মাটিও স্যাঁৎসেঁতে। নির্জন বনভূমির মাঝে জগৎরামদের ছেড়ে বসে থাকতে ভয় ভয় করে। সবে মাত্র মাইল দুয়েক পথ এসেছি। যেতে হবে অনেকদূরে। তাই একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করি।

'V' এর অপর কাঁধ ধরে উঠি। চড়াই পথ। এত সরু যে পাশাপাশি দু'জনে যাওয়া যায় না। তাই একে অপরের পিছু পিছু উঠি। প্রথমে আমি তার পিছনে অরুণ, সুধেন্দু, অজিত ও শেষে স্বপন। দেহটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই পথে উঠি থাকি। বাঁদিকে তাকালে ভীষণ ভয় করে। ৫০০ ফুটের মত বিশাল খাদের নীচ দিয়ে বয়ে যায় পিণ্ডারী। সেদিকে না তাকিয়ে মাথা নীচু করে উঠি। চড়াই পথও প্রায় শেষ হয়ে আসে এমন সময় হঠাৎ স্বপন চিৎকার করে বলে দী-প-ক-দা ভা-ল্লু-ক। ভয়ে চমকে উঠি। হাত পা থরথর করে কাঁপে। সামনে পথের মাঝে হাত পাঁচেক দূরে দেখি এক বিরাট কালো ভাল্লুক। শুয়ে ছিল। আমাদের দেখে হুড়মুড় করে দৌড়ে বনের মধ্যে ঢোকে। নিমেষে সারা বনভূমি যেন কেঁপে ওঠে। মিনিট কয়েকের জন্য আমরা যেন চোখে সরষের ফুল দেখি। সারা শরীর কাঁপতে থাকে। শীতের দেশ তবুও গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে। কাঁপতে কাঁপতে একটু এদিক ওদিক হয়ে বাঁদিকের খাদে পড়লে সলিল সমাধি। ভয়ে পথের মাঝেই জড়সড়ো হয়ে দাঁড়াই মুখে কারো কথা নেই। বুকটা হাপরের মত খপ্ খপ্ করে। মিনিট পাঁচেক বাদে খানিক আশ্বস্ত হই। কিন্তু কেউ আর এগিয়ে যেতে রাজী নয়। সকলেরই মুখে এককথা জগৎবাম আসুক তবে আবার রওনা হব।

একটা পাথরের ওপর সকলে বসি। বসেও শান্তি নেই।

হাওয়ায় গাছের ডাল নড়লেও চমকে উঠি। এদিক ওদিক বারবার ফিরে ফিরে দেখি। খসখস্ শব্দ। এ ডাল থেকে ও ডালে হনুমান লাফ দিলেও ভীষণ ভয় হয়।

আকাশ কুয়াশায় ভরা। সূর্যদেব মাঝে মাঝে মিটিমিটি চান। তবে বনের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার যেন তাঁর নেই। সেখানে চলেছে অন্ধকারের খেলা। সেদিকে তাকালেও যেন ভয় করে।

মিনিট পনেরো বসে থাকার পর মনে আবার সাহস ফিরে আসে। দলের সকলকে যাত্রার জন্য তৈরী হতে বলি। অজিত বেঁকে বসে। জগৎরামবা না আসা পর্যন্ত সে আর হাঁটতে রাজী নয়। স্বপন বলে আবার যদি পথে ভাল্লুক বা অন্য কোন জন্তু জানোয়ার এসে পড়ে তাহলে বিপদ হতে পারে। তার চাইতে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক ওরা আসে কি না। নইলে হাঁটতে শুরু করবো। আর ঐ প্রকাণ্ড ধুমসো কালো ভাল্লুক যদি কারো ঘাড়ে পড়ে… !

স্বপনের কথা শুনে হঠাৎ আমার মনে পড়ে জিম করবেটের কথা। করবেট ভাল্লুক প্রসঙ্গে বলেছেন—হিমালয়ের ভাল্লুক কোন কিছুতেই ভয় পায় না। এমন কি বাঘের পিছু পিছু ধেয়ে তাকে শিকার থেকে ব্যাহত করে। কিন্তু ভাল্লুক মানুষের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তার ওপর যদি কোন বাঘ মানুষ শিকার করে তাহলে সেই রক্তাপ্লুত মানুষ ও শিকারী বাঘকে দেখে সে দূরে সরে যায়। কারণ ভাল্লুক রক্তের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

'A Himalayan bear who fears nothing, and who will, as I have on several occasions seen, drive a tiger away from its kill, was no deterrenh, but what was, and what was causing •him uneasiness, was the smell of a humam being mingled with smell of blood and tiger.'

আমার কথা শেষ না হতেই অজিত বলে যখন জিম করবেটের কথা বললেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর আর একটা কথাও মনে আছে—

করবেট বলেছিলেন হিমালয়ের ভাল্লুক মানুষ খায়। তবে তিনি একটি মাত্র ঘটনার কথাই বলেন। একদিন একটা মেয়ে জঙ্গলে ঘাস কাটতে কাটতে হঠাৎ উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে মারা যায়। একটা ভাল্লুক সেই মৃত মেয়েটির ছিন্নভিন্ন দেহটাকে দেখে টেনে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খায়।

'I know of only one instance of a Himalayan bear eating a humam being; on that occasion a woman cutting grass had fallen down a cliff and been killed, and a bear finding the mangled body had carried it away and had eaten it.'

সত্যি কথা বলতে কি ভয় পেলে বিশেষ কোন যুক্তি চলে না। সবি যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। মাথায় কিছুই যেন ঠিক মত খেলে না। প্রায় আধঘণ্টা সময় চলে গেল। বসে শুধু এদিক ওদিকে চেয়ে চেয়েই দেখি। একটু কিছুর শব্দ পেলে সকলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। হঠাৎ সুধেন্দু বাঁকের মুখে সেনকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। ভাবে এই বুঝি জগৎরামরা এসে গেছে।

সেন আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে মহাআনন্দে বলে যাক্ তোদের ধরে ফেলেছি। নিজেই নিজের প্রশংসা জাহির করে অজিতকে বলে দেখলি তো তোদের আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে কেমন ধরে ফেললাম। মৌজে সিগারেট টেনে বলে বুঝিলেতো একে বলে হাঁটা। এই শর্মা যদি মনে করে তা'হলে তোদের ফেলে বহুদূর এগিয়ে যেতে পারে।

আমরা সকলেই নীরব হয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ সেনের কথায় অজিত বলে যাক্ তুমি যখন অতই বাহাদুর তখন তুমি এগিয়ে চলো আমরা তোমার পিছন পিছন যাচ্ছি।

সেনের মনে খটকা লাগে। আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলে কি ব্যাপার বলতো! সকলেই তোরা চুপচাপ।

স্বপন বলে আজ যাত্রার প্রথমেই ভাল্লুক।

ভা-ল্লু-ক! সেন তো আঁতকে ওঠে। বলে কোথায়!

সুধেন্দু বলে এবার বাহাদুরি সব থেমে গেল। যে পাথরে

বসেছো ঐ খানেই শুয়ে ছিল। সেন সঙ্গে সঙ্গে উঠে আমাদের কাছে এসে বসে। আর যাবার কথা বলে না।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা ক্রমেই ঘুরে চলেছে। জগৎরামরা এখনও এসে পৌঁছায়নি। আর দেরী করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত হবে না ভেবে অরুণ ও সুধেন্দুকে এগিয়ে যাবার কথা বলি। ওরা রাজী হয়। কিন্তু কেউ প্রথমে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায় না। অগত্যা আমাকেই প্রথমে চলতে হয়।

আকাশ ভরা সোনার আলো। শ্যামলিমা প্রকৃতির মুখে স্নিগ্ধ হাসি। উচ্ছল নদীর চঞ্চল প্রবাহ। রজত শুভ্র শিখরে শিখরে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির বিচিত্র খেলায় সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগে। পথ যেন ডাকতে থাকে। নবীন উৎসাহে এগিয়ে চলি। আঁকা-বাঁকা মামুলী পাহাড়ী পথ চলেছে ঘুরে ঘুরে। বাঁদিকে বিশাল গিরিখাদের মধ্যে দিয়ে ছুটেছে পিণ্ডারী। যেন মুক্তির খোঁজে। পাষাণ কারার রুদ্ধ দুয়ার চূর্ণবিচূর্ণ করে, বনের নিস্তব্ধতা ভেঙে চলেছে ঐ প্রবাহিনী নিজেকে অলকানন্দার বুকে বিলিয়ে দিতে।

ডানদিকে খাড়া পাহাড়। গায়ে গায়ে অরণ্যের বসতি। বিশাল পাইন, চীর, দেওদার গাছের সারি। নির্জন জনহীন বন পথে আমরা ক'টি পথিক গতির ছন্দ তুলে এগিয়ে চলি। বাঁদিকে তাকালেই যেন বুক দুরদুর করে ওঠে। বিশাল খাদ। কোথাও পাঁচশো ফুট কোথাও বা তার চাইতে বেশী। অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সরু পথ ধরে চলি। আবার পথ ঘুরে আসে। 'V' আকারে নামে। হঠাৎ একদল লেজবিহীন পাহাড়ী ইঁদুর পায়ের উপর দিয়ে ছুটে যায়। চমকে উঠি। সেন তাড়াতাড়ি তার রুকস্যাক থেকে এক বিরাট ছোরা বের করে। সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। সেনসাহেব এবার বুঝি ছোরা দিয়ে বাঘ ভাল্লুক রুখবে। সুধেন্দু ঠাট্টা করে বলে দেখো ভাই নিজের ছোরা যেন আবার নিজের পেটেই না ঢোকে। সেন লজ্জা পেয়ে ছোরাখানি ঢুকিয়ে রাখে।

ধ্বসা রাস্তা। ঝুরঝুরে পাথর কাঁকরে ভরা। এক পা

ফেলতেই যেন পাঁচ পা নামিয়ে দেয়। একে একে অতি ধীর পদক্ষেপে নেমে আসি। এখানে কোন ব্রীজ নেই। সুতরাং জলের ওপরে মাথা উঁচু করা পাথরগুলোতে পা রেখে পার হতে হবে। যদিও জলের গভীরতা খুবই কম—পাথরগুলো দেখেও মনে হয় দিব্যি পার হওয়া যাবে। কিন্তু সে ধারণা একেবারেই ভুল। কারণ শ্যাওলার বিচিত্র রঙ। সব সময় যে সবুজ হবে এর কোন কারণ নেই। তাই চটপট পাথরের উপর পা দিলেই হড়কে যেতে পারে। আর ঐ পাহাড়ী ক্ষীণ ঝর্ণার জলের যে তীব্র গতি তাতে একবার পিছলে গেলে অতল খাদে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। তাই হুঁসিয়ার হয়ে পার হতে হয়।

তাচ্ছিল্য মনভাব নিয়ে যেই অরুণ পা বাড়ায় অমনি ধপাস। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি অজিত। সেই একই অবস্থা। অবশেষে নিজেরা সকলে মিলে হাতে হাত লাগিয়ে শিকলের মত করে একে একে পার হয়ে আসি।

'V'এর কাঁধ ধরে উঠি। আবার সুন্দর পথ মেলে। বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। ভয় ভীতি সবই যেন ভুলে গেছি। প্রকৃতির মনোলোভা শোভায় দু'চোখকে আবার যেন সুখময় করে তোলে। মনভরা আনন্দ নিয়ে তড়িৎ গতিতে হাঁটতে থাকি।

সূর্যের আলোয় দিক্‌দিগন্ত ঝলমল করে উঠেছে। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। যেন হাত ধরে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে কিসের আশায়। সবুজ বনানীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় তুষারবৃত শিখরমালা। যেন দাঁড়িয়ে আছে সোনার জলে মিনা করা সারিসারি পিরামিড। সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরেছে কত রূপোলী স্রোতধারা। যেন মনে হয় বিশ্বশিল্পী তুলির টানে এঁকেছেন বসুন্ধরার কপালে মঙ্গল তিলক। উপরে চেয়ে দেখি মেঘের দল চলেছে উড়ে উড়ে যেন আমাদের পথ দেখিয়ে। মনে প্রতি মুহূর্তে কত শত দুশ্চিন্তা জট পাকায়। ভাবনার আগেই দমদেওয়া পুতুলের মত পদযুগল চলতে থাকে।

সূর্যের আলো ঝিকমিক করে পিণ্ডারীর রূপোলী জলে। যেন তার গলায় দোলে রূপোর হাঁসুলি। বুকে তার রূপের অপরূপ সমারোহ। ঢেউ এর পর ঢেউ। কখনও কলহাস্যের রোল তুলে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ে। কখনও দেখি পাথরের জটাজালে আবদ্ধ শুভ্র জলের ফেনারাশি। যেন বলকে বলকে দুধ ঝরে। কখনও দেখি ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মত জল ওপরে ওঠে। যেন পাগলিনী মেয়ে নাচের তালে ঘাগরা ঘোরায়। ছড়িয়ে দেয় চতুর্দিকে অসংখ্য জলবিন্দু।

দু'দিকে পাহাড়। সবুজ বনভূমি। মাঝ দিয়ে ধেয়ে যায় দুরন্ত বেগবতী পিণ্ডারী নদী। নৃত্যপরা তন্বীর যৌবনোচ্ছল বঙ্গভঙ্গে।

পাথরের অবরোধ ভেঙে দুর্বার গতিতে নেমে চলে সমতলের দিকে।

পর্বতের গভীরতর অঞ্চলে যাবার একমাত্র নিশানা এই নদী পথ। দুষ্টু মেয়ের মত কত ছলা কলায় পূর্ণ এই পিণ্ডারী নদী। হাসি গান আর নৃত্যছন্দে ভরা। নিরন্তর নুড়ির নূপুর বাজিয়ে চলেছে সে আমাদের পথ দেখিয়ে। দু'জনের দুটি পথ—আমরা চলেছি ওরই উৎস মুখে আর পিণ্ডারী চলেছে আমাদেরই ফেলে আসা নিম্নাভিমুখে। বিচিত্র খেয়ালে রচা তার গতিপথ। ঘুরে-ফিরে, এঁকেবেঁকে আমরা চলেছি পায়ে চলার সামান্য পথরেখা ধরে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখে।

পথ ঘুরে আসে। নদীর ওপর পুল পেরিয়ে ওপারের রাস্তা ধরি। নদী এখন আমাদের ডানদিকে। সামনে সবুজ মাঠ। তারি পশ্চাতে গভীর বন। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ রেখা চলছে ঘুরে ঘুরে সেই বনের দিকে।

পথ যত এগিয়ে চলে নদী দূরে সরে। সবুজ মাঠ কাছে আসে। শীতের সকালের পাতলা সোনাঝরা রোদ ঝরেছে সবুজ ঘাসের বুকে। প্রকৃতির অঙ্গে চলেছে যেন রামধনু রঙের খেলা। উড়েছে পাখীর দল মনের আনন্দে ডানা মেলে। নীলিমার কোলে রঙের

আলপনা এঁকে এঁকে চলেছে তারা সুদূরের দিকে। মেঘ ভাসে। সুতোকাটা ঘুড়ির মত। হেলে-দুলে ঢেউ খেলে চলেছে তারা শুভ্র শিখরের দিকে।

গান ধরেছে নদী। আলাপী সুরের আকুল আহ্বান জানিয়ে। শিস দেয় পাখী। ভালবাসার স্পন্দন দিয়ে। পথের পাশে বনফুল হাসে। ভ্রমর ভ্রমরা মধুর গুঞ্জন তোলে। মৃদু শীতল বাতাস বয়। সুখের স্পর্শ দিয়ে। পথ ডাকে। সুন্দরী নীলিমা যেন ঘোমটা তুলে আহ্লাদী আঁখি মেলে চাইতে থাকে। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। মুখমণ্ডলে যেন মোহিনী রূপের আভা। আহা! কি অপূর্ব শোভা! কি রূপগৌরব! এ যেন প্রকৃতিরাণী মাধুর্যের শেষ কণাটুকু বিলিয়ে দিয়ে এঁকেছেন এক অপূর্ব আলেখ্য। এ রূপের বর্ণনা হয় না। এ যেন প্রকৃতির চিত্রশালা। সমগ্র মন প্রাণ এক অব্যক্ত আনন্দ-হিল্লোলে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মুগ্ধ চোখ প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবেশের মাঝে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে। আশার নব চেতনায় পদযুগল চনমন করে। এ যেন প্রকৃতির ভালাবাসা। সুখময় স্পর্শে সারা দেহ মোহময় ওঠে। কি যেন ভাবি। ঘুরে ফিরে দেখি। রোদের সোনা ছড়িয়ে আছে মাটির আঁচলে আঁচলে। হাসির বাঁধন টুটে উছলে পড়েছে কচি ঘাসের ডগায় ডগায়।

পথ চলি যেন দুলে দুলে। মোলায়েম ঘাসে ছাওয়া মেঠো পথ। এঁকেবেঁকে চলেছে যেন স্বপ্নময় জগতের সন্ধান দিয়ে।

হঠাৎ বিকট শব্দে আঁতকে উঠি। দাঁড়াতে হয়। দেখি প্রকাণ্ড দু'টো মোটাসোটা পাহাড়ী কুকুর ছুটে আসছে আমাদের দিকে। যেন ছোটখাট ভাল্লুক। সেনতো ভয়ে জড়োসড়ো। চিৎকার করে। ছোরা বের করার সময় তার নেই।

পাহাড়ী কুকুরগুলো ভয়ঙ্কর। ওরা সময় সময় বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে। তাই পাহাড়ীরা ভেড়ার পাল পাহারা দেবার জন্য কুকুরগুলো নিয়ে আসে। ওরা সব সময়ই সজাগ। একটু খুট করে শব্দ পেলেই তেড়ে যায়। ওদের গলায় একটা

লোহার বা ঐ জাতীয় মোটা টিনের বেড়ি দেওয়া থাকে। যাতে বাঘ ভাল্লুক ওদের গলায় কামর দিতে না পারে।

কুকুর দু'টো দেখেই বুঝতে পারি নিশ্চয়ই নিকটে পাহাড়ীদের কোন আস্তানা আছে। তাই সকলে চেঁচাতে শুরু করলে একটা পাহাড়ী মেয়ে এগিয়ে আসে। সুর করে ডাকে। কুকুর দু'টো ফিরে যায়। এগিয়ে যাই। ভেড়ার পাল ও অস্থায়ী আস্তানা চোখে পড়ে। মেয়েটা আমাদের দাঁড়িয়ে দেখে। ক্ষণিক বাদে এক পাহাড়ী আসে। সেলাম দেয়। সেন সিগারেট দেয়। খুশী হয়ে দাঁত বের করে হাসে। দেখতে দেখতে ঘরের ভেতর থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে ক'টা বাচ্চা ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসে। সুধেন্দু লজেন্স দেয়। ওদের মুখে হাসি ফোটে। কচি কচি পা ফেলে হাত তুলে একে একে এগিয়ে আসে। ওদের মা পিছনে দাঁড়িয়ে দেখে। লজেন্স নেয় আর ফিরে যায়।

শিশুগুলোর পরনে মলিন ছেঁড়া জামা। খালি পা। চোখে নাকে পিচুটি ভরা। তবুও এদের গোলাপী লাল রঙের গাল, মিটি-মিটি বিড়াল ছানার মত চাউনি ভরা চোখ, মুখে আধো-আধো কথা আর ফুলের মত কোমল চেহারা নিয়ে যখন থপ থপ করে এগিয়ে আসে তখন ভারি ভাল লাগে। মনে হয় যেন আধাফোটা লাল-গোলাপের কুঁড়ি ভরা গাছ হেলে দোলে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে আবার চলতে থাকি।

মনে কোন ভাবনা নেই। চিন্তা নেই। নেই কোন ভয় ভীতি। চোখে শুধু দেখার নেশা। মন মেতেছে রূপের মাঝে ঐ নীল আকাশে মেঘ বলকার ঝাঁকে।

সোনালী রোদ লুটিয়ে পড়েছে ঐ শ্যামল সবুজ মাঠে। ঝির ঝির শব্দ উঠেছে পাইনের পাতায় পাতায়। সঙ্গীতের ছন্দ ফুটেছে যেন মনের গহনে। পথ যেন মাঝে মাঝে দুষ্টু মেয়ের লুকিয়ে পড়ে। এদিক ওদিক খুঁজি আবার দূরে দেখি পথরেখা। অসীম আনন্দে বুক ভরে। মুখে হাসি ফোটে।

ছু'দিকে সারি সারি গাছ। মাঝে পথ। চলেছে একেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে। মাথার উপর সবুজ পাতায় পাতায় ডালে ডালে জড়িয়ে আছে। যেন ছায়ামণ্ডপের প্রবেশ পথ ধরে চলা। শুধু গাছের গুঁড়ি আর সবুজ পাতার ঝালর ঝোলে। ক্রমে বন হাল্কা হয়। নদী কাছে আসে। আবার আলোয় আলোকময়। যেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা ওঠে। সুমধুর ধ্বনি ফুটে ওঠে। নাচের ঝঙ্কার তুলে ছুটে আসে পিণ্ডারী বিশ্বমায়ের কোলে। আবার শুরু হয় প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে চিত্রশালার দৃশ্য।

পথের ডানদিকে বিশাল খাদ। নীচে পিণ্ডারীর উদ্দাম কলচ্ছ্বাস। ধসা পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পথরেখা। ডানদিকে তাকালে বুকের ভিতর যেন শিউরে ওঠে। একে একে বাঁদিকের পাথর ধরে অতি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। হাতের চাপে মাঝে মাঝে পাথর খুলে পড়ে নীচে গড়িয়ে যায়। যেন নির্জন পাহাড়-তলির বুকে কারা হুঙ্কার তুলে ছুটে আসে। পা কাঁপে। তবুও এগিয়ে যাই। পথ যেন ফুরবার নয়। ক্রমে খাদের প্রশস্ততা সঙ্কুচিত হয়। ওপারে নদীর তীরে একটু ওপরে দেখা দেয় দোয়েলির বাংলোখানি। মনে অফুরন্ত আনন্দ আনে। বিশ্রামের আশায় পদযুগল ব্যস্ত হয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি যাবার উপায় নেই। একটু পা এদিক ওদিক হলে সলিল সমাধি। পা টিপে টিপে ঘুরে ঘুরে নেমে আসি নদীর তীরে।

ওপারে বাংলোটি এখন খুবই স্পষ্ট। পারাপারের জন্য ছু'টো কাঠ ফেলা আছে। বাংলোর দিক থেকে কাফনি নদীর ক্ষীণ ধারা এসে পড়ছে পিণ্ডারীতে। পিণ্ডারীর তীব্র বেগ। ভীম গর্জনে মুখরিত পরিবেশ। উৎক্ষিপ্ত ঢেউগুলো যেন ছুটে এসে সশব্দে পাথরে আঘাত করে। আবার কল কল নিনাদে উদ্দাম বেগে ধেয়ে যায়। হিমালয় ছুহিতা পিণ্ডারী যেন জলসাঘরের আসর বসায়। নাচ গানে মসগুল। ঢেউ এর পর ঢেউ আসে আর পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালিয়ে যায়। নাচে পাগলিনী মেয়ে সাদা

জলের ওড়না উড়িয়ে। ঢেউয়ের দোলায় আমিও যেন আনমনে দোল খেয়ে যাই। পাহাড়ী নদী—বুকভরা নুড়ি পাথরের মেলা। বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ডে বাধা পেয়ে শীর্ণা স্রোতস্বিনী যেন আজ কলস্বনা। দুর্বার হয়েছে তার নিম্নাভিগমন। স্বচ্ছ জলের বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে রূপোলী মাছের দল খেলে বেড়ায় নির্ভীক আনন্দে।

মনে হয় নদীর জলে বুক ভাসিয়ে, পাথর জড়িয়ে নিঃসাড়ে পড়ে থাকি দীর্ঘ দিন ধরে।

কাঠ পেরিয়ে ওপারে যেতে ভীষণ ভয় করে। পা ফসকালে আর রক্ষে নেই। নীচে উৎক্ষিপ্ত ঢেউ। বিশাল পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফিনকি দিয়ে ফোয়ার মত ওপরে ওঠে। যেন জলের স্তম্ভ। জলের ছাটে সারা অঙ্গ ভিজে যায়। ভয়ে ভয়ে কাঠ পেরিয়ে বাংলোয় যখন আসি তখন সকাল দশটা।

শান্ত সুন্দর নির্জন বনভূমির মাঝে অবস্থিত দোয়েলির বাংলো-খানি। উচ্চতায় ৮৪৫০ ফুট। খাতি থেকে এর দূরত্ব সাত মাইল। চারিদিক ঘিরে সবুজ পাহাড়। দূরে হিমবন্তের শিখরাবলি। নয়নাভিরাম শোভা। সূর্যের স্বর্ণরশ্মি পড়েছে চিরতুহিন শিখরে শিখরে। ধ্যান গম্ভীর দেবাদিদের জটাজালে যেন সোনার আলো লুকোচুরি খেলে। আলোব ঝর্ণাধারা নেমে আসছে আকাশ থেকে। চারিদিকে আলোর বন্যা।

শান্ত এই নিরালা পরিবেশটি যেন একান্তে কাছে ডেকে নেয়। প্রকৃতির সাথে আলাপের যেন শ্রেষ্ঠ সুযোগ মেলে। সাড়া নেই, শব্দ নেই—জনমানবের কোলাহল নেই। আছে শুধু প্রাণভরা পাখীর কাকলি আর পিণ্ডারীর সুমধুর কলধ্বনি। দিবানিশি নুড়ির নূপুর বাজিয়ে ঝুমঝুম ঝমঝম ঝঙ্কার তুলে, পথক্লান্ত পথিকের ক্লান্তি ভুলিয়ে চলেছে পিণ্ডারী হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে গান। সঙ্গীতে বিভোর করে তুলেছে দোয়েলির বাংলা-খানি। এ যেন প্রকৃতির জলসাঘর। আজ আবার যেন মন মুকুরে ভেসে ওঠে কুলু মানালির দৃশ্যখানি।

ছোট্ট বাংলো। সামনে একফালি লন। ফুলে ভরা। চারি দিকে সবুজ গাছের সারি। রোদে ভরে আছে লনটি।

বাংলোয় প্রবেশ করে পিঠের বোঝা নামিয়ে বসি। চৌকিদার রোদ পোয়াচ্ছিল। আমাদের দেখে উঠে আসে। বাংলোর একটু ওপরে চৌকিদারের থাকার ঘর ও রান্নাঘর।

চৌকিদার কাঠ আনতে যায়। জগৎরাম আসে। চায়ের ব্যবস্থা করে। ক্ষিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। রুকস্যাক থেকে পাঁউরুটি জেলি ডিমসিদ্ধ সন্দেশ ইত্যাদি বের করা হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে টুংটাং ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। বুঝতে পারি ধরমসিং কাছে এসে গেছে। দেখতে দেখতে সে হাজির হয়। পিছনে পড়ে আছে নাড়ু, পানু, ব্যানার্জিদা। ওদের আসতে দেরী হবে। আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে লনে এসে মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বসি। জগৎরাম চা নিয়ে আসে। পানু এসে পৌঁছায়। অরুণ তাকে অভ্যর্থনা জানায়। বলে পানু ঠিক সময় এসে হাজির হয়েছে।

শীতের দেশ। গরম চায়ে দেহমন সতেজ করে। বসে বসে রোদ পোয়াই। জগৎরামরা বসে মৌজে বিড়ি টানে। গল্প করে।

সোনালী রোদ উছলে পড়েছে সবুজ লনে। ঝলমল করছে পুষ্পিত কানন। চেয়ে থাকি টগরফুলের গাছটির দিকে। সবুজের বুকে সাদা সাদা ফুল যেন মুক্তদানার মত দেখায়। মৌমাছির গুনগুন ধ্বনি আর পিণ্ডারীর জল কল্লোলে নীরবতাকে যেন আরও গভীর করে তুলেছে। স্নিগ্ধ বাতাস। মরসুমী ফুলেরা দোলে। বসে বসে দেখি তাদের গালভরা হাসি। মনের মাঝে কত রঙিন আলপনা আঁকে। জেগে জেগে যেন স্বপ্ন দেখি সেই নন্দন কাননের।* চোখের পলকে পলকে যেন জাদুর ছোঁয়া লাগে।

সবুজ বনানীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় তুহিন শৃঙ্গমালা। যেন মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারে। সেদিকে চলেছে মেঘ। আঁধারের পতাকা উড়িয়ে। আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলা শুরু

* লেখকের নন্দন কাননে দ্রষ্টব্য।

হয়েছে। মাঝে মাঝে সূর্যরশ্মি মেঘের ওড়না ভেদ করে প্রবেশ করে। রূপোলী চূড়া ঝিলমিল করে ওঠে। ক্ষণিকেই মেঘেরা সে দৃশ্য ম্লান করে দেয়। এ যেন সেই মেঘের দেশ—দার্জিলিঙের দৃশ্য।

মোলায়েম ঘাসে গা এলিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি পিণ্ডারীর দিকে। ফেনিল মুক্ত গলা জল অবিরাম ছুটে চলেছে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে। জলের বুকে ঘুর্ণি তুলে হাসির বাঁধ ভেঙে চলেছে অভিসারিকা নিজেকে বিলিয়ে দিতে। শান্ত বনভূমি তাইতো মুখর হয়ে উঠেছে বেগবতীর উচ্ছল কলরোলে। নীরবে কান পেতে শুনি নদীর প্রবাহ গীতি। মন যেন অতলে তলিয়ে যায়।

সেন ডাকে। চৌকিদারের সঙ্গে আলাপ করতে যাই। চৌকিদার খাতিতে থাকে। যখন কোন লোক এ পথে আসে তখন খবর পাওয়া মাত্র সে বাংলোয় এসে অপেক্ষা করে। কাল বিকেলে খাতিতে আমাদের আসতে দেখে ও আজ খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছে এবং আমাদের অনেক আগেই এখানে পৌঁছে গেছে। দোয়েলির নিকটে কোন গ্রাম নেই। তাই সে বাংলোয় না থেকে খাতি গ্রামেই থাকে। ওখানেই তার ঘর বাড়ী।

চৌকিদারের বয়সও প্রায় ষাটের কোঠায়। কিন্তু তার হাঁটার গতি শুনলে কে বলবে সে বুড়ো হয়েছে। বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলে এখানে কি নিয়ে থাকবো– এখানে কোন ক্ষেত খামার নেই। নেই কোন লোকজন। তাছাড়া একা এই জঙ্গল পূর্ণ পরিবেশে থাকতে ভয় করে। বাঘের উপদ্রপ তো আছে। গ্রীষ্মকালে তু'একটা টুরিষ্ট পার্টি আসে তখন এসে থাকি। শীতকালে বরফ পড়ে।

বাঘের কথা শুনে স্বপন ও অজিত আঁতকে ওঠে। বলে আজ সকালেই আমরা ভাল্লুক দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। চৌকিদার ও জগৎরাম হাসে। বলে ভাল্লুক কিছু করবে না। ওতো হামেসাই ক্ষেত খামারে আসে। বিশেষতঃ মকাই পাকলে তো আর রক্ষে নেই। দিন রাত ভাল্লুকের উপদ্রপ। স্বপন বিস্ময়ে বলে ভাল্লুক

দেখে তোমাদের ভয় করে না। ওরা হাসে। বলে না বাবু। আমাদের জানানারাও যখন কাঠ কাঠতে কাঠতে বা ক্ষেতে কাজ করতে করতে ভাল্লুক দেখে তখন ওরাই তাড়িয়ে দেয়।

অজিত বলে আশ্চর্য ব্যাপার! মেয়েরা ভাল্লুক তাড়ায়! যদি একবার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে! জগৎরাম বলে ওদের তো প্রাণে ভয় আছে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে যে লাফিয়ে পড়ে না তা নয়। সেরকম ঘটনাও আছে। তবে কি—ভাল্লুককে কিছু না করলে ও ক্ষতি করে না। ওরা ক্ষেত থেকে মকাই ইত্যাদি ভেঙে নিয়ে পালায়। লোককে বিশেষ আক্রমণ করতে চায় না। তবে দুর্বিপাকে পড়লে ওরা আক্রমণ করে। পথে ভাল্লুক দেখলে একসঙ্গে হাততালি দেবেন বা চেঁচাবেন ভাল্লুক পালিয়ে যাবে। তবে যদি ভাল্লুক দেখে পাথর ছোঁড়েন তাহলে হয়তো ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে আপনাদের আক্রমণ করতে পারে।

হাসি গল্পে অনেক সময় কেটে যায়। ব্যানার্জিদারাও এসে পড়েছে। ধরম সিংকে রেখে আমরা ফুরকিয়ার পথে রওনা হই।

দোয়েলি থেকে পথ দু'ভাগে ভাগ হয়েছে। ডান দিকের পথটি গেছে কাফনি হিমবাহের (১৪০০০´) দিকে। দোয়েলি থেকে কাফনির দূরত্ব ৮ মাইল। পথটি বেশ দুর্গম। চড়াই। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে পথটি ঘুরে ঘুরে পৌঁছিয়েছে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে। সেখান থেকে মামুলী চড়াই উৎরাই পথ গিয়ে মিশেছে কাফনির পদপ্রান্তে। কাফনির সৌন্দর্য পিণ্ডারীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দোয়েলি থেকে সকালে বেরিয়ে কমনীয়া কুমায়ুনের কাফনি হিমবাহ দেখে বিকেলে ফিরে আসা যায়।

থাক এখন কাফনির কথা। ফেরার পথে দেখা যাবে। আমরা চলেছি পিণ্ডারী অভিমুখে। বেলা তখন এগারটা। আকাশভরা সূর্যের আলো। ঝলমলে প্রকৃতির মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ হাসি। চারিদিকে নয়নভোলান দৃশ্য।

বাঁদিকে পিণ্ডারী। ডানদিকে সবুজ গাছে ভরা পাহাড়ের

সারি। নদীর কিনার ধরে রাস্তা ক্রমেই ওপরে উঠতে থাকে। চড়াই আর চড়াই। তবে ঢাকুরির মত নয়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দম নিই। আবার চড়াই পথে উঠতে থাকি।

পথ ঘুরে আসে। বাঁকেব মুখে দেখি এক অতি সুন্দর পাখী। ময়ূরের মত রঙ। চিত্রিত দেহ। কিন্তু ময়ূর নয়। মনে হয় বন-মুরগী। আমাদের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে। ক্ষণিক তাকায়। তার পরেই ডানা মেলে উড়ে যায় নীল আকাশে। ছড়িয়ে দেয় রূপের ছটা নীলিমার বুকে। যেন সলজ্জ সুন্দরী নক্সা কাটা রেশমী শাড়ির ঘোমটা টেনে দূরে সরে যায়।

যতই ওপরে উঠতে থাকি ততই যেন সব কিছুই নতুন বলে মনে হয়। চারিদিক যেন স্বপ্নময়। নতুন আশার আলো মনটাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকে। সামনে দেখা যায় দিগন্তের বিস্তৃত ব্যাপকতা। দিগবলয়ের পানে চেয়ে চেয়ে দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

পথের পাশে প্রপাতের পতনধ্বনি, ঝর্ণার অবিশ্রান্ত কলগান, নদীর চঞ্চল রূপোলী রেখা চলেছে এঁকেবেঁকে। যেন গান ধরেছে অপ্সরার দল নূপুরের তাল তুলে। ঝিনি ঝিনি কিনি কিনি সুরের রেশটুকু লেগে থাকে কানে।

চড়াই পথ। তবুও যেন ভাল লাগে। মনে হয় চলেছি যেন স্বর্গরাজ্যে। দেহে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই—সবই যেন গেছে মুছে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের পুলকিত আগ্রহে পা যেন চলেছে আপনা থেকে।

আকাশ, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি যেন সজাগ হয়ে চেয়ে থাকে। চারিদিক আলোক উজ্জ্বল। কিন্তু কোথাও প্রাণের চঞ্চলতা নেই। গতিহীন, শব্দহীন, বিরাট নিস্তব্ধতা। বিশ্বনিখিল যেন স্থির মহা-মৌনী। পলকহীন আঁখি মেলে যেন তাকিয়ে থাকেন। এই ধ্যান গম্ভীর হিমালয়ের কোলে নিজেদের অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়।

ওপরে সুনীল আকাশ হাসে। হিমালয়ের স্নিগ্ধ আবহাওয়া দেহ মনে অনুপ্রেরণা আনে। বনপথ ধবে সর্পিল গতিতে এগিয়ে

চলি। ফিরে ফিরে দেখি। পথের পাশে বড় বড় গাছপালা। সবুজ আবরণ। চোখের দৃষ্টি যেন রোধ করে। বনদেবী যেন বনরাজ্যের অপরূপ শোভা ছড়িয়ে মন ভোলান।

পথ ঘোরে অর্ধচন্দ্রাকারে। হঠাৎ ঝির ঝির শব্দ শুনি। বাঁক ঘুরতে পথে পড়ে ক্ষুদ্র গিরি নির্ঝরিণী।

এখন অক্টোবরের প্রায় শেষ। ঝর্ণার জলও এখন কম। তাই পারাপারের কোন পুল না থাকলেও ঝর্ণা পার হতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। তাই জলের মধ্যে মাথা তোলা পাথরগুলোর উপর পা রেখে দিব্যি পার হয়ে এসে ক্ষণিক বসি। হিমালয়ের আবহাওয়ার আশ্চর্য মহিমা। স্নিগ্ধ বাতাসে নিমেষে চড়াই ভাঙার ক্লান্তি মিলিয়ে দেয়। বসে থাকতে ভাল লাগে। দু'চোখ যেন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। চেয়ে থাকি একদৃষ্টে ঝর্ণার দিকে। আহা! কি সুন্দর! কালো পাথরের বুকে ছোট ছোট রূপোলী ঢেউ তুলে চলেছে সে—আপন মনের উদ্বেল জোয়ারে। কুলকুল কলকল ছলছল রব তুলে ভরিয়ে তুলেছে বনদেবীর হৃদয়। সঙ্গীতের মূর্ছনায় নির্ঝরিণী যেন নিজেই বিভোর।

পথ চলি আর ভাবি হিমালয়ের কি বিচিত্র শোভা! কোথাও উপত্যকার বুকে শস্য শ্যামল ক্ষেত। কোথাও ফুলের শোভা। গন্ধে আকুল। কোথাও পাখী গাছের ডালে বসে মিষ্টি মধুর সুরে ডাকে। কখনও রোদ ঝলমল করে। কখনও দেখি মেঘের লুটোপুটি। কোথাও আলো কোথাও ছায়া নামে। নদী চলে পথ দেখিয়ে। মন ভরিয়ে। কূলে কূলে শ্যামল গাছের সারি। কোথাও ঝর্ণা নামে। সবুজের বুক থেকে যেন মুক্ত গড়ায়। কখনও তাকে দূর থেকে দেখি। কখনও কাছে পাই। আবার চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়। দুষ্টু মেয়ের মত সহসা যেন কোন অজানায় লুকিয়ে বেড়ায়। হঠাৎ আবার ডাক দিয়ে পালিয়ে যায় নিরুদ্দেশের পথে। আবার দেখি দূরের কোন গিরিগাত্র থেকে নেমেছে ঝর্ণা। চলেছে যেন আপন মনে সখা সন্দর্শনে। কত গিরিখাত বেয়ে কত বন-

ভূমির ছায়া অন্ধকারের মাঝ দিয়ে চুপি চুপি চলেছে যেন গোপন অভিসারে। পথ চলে এঁকেবেঁকে। নদী একটু একটু করে দূরে সরে। নদীর বুকে নুড়ির মেলা। বড় বড় পাথরের জটলা। শীর্ণা নদী পাথরের পাশ কাটিয়ে নুড়ির বুকে গা এলিয়ে চলেছে কুলকুল ধ্বনি তুলে। পথের দৃশ্য বদলায়। বন হাল্কা হয়। রুক্ষ নিরেট পাহাড়, পাথরের সারি ধূ ধূ করে। পথ ওঠে নামে। আবার ঝর্ণার শব্দ শুনি। ধীরে ধীরে পার হয়ে আসি। ক্রমাগত চড়াই ভাঙতে ক্লান্তি বোধ হয়। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করে আবার চলা।

আঁকাবাঁকা সরু পথ যেন হেলে দুলে নেচে নেচে এগিয়ে চলে। কখনও বা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়। আবার উঁকি দেয় খেলার ছলে। ডাক দেয় অজানা অচেনা কোন নতুন দেশের উদ্দেশ্যে।

লোক নেই জন নেই। শুধু দমকা তুহিন হাওয়া দোলা দিয়ে যায়। পথের পাশে বনফুলের মেলা, শুধুই লক্ষ রঙের খেলা। ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলি। অবাক হয়ে দেখি দু'টি নয়ন মেলে।

পথ নেমে আসে। বাঁকের মুখে দেখা হয় কেরালার এক অভিযাত্রী দলের সাথে। পাঁচজনের দল। সঙ্গে একজন মহিলাও আছেন। দলনেতা মিঃ আয়েঙ্গারের সাথে আলাপ হয়। জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারি কেরালায় তাদের একটা পর্যটক সংস্থা আছে। সেই সংস্থার সদস্যদের নিয়ে তিনি এসেছিলেন পিণ্ডারী দেখতে।

কথায় কথায় হঠাৎ আয়েঙ্গার জিজ্ঞাসা করেন আপনারা পথে কি কিছু দেখতে পেয়েছেন।

ওনার কথা শুনে মনে মনে ভাবি নিশ্চয়ই ওনারাও হয়তো আমাদের মত পথে ভাল্লুক বা অন্য কিছু দেখছেন তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে বলি হ্যাঁ আজ সকালেই খাতি ছাড়ার প্রায় মাইল দুয়েক পরেই একটা বিরাট ভাল্লুক আমাদের দেখে ছুটে বনের মধ্যে চলে যায়। সে কি ভয়! এক পা আর এগাতে পারি না।

কৌতূহল ভরে ওনারা সকলে আমাদের কথা শোনেন। বিস্ময়ে বলেন আপনারা তা'হলে ভাল্লুক দেখেছেন—কিন্তু আমরা

এখনও পর্যন্ত কিছুই দেখতে পাই নি।

একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আয়েঙ্গার বলেন আমাদের ভাগ্যই খারাপ। কাল রাতে প্রচণ্ড বরফ পড়েছিল। আজ সকালেও আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। পিণ্ডারী হিমবাহ ভাল করে দেখা হ'ল না। ঘন মেঘে হিমবাহ ঢাকা ছিল। অনেক্ষণ অপেক্ষা করি কিন্তু আকাশ আর পরিষ্কার হয় না। তাই ফিরতে হয়।

ভদ্রমহিলা আমাদের যাত্রার শুভ কামনা করেন।

অজিত ফুরকিয়ার বাংলোর খবর নেয়। জিজ্ঞাসা করে আর কত দূর ?

উত্তরে আয়েঙ্গার যা বলেছিলেন তা সত্যি মনে রাখার কথা। 'When you will be really tired, you will suddenly see the Bungalow in your front.'

হাত নেড়ে ওরাও চলে যায়। আমরাও চলতে থাকি। চড়াই আর চড়াই। পা যেন আর চলে না। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। কিন্তু পথ! সে চলেছেতো চলেইছে। এ তিন মাইল পথ যেন আর ফুরাবার নয়।

উপরে চেয়ে দেখি মেঘের দল চলছে উত্তর গগনে। যেন খেলার ছলে চলেছে ওরা সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কেউবা দল ছাড়া হয়ে পিছিয়ে পড়েছে সবার থেকে দূরে। কেউবা একা পাহাড়ের গায়ে স্থির হয়ে থমকে আছে যেন দারুণ অভিমানে। আলো আর ছায়া, মেঘ আর কুয়াশার যেন চলেছে রেষারেষি। সাঁঝ সকালে মত্ত ঝড়ো হাওয়া যেন পাগল হয়ে ছুটে আসে। পিছন থেকে কে যেন সজোরে ঠেলে দিতে চায় ঐ গহন অতল অন্ধকারে। চারিদিকে নেমেছে সর্বনাশা অন্ধকার। পথ চেনা যায় না। এক পাশে রুক্ষ পাহাড়ের কর্কশ প্রাচীর—অন্য পাশে গভীর খাদ।

মেঘের পর মেঘ জমেছে নীল আকাশে। সব কিছুই যেন কালোর প্রচ্ছদপটে মিশে গেছে। চারিদিকে যেন অমানিশার ভয়ঙ্কর অন্ধকার। রুদ্র কাল ভৈরব যেন নৃত্য পাগল হয়ে উঠেছে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি। যেন সুতোকাটা ঘুড়ির মত। বানের জলে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মত। অন্ধকারে পথ আবছা হয়ে আসছে। ঝড়ের বেগ কেবল বেড়েই চলেছে। এক পা এগিয়ে যাই তো পাঁচ পা পিছিয়ে আসি। সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে। গতিও মন্থর হয়ে এলো।

দীর্ঘ চীরগাছের ডালগুলো হাওয়া তুলছে একবার এদিক একবার ওদিক। যেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে সবকিছু। সনসন হাওয়ার বেগ। চলেছি যেন এক অজানা ইংগিতের মোহে। পথ বুঝি আর কখনই শেষ হবে না। কি দারুণ ঠাণ্ডা!

আকাশের কালো মেঘ দেখে সকলেই চিন্তাকুল। আবছা হয়ে গেছে নদীর স্রোতরেখা। কুয়াশার কুহেলিকায় প্রকৃতির অঙ্গে যেন আছোদ মায়া জাল বিছিয়েছে। আশেপাশে কোথাও গ্রামের চিহ্ন নেই, নেই কোন লোকবসতি। অন্ধকার আর অন্ধকার। ঘর ছাড়া পাখীর দল যেন ফিরে গেছে আপন আপন কুলায়।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। তীরের ফলার মত ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি সুঁচের মত গায়ে বেঁধে। তাড়াতাড়ি বর্ষাতি বের করে গায়ে পড়ি। জগৎরাম হুঁশিয়ার করে। পিচ্ছিল পথ। সাবধানে চলি।

হঠাৎ বরফানি হাওয়া ছুটে আসে। সারা শরীর থরথর করে কাঁপিয়ে তোলে। হিমঝঞ্ঝা—ঝির ঝির! আকাশ থেকে যেন পুষ্পবৃষ্টি হয়। মল্লিকা ফুলেব মত তুষার বিন্দু ঝরতে থাকে। সারা অঙ্গ তুষারে ঢেকে যায়। মাঝে মাঝে গা নাড়াই। ফুলঝুরির মত তুষার ঝরে। ভারি মজা লাগে। কিন্তু চড়াই যেন আর শেষ হতে চায় না। কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ—কে জানে। কিছুটা কঠিন চড়াই উঠলেই দেখা যায় ঘুমের দেশ। সব কিছুই যেন ঘুমিয়ে নিথর হয়ে আছে। ঘুম পাড়িয়ে যেন জাদুকর পালিয়ে গেছে অন্য কোনখানে।

আর যেন পারি না। ক্ষণিক বসি। কোন কিছুই দেখার উপায় নেই। সবই যেন দৃষ্টির অন্তরালে। আকাশ থেকে যেন

তুলো বর্ষণ শুরু হয়েছে। সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। ধবধবে মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ছোটখাট পাহাড়গুলো। তুষারের প্রলেপে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কালো পাথরগুলোও একে একে মিলিয়ে গেল সাদার কবলে।

প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। বর্ষাতি ভেদ করে যেন হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকতে চায়। হি হি করে কাঁপি। কিন্তু জগৎরামের দিকে তাকালেই যেন আশ্চর্য হয়ে যাই। গায়ে ছেঁড়া জামা। পরনে শতছিন্ন তালি দেওয়া পায়জামা। পায়ে ছেঁড়া একজোড়া কেড্‌স। প্রচণ্ড হিমেল হাওয়া। কিন্তু আশ্চর্য। হিম শীতল কামড় ওদের কাছে তুচ্ছ। ওরা পাহাড়ী। তুষারপাত ওদের বিচলিত করে না। ওরা বিন্দুমাত্র ভীত নয়।

আবার চলতে শুরু করি। তুষারে পায়ের পাতা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলার উপায় নেই। সাদার বুকে আঁক কেটে ধীরে ধীরে চলা। কালো পাথর সাদার প্রলেপে ঢাকা। দৃষ্টি ঝাপসা। রঙিন চশমার ওপর সাদা তুষারের প্রলেপ। বার-বার হাত দিয়ে মুছি। ক্ষণিকেই আবার সাদা হয়ে যায়। পায়ের চাপে নীচের আলগা পাথর নড়ে। যেন সাদার ঘোমটা সরিয়ে সাঁওতালী মেয়ে ফিক করে হেসে মুখ লুকায়। সবে একটু চড়াই উঠেছি হঠাৎ দেখি একটু নীচে অস্পষ্ট ফুরকিয়ার বাংলো। মন যেন হঠাৎ আনন্দ পেয়ে দুলে ওঠে। এ যেন পরশ পাথর পাওয়া। বিশ্রামের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠি। কিন্তু দেহ যে আর চলে না। শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে বাংলোয় (১০৭০০´/৩ মাইল) এসে যখন পৌঁছাই তখন বেলা একটা।

সারা বাংলোখানির অঙ্গে তুষারের পরিধান। যেন হিমতীর্থ হিমালয়ের দেশে সেও সেজেছে হিমানীর চন্দন মেখে।

অঝোরে তুষার ঝরে। আর যেন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। দমকা হাওয়া সারা শরীর কাঁপিয়ে তোলে। জগৎরাম পাশের ঘর থেকে চৌকিদারকে ডেকে আনে। কিন্তু আনলে কি

হবে! দরজা যে খোলে না। প্রচণ্ড তুষার পাতে বরফ জমে দরজার অর্দ্ধেক ঢেকে গেছে। জানলার কাঁচের সার্সী পর্যন্ত উঁচু হয়ে বরফ জমেছে। ধাক্কা দিলেই কি আর দরজা খোলে। ধাক্কার পর ধাক্কা। সে যেন অটল। নড়ে না। সে যেন আমাদের দেখে পরিহাস করে। সজোরে সকলে মিলে মারি ধাক্কা। তাতেও হ'ল না। দুর্যোগের মাঝে দাঁড়িয়ে দরজার এই পরিহাস আর যেন ভাল লাগে না। তাই প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে সকলে মিলে দরজায় মারি লাথি। লাথির পর লাথি। অবশেষে আলিবাবার সেই 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রের মত দরজা হঠাৎ যায় খুলে অমনি ধুপ ধাপ পড়ে যাই। সারা অঙ্গে তুষার মেখে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকি।

জগৎরাম ও চৌকিদার হায়েদ সিং চলে যায় কাঠ আনতে। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আগুন না জ্বালালে আর যেন বাঁচা যাবে না। গরম কফিরও প্রয়োজন। বাংলোর নিকটে জল নেই। দূর থেকে আনতে হবে। হায়েদ সিং বালতি নিয়ে বেরিয়েছে।

কাজল ঘন মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে মনটা যেন কেমন করে ওঠে। বাদল দিনের জল-ছলছল মেঘ যেন মনের ব্যথায় আঘাত করে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। নীরবে ঘরে বসে ঠাণ্ডায় কাঁপি।

গুরু গুরু মাদল বাজে আকাশে। টিনের চালে অবিরাম তুষার ঝরে। রিম ঝিম সুরের আবেশ কানে আসে। যেন এক অব্যক্ত বাণী দূর থেকে ভেসে আসে।

আকাশে আজ মেঘের ঘনঘটা। ঐ শোনা যায় গভীর গর্জন ধ্বনি। উতল ধারায় বাদল নেমেছে। পূব আকাশ থেকে ছাড়া পেয়ে মেঘেরা ছুটেছে উন্মত্ত হরষে। থরথর করে কাঁপে জানলার সার্সী। তুষারের ঝাপটায় দৃষ্টি অস্পষ্ট করে তোলে।

দিন দুপুরে কালো মেঘের আনাগোনা। যেন নিশুতি রাত এসে হানা দিতে চায়। মেঘের পর মেঘ আসে আর যায়। কখনও জমাট বাঁধে। মুষোল ধারে তুষার ঝরে। অনিশ্চয়তায় দুলিয়ে তোলে মন। বসে বসে ভাবি বন্ধুদের কথা। ব্যানার্জিদা, নাড়ু,

পান্নু, সেন, দত্তগুপ্ত—এরা সবাই পিছিয়ে আছে। বেলা প্রায় ছ'টো বাজতে এল ওদের পাত্তা নেই।

জগৎরাম ও হায়েদ সিং কাঠ নিয়ে আসে। ফায়ার প্লেসে আগুন ধরানো হয়। ধোঁয়ায় ভরে যায় সারা ঘরখানি। চোখ জ্বালা করে। তবুও আগুনের পাশে বসে মনে হয় স্বর্গ সুখ। আহা! কি আরাম! লিকলিক করে আগুন ওপরে ওঠে। মনের মাঝে যেন আশার আলো জ্বলে। সারা দেহে যেন কিসের ছোঁয়া লাগে। নিমেষেই যেন সব ব্যথা মুছিয়ে দেয়। সেনরা আসে। কিন্তু ব্যানার্জিদাদের এখনও কোন খবর নেই।

গরম কফি দেহে যেন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করে। মুখে বুলি ফোটায়। আগুনের ধারে বসে গল্প করি।

হঠাৎ তুষার ঝরার মাঝে ক্ষীণ টুংটাং আওয়াজ কানে আসে। সুখেন্দু উঠে দেখে। কান পেতে শোনে। বলে ঐ তো মনে হয় ধরম সিং আসছে। সকলে উদগ্রীব হয়ে থাকি। সে এসে বাইরে থেকে দরজা ধাক্কায়। আবার আটকে গেছে। এদিক থেকে আমরাও সজোরে টানি। দরজা খোলে। সে ভেতরে ঢোকে। মাল নামায়। ঘোড়াটাকে বাইরে ছেড়ে দেয়। তার আর এখন ঘাস খাবার উপায় নেই। সবই বরফে ঢাকা। কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে পান্নু, নাড়ু ও ব্যানার্জিদা এসে পৌছায়। আপাদ মস্তক তাদের ভিজে। পাছে নিজেদের বইতে হয় এই ভেবে ওরা বর্ষাতিগুলো বেডিঙের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। তাই প্রচণ্ড বৃষ্টি ও তুষারপাত সবি ওদের নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। ঘরে ঢুকেই ব্যানার্জিদা চিৎপাত। হাত পা ঠাণ্ডা। নাড়ু ও পান্নুকে আগুনের ধারে বসানো হয়েছে। তাড়াতাড়ি কম্বল বের করে ব্যানার্জিদার গায়ে চাপানো হয়। গরম কফি এনে দিই। সকলে মিলে তার হাত পা ধরে টানাটানি করি। যাতে দেহে রক্ত ঠিক মত চলাচল করে। তেল গরম করে মালিশ করা হয়। ব্যানার্জিদা সুস্থবোধ করলে সকলের মনের হতাশা কাটে।

আগুনের ধারে সকলে বসি। বিরাট কেটলিতে কফি বসানই আছে। চানাচুর, বিস্কুট বের করা হয়। খাওয়া আর গল্প দুই চলে। মাঝে মাঝে গরম কফি ঢেলে খাই। ঠাণ্ডার দেশে ঐ তো আমাদের প্রাণের বন্ধু।

ঘড়িব কাঁটা ঘোরে। বেলা বাড়ে। তবুও যেন তুষারপাত কমে না। সে যেন শ্রাবণের ধারার মত নেমে চলেছে। মেঘের গুরু গর্জন আর সনসন শব্দ শীতার্ত দেহকে আরও যেন কাঁপিয়ে তোলে। অরুণ বিছানা পাতে। কম্বলটা টেনে নিয়ে আগুনের ধারে যবুথবু হয়ে বসি। অন্য কোথাও উঠে গেলে মনে হয় বরফের উপর বসে আছি। এ যেন প্রকৃতির হাতে গড়া হিম শীতল ঘব।

জগৎরামরা বসে মৌজ করে সিগারেট টানে। ধোঁয়ার পর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরে ঘোরে। চোখ জ্বালা করে। অবিরাম জল ঝরে। কিন্তু জানলা খোলার উপায়। একটু ফাঁক করলেই দমকা হাওয়া যেন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ছুটে আসে। ঘরে বসে থাকতে মন যেন আনচান কবে। কোন কিছুই যেন ভাল লাগে না। দীর্ঘ সময় বয়ে যায়। হঠাৎ কানে আসে ঠকঠক শব্দ। জগৎবাম ও হায়েদ সিং উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। দেখি এক বাঙালী ভদ্রলোক সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও আছেন।

গতকাল তাঁরা এখানে এসেছেন। আমাদের পাশের ঘর-খানাতেই ওঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ সকালে ওনারা পিণ্ডারী দেখতে গিয়েছিলেন। সারাদিন' আকাশ মেঘলা থাকায় দীর্ঘ সময় বসে থেকেও ওনারা ভাল ভাবে পিণ্ডারী হিমবাহ দেখতে পারেননি। আর ঐ দীর্ঘ সময় পিণ্ডারী পাদমূলে বসে থাকায় এই দুর্যোগের হাতে তাদের পড়তে হয়। বর্ষাতি জড়িয়ে কোন রকমে স্বামী স্ত্রী দু'জনেই কাঁপতে কাঁপতে বাংলোয় ফিরেছেন।

হায়েদ সিং তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত কাঠ আমাদের ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে ওঁদের ফায়ার প্লেসে দিয়ে আসে। ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বল্প

আলাপ হয়। থাকেন কলকাতার ভবানীপুরে। বিয়ের পর পূজোর ছুটিতে হানিমূন করতে এসেছেন পিণ্ডারীতে।

ভদ্রমহিলার আদব কায়দা ও পোশাক পরিচ্ছদ দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল অবাঙালী। পরে আলাপের পর সে ভুল ভাঙে।

হানিমূনের কথা শুনে সেন যেন একটু তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়ে, ঠেস দিয়ে আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে হানিমূন করার জন্যে মরতে এল এখানে। দুর্গম পথ—তা কি জানা ছিল না?

সেনের কথায় আমার ভীষণ রাগ হয়। ওনাদের সামনে কিছু না বলে পরে সেনকে তার এই স্বভাবের জন্য ধমক দিই।

আমাদের মত হিমালয়ে ঘোরা কয়েকজন লোক আছে যারা অন্যদের উৎসাহ দেবার বদলে ভয় দেখাতেই চায়। তাদের ধারণা হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সাহস একমাত্র তাদেরই আছে—অন্য কারও নেই। তাই তাদের কাছে কোন অঞ্চলের খোঁজ নিতে গেলে উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা বরং উল্টে এমন পথের ভয়াবহতার কথা বলে যাতে সহজে আর কেউ সে পথে পা বাড়াতে ইচ্ছে প্রকাশ না করে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়—এটাই যেন তাদের কাছে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব। তারা ছাড়া আর যেন কেউ সে অঞ্চলে যেতে না পারে। কিন্তু আমি বুঝি না কেন তারা এরকম মনোভাব পোষণ করেন। কারণ হিমালয় সকলের জন্য। হিমালয় উদার—মহান। হিমালয়ের ধ্যান ধারণা, ঘোরা দেখা—সবই ভাগ্যের কথা। কিন্তু হিমালয় প্রেমিক হিমালয়ের পথে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা ও যে শিক্ষা লাভ করে—সে শিক্ষা দিয়ে যদি অপরকে অনুপ্রাণিত না করতে পারে তবে তার সেই শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার কি দাম আছে? হিমালয়ের পথের ভয়াবহতা ও কষ্ট আছে ঠিকই। কিন্তু সব কষ্টের শেষে যে কেষ্টকে পাওয়া যায়—সে কথাটা ভুললে চলবে কেন? তাই হিমালয় প্রেমিক যত বেশী অপরকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে —সেটাই হবে তার কাছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ভীতি প্রদর্শন বা

অপরে যাতে ঘুরতে না পারে এরকম মনোভাব দেখানো বাহুল্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমার অনুরোধ প্রকৃত হিমালয় প্রেমিক যেন অপরকে আরও বেশী উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলেন। তাহলেই দেশে প্রকৃত পর্বত অভিযানের প্রসার ঘটবে।

এলোমেলো আলাপ আলোচনায় বেশ সময় কেটে যায়। তুষারপাত বন্ধ হয়। জগৎরাম ও হায়েদ সিং ডাকে। কম্বল ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি।

আচম্বিত শোভায় নয়ন যেন স্তম্ভিত হয়। আহা! একি দেখি! এতো স্বপ্নরাজ্য! মনে হয় যেন কোন নতুন দেশে এলাম। কি প্রচণ্ড শীত! আশেপাশে কোথাও যেন জীবনের ইঙ্গিত নেই। হিমের দেশে হিমবন্ত হিমালয় যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাজল কালো মেঘ কখন যেন আকাশ থেকে পালিয়ে গেছে কোন দূর-দেশে কেউ তার খোঁজ জানে না।

উপরে চেয়ে দেখি রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে। যেন সুনীল আকাশ থেকে গলিত গৈরিক স্বর্ণপ্রবাহ গড়িয়ে পড়ে দেবাদি দেবের দেহে। আহা! যেদিকে তাকাই সে দিকেই দেখি শুভ্রের সমাবেশ। আশেপাশের কালো পাহাড়গুলো যেন শুচি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে দাঁড়িয়ে আছে দেবতার পাদমূলে পূজা অর্ঘ নিবেদন করার জন্য। সাদা আর সাদা। ধবধবে চতুর্দিক।

চেয়ে চেয়ে দেখি বাংলোখানিকে। পাতলা সোনালী রোদ ঝরছে তার চালে। তুষার গলতে শুরু করেছে। টুপটাপ টুপটাপ সঙ্গীতের সুর তুলে অবিরাম জল ঝরতে থাকে। যেন কে নওবত-খানায় বসে জলতরঙ্গের সুর বাজায়। অপূর্ব লাগে।

বিশাল পাহাড়ের আবেষ্টনির মাঝে ফুরকিয়ার বাংলোখানি। যেন মায়ের কোলে মাথা লুকিয়ে থাকা সুন্দরী ছোট্ট মেয়েটি। জুলজুল চোখে চেয়ে চেয়ে এদিক ওদিক দেখে।

প্রকৃতির এই গহন কন্দরে স্বর্গীয় শোভার মাঝে অবস্থিত সুন্দর এই বাংলোখানি পথিক চিত্তকে ভরিয়ে তোলে। এখানে এসে

মনের আশা মেটে। পথের ক্লান্তি, দেহের গ্লানি—সবই যায় মুছে। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায় দেবতাত্মা হিমালয়ের স্বরূপখানি। পার্থিব ধন যশ মান সবই যেন এখানে তুচ্ছ বলে মনে হয়।

বাংলোখানি খুব একটা সাজানো গোছানো নয়। দু'টো ঘর। কাঁচের সার্সী দেওয়া জানলা। সামনে সরু এক ফালি বারান্দা। আর সেই বারান্দায় বসে দেখা যায় রমণীয়া প্রকৃতির নয়নভোলান রূপের ছবি। বাংলোর এক পাশে একটু উঁচুতে চৌকিদারের থাকার ঘর ও রান্নাঘর। জলের এখানে কষ্ট। কারণ বাংলোর একটু দূরে বহু নীচ দিয়ে বয়ে যায় পিণ্ডারী। কাছে পিঠে গাছপালাও কম। তাই কাঠও আনতে হয় একটু দূর থেকে।

একটু একটু করে সোনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে সুনীল আকাশে। শুভ্রতার ঝলমলে আলোয় ভরে গেছে সারাটা পাহাড়-তলি। যেন লক্ষ লক্ষ মাণিক জ্বলেছে গিরিগাত্রে। এ যেন শিস মহলে দাঁড়িয়ে দেখা আলোর মেলা।

দেখতে দেখতে দিক্‌চক্রবালে ঝলমল করে উঠেছে পাঁওয়ালী দোয়ার (২২৫১০´) নন্দাখাত (২১৬৯০´) ছাঙ্গুছে (২০৮৬২´) ও নন্দাকোট (২২৫১০´)। যেন দেবাদিদেবের ধ্যান ভেঙেছে। রূপোলী মুকুট পরে মধুর হাসি হেসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন গিরিরাজ যেন তাঁর অমৃত বাণী শোনাতে। স্নিগ্ধ কোমল ঢুলুঢুলু আঁখি দু'টো মেলে কেমন যেন তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। জ্যোতিচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সারাটা নীল আকাশ।

ঐ দেখা যায় উন্নত মহান অভ্রভেদী চিরতুষারাবৃত শিখরমালা। যেন নীল আকাশের নীচে স্ফটিক স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঐ দেখা যায় নন্দাখাত ও ছাঙ্গুছের মাঝের ঢালটুকু। ঐখান থেকেই তো নেমেছে পিণ্ডারী হিমবাহ। ঐ খানেই তো পিণ্ডারীর জন্ম।

বিস্ময়ভরা চোখ দু'টো মেলে চেয়ে থাকি অসীমের দিকে। পিণ্ডারী ডাকে। হাতছানি দিয়ে। ডাকেন গিরিরাজ যেন দু'বাহু বিস্তার করে। মন যেন চোখের খাঁচার দুয়ার খুলে আগে থেকেই

উড়ে যেতে যায় ঐ সুদূরের পানে।

আকাশের কোণ থেকে সাদা সাদা মেঘেরা কেমন উড়ে উড়ে যায়। যেন মরাল চলে মরালীর পিছু পিছু। কখনও কখনও থমকে দাঁড়ায় গিরিরাজের সম্মুখে। কি যেন ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে। আবার দেখি ফুড়ুত করে পালিয়ে যায় কোন অজানা দেশে। কখনও দেখি ছোট ছোট মেঘ আসে শিখর দেশের আশপাশ থেকে। আবদার করে গা এলিয়ে লুটিয়ে পড়ে গিরিরাজের কোলে। দেবাদিদেব যেন আবেগ ভরে তাদের স্নেহ চুম্বন করেন। স্বর্ণকান্তি জ্যোতিচ্ছটা ম্লান হয়। তবুও মনে জাগায় বিস্ময়। চোখের সামনে দেখি যেন দেবাদিদেবের কোলে দোলে দেবশিশুগণ। আহা! কি মধুর মিলন। কি আনন্দের প্রকাশ! কি বিরাট নিস্তব্ধতা! কি বিপুল সৌন্দর্য!

এ মহান দৃশ্যের মাঝে নিজেকে যেন বারবার হারিয়ে ফেলি। মনে হয় আমি কতটুকু। মনের আঙিনাখানি শুধু ধূ ধূ করে। শূন্যতায় ঘিরে রাখে। সব কিছুই যেন আজ ভাল লাগে। মধুর বলে মনে হয়।

দেখতে দেখতে সায়ন্তন বিদায় রশ্মি শেষবারের মত উঁকি দিয়ে তুষার শৃঙ্গরাজির আড়ালে মুখ লুকায়। লালে লালে হয়ে ওঠে পশ্চিম দিগন্ত। তাতে কত রঙের ছোঁয়াছুঁয়ি। এই লাল, এই নীল। নিমেষে কে যেন এসে বেগুনে রঙ ছড়িয়ে দিল। সাত রঙা রঙে রঞ্জিত হ'ল নীল আকাশখানি। সিঁদুরে রঙ নেমে এল হিমানী শিখরে শিখরে। নিশ্চল রূপোলী স্রোতের ঢেউয়ের উপর এল যেন রূপের জোয়ার। তুষারাচ্ছন্ন ধবল শিখরে শিখরে কে যেন এসে সন্ধ্যালগ্নে পরিয়ে দিল স্বর্ণকিরীট। এ যেন প্রকৃতিরাণী এসেছেন পূজার থালায় অর্ঘ সাজিয়ে—রাজ অভিষেকে। বরণ-ডালায় সাজিয়ে এনেছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপচার।

এ শুভক্ষণে, এ পরম লগ্নে নিজেকে যেন নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। একি দেখি! এতো সৌন্দর্য নয়—এ যে

লোকোত্তর দ্যোতনা। এ দৃশ্য স্মৃতির সাথে মানসপটে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি দেবতাত্মা হিমালয়কে। দেখি কুমকুম রঙে রাঙানো সূর্যদেবকে। পশ্চিম আকাশে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় রঙিন মশাল জ্বেলে আস্তে আস্তে কেমন ডুবে যাচ্ছেন। অলস বেলাটি যেন বিদায়ের মন্থর সুরে মূর্ছিত হয়ে আছে। আজ কোন কাজ নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। শুধু চেয়ে স্বপ্ন দেখা।

লাল দিগন্ত থেকে অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। কেমন যেন একটা উদাস মায়া, উদাস ছায়ায় ভরে গেছে সারাটা আকাশ জুড়ে। সন্ধ্যা নেমে আসে। মন যেন আনচান করে ওঠে।

হঠাৎ জগৎরামের ডাকে চমকে উঠি। ফিরে তাকাই। সে বলে বাবুজি একবার রান্নাঘরে আসুন।

ওর সঙ্গে যাই। কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। চোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরে। আজ খাবার বলতে একমাত্র খিচুড়িই রান্না হবে। বেলা তিনটের সময় খিচুড়ি বসানো হয়েছে, বিকেল পাঁচটা বেজে গেল, হু হু করে কাঠ পুড়ে গেল তবুও ডাল চাল আলু পেঁয়াজ সিদ্ধ হ'ল না। এই উচ্চতা তার ওপর যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা— তাতে জলই ঠিক মত গরম হতে চায় না খিচুড়ি সিদ্ধ হওয়াতো দূরের কথা। শুধু হলুদ গোলা গরম জলে ডাল মেশানো ঐ পদার্থটি দিয়েই নৈশ ভোজ হবে। সুধেন্দু আজ ক্লান্ত। ওর আজ আর ইচ্ছে করছে না আলু পেঁয়াজ ভাজতে। তাই জগৎরামকে বলি খিচুড়ি উঠিয়ে নিয়ে এসে ফায়ার প্লেসের ধারে রাখতে। কারণ গরম না থাকলে একেবারেই খাওয়া যাবে না। সুধেন্দু তবুও ক্ষণিক চেষ্টা করে খিচুড়ির হৃদয় গলাতে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথায় যায়। একমাত্র প্রেসার কুকার থাকলে সিদ্ধ হতে পারতো।

রান্নাঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকি। হায়েদ সিং কফি তৈরী করেছে। সেনসাহেব আজ দিলদরিয়া। বিস্কুট চানাচুর বের করে সকলকেই ডাক দেয় নাস্তা করতে। ফায়ার প্লেসের ধারে বসে

আরামে কফি খাই। দেহ মনে যেন সাড় ফেরে। বসে সকলে গল্প করে। আমার আর ঘরে মন টেকে না। কম্বলখানি গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।

রূপসী চাঁদ উঠেছে জোছনার চন্দন মেখে। আকাশ ললাটে ছড়িয়ে দিয়েছে স্নিগ্ধ মধুর কিরণ। চন্দ্রের চন্দ্রিকা উছলে পড়েছে নন্দাখাতের শীর্ষে। গিরিরাজের যেন নিদ্রা ভেঙেছে। ঐতো দেখা যায় তাঁর দিব্য জ্যোতি। শান্ত সৌম্য মূর্তি। স্নিগ্ধ চাউনি। মধুর হাসি। ভোলনাথ যেন মনের কথা জানতে পেরে রূপের ভাণ্ডারখানি উন্মোচন করেছেন। চারিদিকে যেন উজ্বল চোখ-ঝলসান আভা। আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে শুভ্র পাহাড়ে পাহাড়ে। যেন মুক্তের ঝাড়লণ্ঠন জ্বলেছে আজ উৎসব আনন্দে। উপরে চেয়ে দেখি অগনিত তারার সারি। যেন সুনীল আকাশের কোলে জ্বলেছে দীপান্বিতার দীপশিখা। চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ মধুর মিলনে রূপসী পরিবেশ আরও মধুময় হয়ে উঠেছে।

ফিকে কুয়াশা নেমেছে প্রকৃতির অঙ্গে তবুও চাঁদের আলো বাধা পায়নি হাসির বাঁধ ভেঙে উঠেছে চাঁদ উর্দ্ধ গগনে। রূপোলী ময়ূখমালায় উদ্ভাসিত হয়েছে ফুরকিয়ার আঙিনাখানি। যেন তার মুখে হাসি ফুটেছে। নিবিড় নিস্তব্ধতায় ঘিরে রেখেছে সারা পরিবেশটি। এ যেন রূপকথার দেশ।

নিস্তব্ধ নিশীথে চারিদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য মেলা। এমন মাধুর্য, এমন কমনীয়তা, এমন পরিপূর্ণ প্রশান্ত পরিবেশ এর আগে যেন কখনও দেখি নি! এ যেন দেবলোক!

আশ্চর্য মৌনতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। সে মৌনতা মুহূর্তেই গ্রাস করেছে আমাদেরকে। ফুরকিয়ার সাথে যেন এক-আত্মা হয়ে গেছি। অপলক নয়নে চেয়ে থাকি পিণ্ডারী হিমবাহের দিকে। বহু দূরে—তবুও যেন মন হয় খুবি কাছে। শ্বেত পাথরের সীমাহীন সৌন্দর্যে ঘেরা। নীল দিগন্তের নীচে যেন পটে আঁকা ছবির মত ফুটে ওঠে। নন্দাখাতের কণ্ঠে দোলে মণিহার। নন্দাকোট

একটু আড়ালে। তবে ছাঙ্গুছ খুব পরিষ্কার দেখা যায়।

আকাশে মেঘ ভাসে। যেন ছোট ছোট তরী বেয়ে চলে অতল নীল সাগরে। কুয়াশা যেন মায়াজাল বোনে। হিমেল হাওয়া কাঁপিয়ে তোলে। যেন ধীরে ধীরে ঘুম নেমে আসে ফুরকিয়ার চোখে। ঘুম নামে পাহাড়ে। ঘুম নামে পাথরে আর কাঁকরে। ঢুলুঢুলু আঁখি মেলে চায় চাঁদ। মিটিমিটি দেখে তারকা শিশু। যেন স্বপ্নলোকের নিমন্ত্রণ জানিয়ে সকলে ফিরে যায় ঘুমের দেশে। আমিও আলেস্যের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গুটিগুটি ঘরে ঢুকি।

সবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। মনে হয় গভীর রাত এসে হানা দিয়েছে আমাদের গৃহকোণে। নিঝুম পরিবেশ। এমন কি কারও মুখে কোন কথাও নেই। সবলেই ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে ঐ ফায়ার প্লেসের কাছে পড়ে আছে। জগৎরাম খাবার দেয়। বিছানায় বসে খাই। ব্যানার্জিদা ভীষণ ক্লান্ত। সে তো শুয়ে শুয়ে খায়। রাতের খাওয়া সেরে সকলে শুয়ে পড়ি।

জগৎরাম ফায়ার প্লেসে আরও কিছু কাঠ গুঁজে দেয়। বেশ গনগনে লাল আগুনে ঘর গরম হয়।

শুয়ে শুয়ে যেন স্বপ্নদেখি। মন এক অব্যক্ত আনন্দে অধীর। সে যেন বিপুল আগ্রহে পথের দিকেই চেয়ে থাকতে চায়। কখন আসবে সেই শুভক্ষণ। দুর্গম পথ পরিক্রমার শেষে কখন মিলবে সেই তিতিক্ষার যোগ্য পুরস্কার। কখন যাব সেই পিণ্ডারীর পদতলে। কখন দেখা দেবে নতুন সূর্যের আলোকরশ্মি। মনপ্রাণ যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছে সেই পরমলগ্নের আবির্ভাব কামনায়।

ঘুম আর আসে না। জানলার দিকে চেয়ে থাকি। কত কথা, কত আনন্দের সুর বুকের বীণায় বাজে। ঢুলুঢুলু আঁখি মেলে চাঁদ যেন চেয়ে চেয়ে দেখে। জানলার কোণ দিয়ে ঘরে ঢুকে সে যেন আমায় চুপিচুপি ডাকে। মেঘেরা চলে যেন মনের কথা নিয়ে ঐ দূরের আকাশ পানে।

ঘরছাড়া বাউল মন যেন ছটফট করে। এখুনি সে বেরিয়েই

পথ চলতে চায়। কিন্তু চরণদ্বয় যে ক্লান্ত। চোখ যে ঘুমের আবেশে ভরা। অবুঝ মন—সে কি আর বোঝে। বারবার যেন গুমরে ওঠে। শুয়ে এপাশ ওপাশ করি। ক্রমে চাইবার শক্তিও যেন হারিয়ে যায়। জড়িয়ে আসে চোখের পাতা দু'টো ক্লান্তিতে। পরিশ্রান্ত অবসন্ন মনও অবশ হয়ে আসে। অবশ হয় দেহের সকল প্রত্যঙ্গ। ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ১০ ॥

রাতের অন্ধকার তখনও কাটেনি। কুয়াশায় সর্বদিক সমাচ্ছন্ন। জগৎরাম ডেকে গরম কফি দেয়। কম্বলের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে নিই। হিমালয়ের পথের পরম বন্ধু গরম কফি নিমেষেই আড়ষ্ট দেহের জড়তা কাটায়। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। সূর্য ওঠার আগেই বেরতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি দারুণ শীত উপেক্ষা করেও বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মালপত্র সবই এখন রইল পড়ে। জগৎরাম সেগুলো বেঁধেছেঁদে নিয়ে রওনা হবে খাতির দিকে। পিণ্ডারী দেখে ফিরে আমরা রুকস্যাকগুলো নিয়ে ঐ পথ ধরবো।

কুয়াশায় চারিদিক যেন অবলুপ্ত। পাহাড়গুলো বরফের আস্তরণে নিথর নিশ্চল। সূর্যদেব যেন এখনও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছেন। মেঘের পর মেঘ জমেছে পূব আকাশে। কুহেলী-প্রচ্ছন্ন দিগন্ত যেন ভয় দেখায়। পথের ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে আছে। কালো মাটিও সাদা। তবুও যেন দুর্বার আকাঙ্ক্ষা মনের মাঝে উদ্দাম হয়ে ওঠে। অচেনাকে চেনার আর অজানাকে জানবার আশায় মন যেন সকল বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে চায়। অনিশ্চিতের মাঝে সে যেন আশার আলো দেখে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই।

সকাল তখন সাতটা। পূব দিগন্তে ভোরের আলোর ফিকে আভাস দেখা দেয়। মনের মাঝে খুশীর আমেজ আনে। প্রসন্ন চিত্তে পূর্ণ উদ্যমে পথ চলা শুরু করি।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলা। পায়ের আঘাতে পাথরগুলো নড়ে ওঠে। কখনও ঝুরঝুর করে মাটি খসে। অতি সন্তর্পনে ধীরে

ধীরে চড়াই পথে উঠতে থাকি। মনে আজ ভয় নেই। শুধু এক চিন্তা, এক অনুধ্যান কখন শেষ হবে এই পথ চলা। কখন পৌছাব পিণ্ডারীর পাদমূলে।

ভোরের আলো জাগছে আকাশে। অন্ধকার কেটে যায়। মেঘের দল কোথায় যেন উড়ে পালিয়ে গেছে। পাগলা বাতাস যেন শোনায় মুক্তির গান, জানায় ছুটির নিমন্ত্রণ। মনের রুদ্ধ দুয়ারে যেন আনন্দস্রোত বারবার এসে আছড়ে পড়ে। দেহ মন দুলে ওঠে। নির্ভীক আনন্দে এগিয়ে চলি।

অক্সিজেন কম থাকায় নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হয়। চলার গতিও ধীর হয়ে আসে। তবুও যেন ভাল লাগে।

আজকের পথ দুর্গম কিন্তু আনন্দদায়ক। দুস্তর কিন্তু আবেগ মধুর। অতি ধীর পদক্ষেপে উঠছি তো উঠছি। উপর থেকে আরও উপরে। যতই পথ এগিয়ে যায়, পাহাড়ের রুক্ষতা বাড়ে। সবুজের সজীবতা কমে। জীবনের চাঞ্চলতা নেই। চারিদিক নীরব, নিস্পন্দ। ঝর্ণার কলধ্বনি নেই। শুনি না কোন পাখীর গান। নিস্তব্ধতার মাঝে শুধু শোনা যায় নিজেদের পদধ্বনি।

সকালের স্নিগ্ধ বাতাস। শান্ত প্রকৃতির যেন সৌম্য মূর্তি। ধ্যানে মগ্ন হিমাদ্রি হিমালয়। কোথাও কোন সাড়া নেই শব্দ নেই। এ অদ্ভুত নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশের মাঝে আমরা ক'টি পথিক চলেছি মনের উদ্বেল আনন্দে—যেন কোন স্বপ্নেঘেরা দেশের সন্ধানে। চোখের পলকে পলকে আজ রূপের নেশা। বুকের বীণায় আজ যেন শুধু আনন্দের সুর বাজে। পথ চড়াই। তবুও যেন ক্লান্তি নেই। কিছু ভাববার যেন অবকাশ নেই। মন যে তারই আগে প্রবোধ দেয়। এই তো একটু পরেই আর কোন কষ্ট থাকবে না। দুঃখ! সেতো যাবে মুছে। পাবার সেই পরম আনন্দ, দেখার সেই প্রথম মুহূর্ত ভুলিয়ে দেবে যত বেদনা যত পথের কষ্ট। পথ চলি আর ঘুরে ফিরে দেখি বিশ্ব প্রকৃতিতে কত নব নব রূপের পসরা দিয়ে পথিকের মন ভোলান।

হঠাৎ মুখ তুলে চাইতে দেখি দিক্‌চক্রবাল রেখা এক অপূর্ব নীলাভ ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন। আস্তে আস্তে ধোঁয়ার জাল গুটিয়ে নিলেন হিমাদ্রি হিমালয়। দেখা দিল পূবের আকাশে কুমকুম রাঙা রক্তিম বর্ণচ্ছটা। আলো জাগছে আকাশে। আলো জাগছে পৃথিবীর বুকে। আশার আলো এঁকেছে মনে কত শত রঙের আলপনা।

প্রসন্ন প্রভাত রবি উদিত হচ্ছেন পূব আকাশে। যেন সপ্তাশ্বের রথে সমারূঢ়। কপালে কুমকুমের রাঙা টিপ। পরনে স্বর্ণবাস। অঙ্গে কুয়াশার উত্তরীয়। সোনার ধুলি উড়িয়ে রথ এসে থামলো যেন কহিনূর শিখর চূড়ায়। ঝলমল করে উঠছে তুষারাবৃত শৃঙ্গ-মালা। প্রাচীন পৃথিবী যেন আজ নতুন সাজে সেজেছেন। অতিথি সম্ভাষণে যেন উদগ্রীব হয়েছেন।

প্রবুদ্ধ হিমালয় চিরসুন্দর। চিরশাশ্বত তিনি। প্রণাম জানাই সকল চিত্ত উজাড় করে দেবতাত্মা হিমালয়কে—যাঁর পায়ের নীচে দাঁড়িয়ে পথভোলা পথিক ভুলে যায় তার পথক্লান্তি, ভুলে যায় তার ঘরের কথা। যেখানে এসে মুছে যায় যত মনের ময়লা, দেহের গ্লানি। যাঁরই পদতলে দাঁড়িয়ে মানুষ খোঁজে পরশ পাথর।

নবোদিত সূর্যের স্বর্ণরশ্মি এসে পড়েছে চিরতুহিন শিখরে শিখরে। বিশাল—অতি বিশাল। জগৎ জোড়া আসন জুড়ে দেবাদিদেব যেন আজ সমাহিত—ধ্যান গম্ভীর। স্বর্ণ জটাজালে যেন ঐ সোনার হরিণ লুকোচুরি খেলে যায়। সম্মুখে দেখা দিল হিমগিরি—ঐ পাঁওয়ালী দোয়ার, নন্দাখাত, ছাঙ্গুছ, নন্দাকোট। আলোর ঝর্ণা নেমে আসছে আকাশ থেকে। সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। আকাশ মেঘমুক্ত—নির্মল উজ্জ্বল।

মুক্তির উচ্ছ্বাস জেগেছে বাতাসে। ভুবন জুড়ে শুধুই যেন সেই সুরের প্রতিধ্বনি আজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। জানিনা পথের ঠিকানা, জানিনা মনের হদিস। চাওয়ার আগেই যেন মিলে যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই যেন বিস্ময় লাগে। এ যেন চলেছি রূপতীর্থের পথে। দেহে যেন নতুন বল। প্রতিতন্ত্রী যেন জেগে উঠেছে। বন্ধুদের সাথে সাথে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যাই। ক্রমে মার্তোলী-বুগিয়ালে (১১৫০০´/২ মাইল) এসে পৌঁছাই।

এখন অক্টোবর মাস। মার্তোলী বুগিয়ালে কোন ভেড়া ছাগল চরে না। দেখিনা কোন বকরিওয়ালাকে। ময়দান আজ পরিত্যক্ত। শীতের সমাবেশে সবুজ ঘাসেরও এখন করুণ দীপ্তি। পাথর সাজানো অস্থায়ী ঘরগুলো কেমন শূন্য হয়ে পড়ে আছে। আশে পাশের গুহাগুলোও ফাঁকা।

এই মার্তোলী বুগিয়ালের ডান দিকে একটু দূরে রয়েছে এক সাধুর গুহা। তবে সাধু নেই। সেই গুহা ছাড়িয়ে ১ মাইলের মত পথ এগিয়ে গিয়ে পিণ্ডারী নদী অতিক্রম করে, নদীকে ডান দিকে রেখে তার তীর ধরে এগিয়ে গেলে নন্দাখাতের দক্ষিণে অবস্থিত বুড়িয়াকা হিমবাহ পৌঁছান যায়। তবে পথটি বেশ দুর্গম। পিণ্ডারী নদী অতিক্রম করে খাড়া পাথরের দেওয়াল বেয়ে উঠলে দেখা যায় বকরিওয়ালাদের পায়ে চলা পথরেখা। সে স্থানের উচ্চতা ১৬৫০০´। মার্তোলী থেকে ৫ মাইল। সেখান থেকে আরও ৫০০´ ওঠা খুব কঠিন নয়। তার পর যেতে হলে কিছু সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। (Himavanta, Feb 1972).

আর পিণ্ডারী নদীকে বাঁ দিকে রেখে ডান দিকের পথ ধরে আমরা যাব পিণ্ডারীর পদপ্রান্তে। মন যে আজ আনন্দে উৎফুল্ল। চোখে আজ শুধু দেখার পিপাসা। সে পিপাসা যেন মিটবার নয়। তাইতো বারবার আঁখি যেন চায় থমকে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠে পান করতে হিমালয়ের সুধা।

নীলিমার মুখে সোনা সোনা হাসি। শুভ্র বরণ গিরিরাজের জ্যোতিচ্ছটায় উদ্ভাসিত চতুর্দিক। শান্ত নীরব পরিবেশের মাঝে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। ক্ষণিক দাঁড়াই। দু'চোখ ভরে দেখি স্নেহময়ী প্রকৃতিকে। ছবির পর ছবি তুলি। ক্যামেরার

যেন বিশ্রাম নেই। তবুও যেন আশ মেটে না। প্রতি মুহূর্তেই যেন ছবি তুলতে ইচ্ছে করে। হঠাৎ ফিল্ম ফুরিয়ে যায়। মন যেন আঁকুপাঁকু করে ওঠে। একি সর্বনাশ! স্বর্গরাজ্যের ছবি কি আর নিতে পারবো না! দেখাতে পারবো না সেই রূপের ছবি অপরকে। নন্দাদেবী কি তাহলে বিরূপা হলেন। সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি কি মনের ক্যামেরা ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর রূপের ছবি আঁকতে দেবেন না। পারি না ভাবতে। দুঃখে কষ্টে যেন বুক ফেটে যায়। চোখ দিয়ে নামে অশ্রুধারা। সইতে পারি না যেন এ যাতনা। নিজের ভাগ্যকে নিজেই দোষারোপ করি। নিমেষে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ি। পথের মাঝে মাথায় হাত দিয়ে ক্ষণিক বসি।

গিরিরাজ যেন মনের কথা বোঝেন। অলক্ষ্যে হৃদয়ে প্রবেশ করে দেহে নতুন শক্তি এনে দেন। উঠে দৌড়াই ফুরকিয়ার বাংলো থেকে ফিল্ম আনতে। বন্ধুরা এগিয়ে যায়।

ছবি আমায় তুলতেই হবে। সেই উদ্দীপনা নিয়ে উন্মত্ত ঘোড়ার মত ছুটে চলি ফুরকিয়ার বাংলোর দিকে।

ফিল্ম নিয়ে আবার আশায় বুক বেঁধে চড়াই পথে উঠতে থাকি। চড়াই আর চড়াই। শরীরেব শক্তি যেন নিঃশেষ। তবুও পদযুগল যেন মানতে চায় না। চলেছি তো চলেছি। একা। নিঃসঙ্গ। মনটা যেন টিপটিপ কবে। জোরে পা চালাই সঙ্গীদের ধরার জন্য। কিন্তু সে কি আর হয়। ওরাতো এগিয়ে চলেছে। এলোমেলো নানা চিন্তা মাথায় যেন জট বাঁধে। তারি মাঝে হঠাৎ মনে পড়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এক অমৃত বাণী।

'একা চলার আনন্দ অনেক। একাতো নয়—নিজেকে হারিয়ে ফেলা, আবার নিজের মন মুকুরে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখা। এ যেন—একান্ত অন্তরঙ্গের সঙ্গে এক অভিনব লুকোচুরি-খেলা।' (হিমালয়ের পথে পথে)।

আবার অফুরন্ত আনন্দে বিভোর হয়ে পথ চলি। ক্রমে ব্যানার্জিদা, নাড়ু ও পানুকে দেখতে পাই। অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে

চলেছে ওরা। ওদের কাছে আসতেই ব্যানার্জিদা যেন চমকে ওঠে। বিস্ময়ে বলে আপনি ফুরকিয়া থেকে ফিরে এলেন! পা দু'খানে যে একেবারে ঘোড়ার মত তৈরী করেছেন। এই গেলেন আর এই ফিরে এলেন। ব্যানার্জিদার কথা শুনে আমি হাসি। উত্তর দেবার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি নেই। কারণ এতো প্রচণ্ড বেগে হেঁটে এসেছি যে বলার ক্ষমতাটুকুও নেই। মুখ দিয়ে খালি শ্বাস টানি। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার ওদের ছেড়ে এগিয়ে চলি।

শরতের আকাশে দলছাড়া মেঘেরা আপন আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। কখনও তাদের জটাজালে সূর্যদেব লুকিয়ে পড়েন। ছায়া নামে। কখনও দেখি মেঘের আঁচলে আঁচলে সোনালী রঙের রেখা। কখনও নীল আকাশ। কখনও মেঘলা মেঘের ছায়া মাখা।

চোখের পাতায় পাতায় যেন আনন্দের ঝিলিক দেয়। ভারি ভাল লাগে মেঘের দুষ্টুমি দেখতে। মন যেন আজ মেতেছে তাদেরই ঝাঁকে। খাঁচার পাখী আজ ছাড়া পেয়েছে। হিমালয় ভ্রমণের অনাবিল আনন্দে বন্দী বিহঙ্গের ডানায় আজ যেন নতুন শক্তি এনেছে। তাইতো দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলি।

পথ চলে এঁকেবেঁকে। পথের বাঁদিকে একটু দূরে খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় শীর্ণা পিণ্ডারী। তার মৃদু কলধ্বনির অস্ফুট ছন্দ কানে আসে। কিন্তু চোখে দেখি না। সে যেন আমাব সাথে লুকোচুরি খেলে। আড়ালে থেকে যেন হাততালি দিয়ে ডেকে ডেকে পালিয়ে যায় কোন গহনে। দেখার আশায় মন যেন উতলা হয়ে ওঠে। পথ ঘোরে। হঠাৎ কানে আসে রিমঝিম শব্দ। চেয়ে দেখি এক পাহাড়ী ঝোরা পথের মাঝ দিয়ে বিক্ষিপ্ত পাথরের ওপর সাদা জলের পাল তুলে চলেছে আপন আনন্দে। যেন চলেছে সে দেবতনয়া পিণ্ডারীকে জলের অঞ্জলি দিতে।

পথের ধারে ক্ষণিক বসি। আকণ্ঠে পান করি ঝর্ণার সুশীতল জল। দেহ মন সজীব হয়। অতি সন্তর্পনে পার হয়ে আসি। শুরু হয় প্রস্তরময় গ্রাবরেখা। পাথর আর পাথর।

পথ যেন ডাকে। আলেয়ার মত ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে সে আমাকে দূর থেকে দূরান্তরে। কত লীলাই না সে জানে। রুক্ষ পাথুরে পথ। শ্যামলতার চিহ্ন নেই। তবু যেদিকে তাকাই সে দিকেই দেখি সৌন্দর্যের মেলা বসেছে।

আজকের সকাল বড়ই মনোরম। তরুণ তপনের কনক কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছেন গিরিরাজ। যেন নিজ মণিকোঠার দ্বার সগর্বে উন্মোচন করে স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসেন গিরিরাজ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখেন পথিকদের আগমন। হাসে নীল আকাশ সোনালী সূর্যকিরণ স্পর্শে। মনপ্রাণ যেন এক অব্যক্ত আনন্দ-হিল্লোলে উদ্বেলিত হয়। দেহে যেন নব বল আসে। আঁখি অঞ্জনে নব সৌন্দর্যের নেশা। মনের ময়ূর যেন আজ আনন্দে পেখম মেলেছে। চলার প্রেরণায় দ্রুত এগিয়ে চলি।

ক্রমে অজিতকে কাছে পাই। সেও আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়। বলে দীপকদা তুমি এত তাড়াতাড়ি এলে কি করে! কথা বলতে পারি না। মুখ খোলার আগেই যেন বুকটা হাপড়ের মত খপ্ খপ্ করে। নিঃশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হয়। তবুও যেন চলার বিরাম নেই। দেখারও শেষ নেই। পায়ে পায়ে যেন রোমাঞ্চ ভরা।

ক্ষণিক অজিতের সঙ্গে চলে আবার এগিয়ে যাই। পথ ঘুরে যায় খাদের কিনারার দিকে। গ্রাবরেখা শেষ হয়। চড়াই পথ আসে। দূরে অরুণদের দেখা যায়। ক্রমে ব্যবধান কমে আসে। ওরা আমার খুবই কাছে। চেঁচিয়ে ডাকি। কিন্তু গলার এতই ক্ষীণ আওয়াজ যে পাহাড়েও প্রতিধ্বনিত হয় না। ওদেরও কানে পৌঁছায় না। ওরা পিছু ফিরে তাকায় না—যে ইশারা করে ডাকবো। ওরা চলেছে ধীর গতিতে। খাদের পাড়ের সরু পথ ধরে। বাঁদিকে তাকালে বুক তুরতুর করে কেঁপে ওঠে। আমি চলি যেন চলার আনন্দে। বিশ্রাম নেবার যেন আর অবকাশ নেই। উল্লাসে উল্লোল হয়ে উঠেছি।

ঐতো শ্বেত শুভ্র পাহাড়ের কোল থেকে নেমে আসছে পিণ্ডারী ধীরে ধীরে বিনোদিয়া ভঙ্গে। ঐ খানেই তো পিণ্ডারীর উৎসস্থল। থমকে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন চোখের পাতায় পাতায় আলোর ঝলকানি লাগে। আহা! কি রূপ! নিজেকে যেন নিমেষে হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ তন্ময়তা কাটে। আবার হাঁটতে থাকি।

বাঁদিকে বিশাল খাদ। একটু এদিক ওদিক হলে মৃত্যু অনিবার্য। গা শিউরে ওঠে। ধীরে ধীরে চড়াই পথে উঠি। দূর আর দূর নেই। পায়ে পায়ে দূরত্বের ব্যবধান ক্রমেই কমে এসেছে। একটু পরেই যেন সকল আশা পূর্ণ হবে। পিণ্ডারীর জন্মস্থান দর্শন আকাঙ্ক্ষায় মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঐ বাঁকের আড়ালটুকু পেরিয়ে গেলেই দেখা দেবে কল্পলোকের সেই রূপকথার দেশ।

ঐতো অরুণরা প্রায় পৌঁছে গেছে। এখুনি ওদের পদচিহ্ন পড়বে ঐ শেষ সীমানায়। আমি ওদের থেকে হাত কুড়ি পিছনে। এ ব্যবধান যেন মন মানতে চাইছে না।

দারুণ হিমেল হাওয়া। সর্ব শরীর যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। চোখের পাতা যেন ভারী হয়ে আসে। ছন্দহীন চলার গতি বার বার যেন ক্ষীণ হয়ে আসে। মাতালের মত টলছি এলোমেলো— হারিয়ে ফেলেছি জীবনের সকল উৎসাহ, সকল শক্তি। গরমিল হয়ে গেছে সব কিছু। চলতেই হবে তাই যেন চলেছি। চোখ তুলে সামনে চাইতেই নয়ন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। আহা! একি দেখছি! এত শুভ্র, এত উজ্জ্বল—এইতো সেই দেবতার চরণতল। ঐতো পিণ্ডারী নামছে স্বর্গ থেকে মর্তে। ক্ষুদিতেরে অন্ন দিতে। পিপাসার্তের পিপাসা মেটাতে। জননী বসুন্ধরাকে শস্য শ্যামলা করে তুলতে। সার্থক হয়েছে পদযাত্রা। সার্থক হয়েছে মনস্কামনা। আর তো কিছু চাইবার নেই। এখন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা। পথ যে ফুরিয়ে গেছে। এত আশা এত উদ্দীপনা নিয়ে যে বিরাট পুরুষের চরণ স্পর্শ করার জন্য নিজেকে টেনে এনেছি তিনি তো এখন সামনে। ঐতো ওরা বসছে। আমিও এসে

গেছি শেষপ্রান্তে (১২০০০´/৪ মাইল)।

সকাল তখন পনে ন'টা। আকাশ ভরা আলো। সোনালী রোদের আচমনে সারাটা পরিবেশ যেন উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি। সবার মুখে আজ হাসির ঝলক। চোখের কোণে আনন্দের প্রস্রবণ। হৃদয় বিভোর। এসেছি আজ পিণ্ডারীর পাদমূলে।

ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থেকে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত পাথরের উপর সকলে বসি। সামনে বিশাল খাদ। তারি ওপারে ডানদিকে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণ গিরিরাজ নন্দাকোট ও ছাঙ্গুছ। বাঁদিকে ঝলমল করে পাঁওয়ালী দোয়ার ও নন্দাখাত। মাঝে মাঝে উঁকি দেয় বলজোরি। নন্দাখাত ও ছাঙ্গুছের মাঝখানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে দেখা যায় এক শুভ্ররেখা। ঐ পিণ্ডারী হিমবাহ। দৈর্ঘে প্রায় ত্ব'মাইল। প্রস্থে তিনশো থেকে চারশো ফুট। উচ্চতায় ১৩০০০/১৪০০০ ফুট। পিণ্ডারী হিমবাহের অবস্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলতে গেলে বলা হয় এই হিমবাহ নেমেছে নন্দাখাত ও নন্দাকোটের মাঝ থেকে এবং এই তুই পর্বতের মাঝে অবস্থিত গিরিপথটি, ট্রেলস্ পাস নামে পরিচিত। কিন্তু সঠিক ভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় এই হিমবাহ নেমেছে নন্দাখাত ও ছাঙ্গুছের মাঝ থেকে। অবশ্য ছাঙ্গুছের পূর্বনাম নন্দাকোট শোলডার।

আকাশ ভরা আজ আলোর মেলা। যেন জেগেছে ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণচ্ছটা। শিখর থেকে শিখরে যেন ত্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেন সাত রাজার রত্নরাজি ঝলমল করে উঠেছে।

মুগ্ধ নেত্রে, বিহ্বল প্রাণে তৃষিতের মত চেয়ে থাকি নন্দাকোটের দিকে। স্বর্ণাভ সূর্যকিরণে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন গিরিরাজ। মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছেন এক সৌম্য সন্ন্যাসী। মৌনী মহাদেব। তাঁর তুষার জটাজালে ঝিলিমিলি সোনার কিরণ যেন আনন্দে উপচে উঠছে। আর তাঁরই কোল বেয়ে নামছে এক প্রাণহীন হিমবাহ। যেন অভ্র আবিরে অম্বুলিপ্ত দেবতার শুভ্র দেহ থেকে নেমে আসছে এক ধবল রেখা। পিণ্ডারী হিমবাহ।

সাদার চাদর মুড়ি দিয়ে যেন ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু ঘুমের ঘোরেও শব্দহীন নয়। কণ্ঠে তার কুলুকুলু ধ্বনি। অচলরেখা সচল হয়ে ছুটেছে পিণ্ডারী। স্বর্গ থেকে নেমেছে দেবকন্যা মর্তে। হাসির বাঁধ ভেঙে সুরের লহরি তুলে ছুটেছে পাগলিনী মেয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে। মাতিয়ে তুলেছে প্রকৃতির জলসা ঘর। পথে অজস্র ঝর্ণাধারা দেবতনয়াকে জলের অঞ্জলি দিয়ে প্রাণময়ী করে তুলেছে। ছুটেছে পিণ্ডারী মুক্তির উচ্ছ্বাস নিয়ে। স্তব্ধ পাষাণের হৃদয় বিদীর্ণ করে চলেছে শ্যামল ধরিত্রীর দিকে। পৃথিবীর মানুষের আশা মেটাতে—ক্ষুধার অন্নভাণ্ডার ভরাতে।

দেখেছি পিণ্ডারী দেখেছি তোমার মিলনস্থল—কর্ণপ্রয়াগ। কেমন হেসে খেলে গান গেয়ে দুলে দুলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছো অলকানন্দার বুকে। সার্থক জনম তোমার।

হিমাচ্ছন্ন হিমাদ্রি পর্বতমালার দিকে চেয়ে চেয়ে মন যেন উদাস হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে ডানামেলা পাখীর মত উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঐ রূপসাগরে—ঐ পিণ্ডারী হিমাবাহের বুকে। ঐতো সেই পথের নিশানা। ঐ পথ বুঝি চলে গেছে স্বপ্নলোকের সীমানা পেরিয়ে অমর্ত্যলোকের পানে।

ঐতো ঐ হিমাবাহের পথ ধরে এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী দুর্গম গিরিবর্ত্ম টি অতিক্রম করে ১৮৩০ সালে আলমোড়ার কমিশনার মিঃ ট্রেলস্ গিয়েছিলেন গৌরীগঙ্গা উপত্যকার মিলাম গ্রামে। তিনিই সর্বপ্রথম এই গিরিবর্ত্ম টি অতিক্রম করেন। আর তাঁরই নাম অনুসারে ঐ গিরিবর্ত্মের নাম হয় ট্রেলস গিরিবর্ত্ম (১৭৭০০´)।

আজ এই পিণ্ডারীর পাদপ্রান্তে এসে মনে পড়ে কত অভিযাত্রীর কথা। ভাবি তাদের কি দুর্জয় সাহস। কত কষ্টই না তাদের করতে হয়। মনে পড়ে বাঙালী অভিযাত্রী অনিমা সেনগুপ্তের কথা। ১৯৬৪ সালে হিমালয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক ট্রেলস্ গিরিবর্ত্মের উদ্দেশ্যে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। দু'জন মহিলা সহ ন'জন এই দলে ছিলেন। এই দলের নেতা

ছিলেন শৈলেশ চক্রবর্তী। ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলেন। তাঁরা লওয়ান ও গৌরী গঙ্গার উপকণ্ঠে অবস্থিত মার্তোলী গ্রামের দিক থেকে ঐ গিরিখাত অতিক্রম করে পিণ্ডারী উপত্যকায় নামতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে অভিযান সফল হয়নি। হাতের নাগলে এসেও যেন ফসকে গিয়েছিল। প্রকৃতি বিরূপা হয়েছিলেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁরা প্রচণ্ড তুষারপাত মাথায় নিয়ে নাসপান পট্টি ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত কম বরফাবৃত একটি প্রান্তরে তাঁবু ফেলেন। কিন্তু প্রকৃতি যেন আর শান্ত হয় না। বাধ্য হয়ে তাঁরা ১লা অক্টোবর নেমে আসেন মার্তোলীতে।

২রা অক্টোবর তাঁরা মার্তোলী ছেড়ে লিলামের পথে রওনা হলেন। দুপুরে বুগডিয়ারে ক্ষণিক বিশ্রামের পর আবার যখন তাঁরা এগিয়ে যান সেই সময় পথের মধ্যে হঠাৎ একখানি পাথরের চাঙ গড়িয়ে পড়লো অনিমা সেনগুপ্তের ওপর। লুটিয়ে পড়লেন হিমালয়ের কোলে। দেবাদিদেব যেন তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িতা করলেন।

যত ভাবি এসব কথা ততই যেন বুকের ভেতরটা টিপটিপ করে ওঠে। পরক্ষণেই মনে হয় আমরা তো অভিযাত্রী নই। আমাদের তো সে অভিজ্ঞতা নেই। আমরা চেয়েছি কেবল হিমালয়ের অন্দরে কন্দরে ঘুরতে। হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভা দেখতে। তাই তো এই বিশাল খাদের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি ওদের আর আমাদের প্রার্থক্য কোথায়? প্রকৃতিরাণী যেন নিজে থেকেই এই ব্যবধান করে দিয়েছেন।

ফুরকিয়ার বাংলো ছেড়ে কিছুটা এসে বাঁদিকে পিণ্ডারীর ক্ষীণ গতি পার হয়ে নীচের রাস্তা ধরে ঐ খাদের প্রান্তরে আসা যায়। তাঁবু ফেলারও সুন্দর জায়গা রয়েছে। কিন্তু তারপর! পদযাত্রীদের যাত্রা শেষ। শুরু হয়ে অভিযাত্রীদের খেলা।

হিমেল হাওয়া দোল দিয়ে যায়। আপন মনে একদৃষ্টে চেয়ে

থাকি আলোয় রঞ্জিত সেই দিব্যালোকের দিকে। নিরাভরণ নীল আকাশের নীচে হাসেন যেন গিরিরাজ। আকাশের নীল রঙ যেন গড়িয়ে পড়েছে শ্বেত ফলকের ওপর। সোনালী সূর্যের স্বর্ণ প্রভায় দেবাদিদেবের যেন ধ্যান ভেঙেছে। এ যেন চোখের সামনে দেখি নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রতিচ্ছবি।

মহামৌনী নিশ্চল সমাহিত মহাহিমবন্ত। প্রকৃতি যেন প্রিয়া পার্বতী। লীলায়িত লাস্যে আর যৌবনের দীপ্ত কামনায় হিমালয়ের ধ্যান ভাঙতে এসেছেন। কখনও যোগিনীর বেশে ভালবেসে নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেন ঐ অনাদি অনন্ত হিমালয়ের পায়ের কাছে। ধ্যান ভেঙেছে ভোলানাথের।

যত দেখি ততই যেন দেখার আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়। আঁখি অঞ্জনে যেন স্বপ্নের জাল বোনে। মন যে কি চায়—আর কি না চায় তা সে নিজেই জানে না। চাওয়া আর পাওয়ার যেন শেষ নেই।

চেয়ে চেয়ে দেখি মেঘের খেলা। আলোর সমারোহ। পর্বত গাত্রে পথশ্রান্ত জলভরা মেঘের দল যেন ক্ষণিক বিশ্রাম করে। আবার দেখি উত্তুঙ্গ শিখর শিখর ছুঁয়ে চলে যায় তারা আপন অভীষ্ট পথে। মনও ছুটে যেতে চায় উধাও পাখা মেলে ঐ মেঘ বলাকার দলে। সারি সারি চলেছে যেন রাজহংসীর দল।

পর্বতশীর্ষ থেকে ক্রমাগত কম্পমান ধূম্রপুঞ্জ ওপরে ওঠে। যেন সুনীল আকাশের সাথে সাদার মিতালী চলে। চলে যেন তাদের মন দেয়া নেয়া।

সাদা মেঘ আবার এসে ভিড় জমায়। সূর্যদেব লুকিয়ে পড়েন। অমনি ছায়া নামে পিণ্ডারী হিমবাহে। ছায়া নামে আমাদের মনে। অবুঝ মন বেদনায় ভরে। আকুল আকুতি জানায় সূর্যদেবকে। হে সূর্য তোমার যবনিকা উন্মোচন কর। তোমার সেই তেজোদীপ্ত কল্যাণময় পরম রমণীয় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ কর। দেখতে দাও ঐ ধ্যান সুন্দর প্রশান্ত দেবতাত্মা হিমালয়কে।

ঐতো আলো ফুটেছে। ঐতো রত্ন দীপ নিয়ে আবার এসেছেন

সূর্যদেব। ঐতো দেখা যায় দেবাদিদেবের বিগলিত করুণায় সৃষ্ট পিণ্ডারীকে। সবাই আনন্দে বিভোর। মুখে জয়ের হাসি। পথের আনন্দ আজ এনে দিয়েছে জীবনের স্বাদ। প্রেরণা এনে দিয়েছে সুন্দরকে জানতে আর সত্যকে উপলব্ধি করতে।

চুপ চাপ বসে থাকি। সেন উন্মুখ হয়ে থাকে ব্যানার্জিদাদেব পথ চেয়ে। বেলা অনেক হয়ে গেছে। এখনও তাদেব পাত্তা নেই। এদিকে আকাশের রঙ ক্রমেই বদলাতে থাকে।

হিমালয়ের আবহাওয়া মানুষের মনের মত অস্থির মতি, চঞ্চল। এই আলো, এই ছায়া। এই বোদ, এই মৌসুমী মেঘ। এই হবষ এই বিষাদ।

নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে আসে। যেন নীল সাগরে পাল তুলে চলে নৌকার বাহিনী।

যতদূব দৃষ্টি যায় দেখি শুধু ধবল রেখা। যেন বিশাল তবঙ্গ-সঙ্কুল সাগর কোন জাদুর স্পর্শে নীশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত শুভ্র ঊর্মিমালা—ঐতো রূপসাগর। ঐ সাগরে ডুব দেবার জন্যই তো মন ব্যাকুল। ঐ সাগবতো স্বপ্ন নয়। মায়া নয়। ওতো বিশ্বশিল্পীর নীল দেওয়ালে টাঙানো এক অনন্ত মহান ছবি।

দিগ্‌বলের পানে চেয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। মাথা নীচু করে বসে থাকি। হঠাৎ সুধেন্দু চেঁচিয়ে ওঠে। বলে ঐ তো পানু। আসছে যেন সে টলতে টলতে।

সত্যি ব্যাচারির ভীষণ কষ্ট হয়েছে এখানে আসতে। পায়ে অসংখ্য ফোসকা। যন্ত্রণায় সারাদিন ছটফট করে। কালো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চিউনগামের ধবল ধারা গড়িয়ে কালো দাড়ির জটাজালে আটকে রয়েছে। শ্বাস কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। তবুও সে এসেছে। সৌন্দর্য পিপাসু মন তাকে যেন সে কথা বুঝতে দেয় নি। নেশার ঘোরে সে এসেছে এই সৌন্দর্যমেলায়। প্রাণ ভরেছে। ক্লান্তি মিটেছে। নয়ন তার সার্থক।

বেলা বাড়ে। আকাশ অশান্ত হতে থাকে। অরুণ তাগিদ

দেয় ফেরার জন্য। ব্যানার্জিদারা আর ঐ নশ্বর শরীর নিয়ে আসতে পারবে না এই ভেবে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হই।

কিন্তু ফিরে যেতে কি আর মন চায়। এখনও যেন চোখের পাতায় পাতায় দেখার অদম্য তৃষ্ণা। রূপের অঙ্গন ছেড়ে এখুনি যে চলে যেতে হবে—সে কথা মন যেন বুঝেও বোঝেনা। বারবার যেন বিদ্রোহ করে ওঠে।

জানিনা কেন, কি কারণে শরতের হাল্কা মেঘের মত মনের কোণে এক টুকরো মেঘের ছায়া পড়ে। চেতনার অন্তরীক্ষ যেন ধোঁয়ায় ঘোলাটে হয়ে আসে। অন্তরে যেন অভিমানের সুর বাজে। চোখের কোণ দিয়ে নামে অশ্রুধারা। যেন সে অব্যক্ত আবেগে অনর্গল ঝরে পড়ে। সে যেন কোন আপসই মানে না।

কিন্তু আমি জানি আমাদের প্রাণের আকুল আকুতি চিরকাল এখানকার বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে। আবার কেউ আসবে এ পথে—নতুন নামে ডাকবে পিণ্ডারীকে। দেখবে তার নতুন সাজ। ক্ষণায়ু আমরা, কিন্তু এই নীল আকাশ, এই সোনালী রোদ, এই তুষারধবল হিমবন্ত—এরাতো অবিনশ্বর, অপরাজেয়, অপরাজিত। তাইতো চিরকাল দেবতাত্মা হিমালয়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন কত ঘরছাড়া মানুষের দল। কত সংসার-ত্যাগী, সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী, কত পথ ভোলা পথিক, সত্যানুসন্ধানী, জ্ঞান পিপাসু, এসেছেন কত তীর্থযাত্রী, পুণ্যকামী। হিমালয় একান্তে তাঁদের পরম আশ্রয় দিয়েছেন। হিমালয়কে যাঁরা ভালবাসেন, হিমালয়ও যেন তাঁদের সস্নেহে কাছে টানেন। তাই আজ বিদায় বেলার শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বার বার মনে হয় নদীর ঐ কলতান, পর্বতের ঐ উদাত্ত চাওয়া যেন দেবদাত্মা হিমালয়ের আশীর্বাদ।

শেষবারের মত মুখ তুলে চেয়ে দেখি গিরিরাজকে। চেয়ে দেখি পিণ্ডারীকে। কি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন রূপ।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। যতবারই মুছি ততবারই যেন

কুয়াশার মত অন্ধকার হয়ে যায়। আমার কৃতাঞ্জলি যেন শিথিল হয়ে আসে।

বিদায় পিণ্ডারী। বিদায়।
শেষ বিদায় জানাই তোমায় কবির কথায়।
ম্লান হয়ে এল কণ্ঠ মন্দার মালিকা
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে, পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন

* * *

থাকো, স্বর্গ, হাস্য মুখে করো সুধাপান
দেবগন। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তাব চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পবে
কেহ তাবে ছেড়ে, যায় দুদণ্ডেব তবে।

॥ ১১ ॥

সকাল তখন দশটা।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মেঘেব পর মেঘ ভেসেছে নীল আকাশে। সূর্যদেব ম্লান হয়ে লুকিয়ে পড়েছেন তাদেরই আড়ালে। চিবসমাহিত—চিরসুন্দর গিরিরাজ যেন পদ্মাসনে গভীর ধ্যানে মগ্ন। মোহন মধুর নবরূপ। কুয়াশা যেন চামর দোলায়। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে দিগন্ত। যেন স্বর্গবাজ্যের দেবমন্দির বন্ধ হয়। হিমেল হাওয়া ছুটে আসে। সারা শরীর থরথব করে কাঁপে। স্মৃতির বোঝা কাঁধে নিয়ে স্বর্গ থেকে ফিরে চলি মর্তের পানে।

সার্থক হয়েছে আজ আমাদের প্রাণের অর্ঘ। রাখতে পেরেছি প্রাণের প্রণামীটুকু ঠাকুরের দরজায়। এই তো চেয়েছিলাম। পেয়েছিও। সকল দুঃখ আজ হাসিতে মিশেছে। সব পাওয়া আজ

যেন শেষ হয়েছে। এ যে সবার সেরা—পাওয়ার মত পাওয়া। এইতো জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।

আঁকাবাঁকা সরু উৎরাই পথ সামনে আসে। মনের তন্ময়তা ছুটে যায়। দৃষ্টি সজাগ রেখে ধীরে-ধীরে নামি।

পাথর বিছানো পাহাড়ী পথ যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত দেহ তবুও যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে চলেছি কিসের আনন্দে। মন মেতেছে যেন খেলার নেশায়। প্রকৃতি রাণী যেন খেলনা দিয়ে শিশুমন ভুলিয়ে রেখেছেন।

প্রায় মাইল দেড়েক পথ চলে এসেছি ব্যানার্জিদাদের সঙ্গে দেখা হয়। ওরা এক পাথরের ওপর বসে চিঁড়ে চিবাচ্ছে। ক্ষণিক ওদের পাশে গিয়ে বসি। জিজ্ঞাসা করি ব্যানার্জিদাকে ওপরে যাবার ইচ্ছে আছে নাকি?

অম্লান বদনে ব্যানার্জিদা বলে না ভাই আমার আর ওপরে যাবার ইচ্ছে নাই। এখান থেকেই তো বেশ দেখলাম। এতেই তো আমাব মন ভরে গেছে। কি হবে শেষ সীমান্তে পদক্ষেপ ফেলে! হিমালয়ের পথে যতই এগিয়ে যাব ততই তো আরও দু'কদম এগিয়ে যেতে ইচ্ছে হবে। এ চলারও শেষ নেই। দেখারও শেষ নেই। এ পথে যা পাওয়া যায়—তাইতো পাথেয়।

ব্যানার্জিদাদের সাথে নিয়ে নামতে থাকি। আবার সেই ঝর্ণা কাছে আসে। সাবধান বাণী যেন কানে পৌঁছায়। সকলে দাঁড়াই। ফেনিল জলরাশিব ওপর জেগে থাকা পাথরগুলোর ওপর পা রেখে অতি সন্তর্পণে পার হতে হবে। যাবার সময় অজিত পিছলে পড়ে গিয়েছিল। কোনরকমে পাথর ধরে রক্ষে পায়। পথের বাঁদিকে উত্তুঙ্গ পাহাড়। যেন প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর ডানদিকে একটু দূরে পিণ্ডারীর খাদ। পাহাড়ী খরস্রোতা নির্ঝরিণী ঝুমঝুম শব্দ তুলে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে সেদিকে হাতে হাত ধরে পা টিপেটিপে পার হই। অশান্ত জলরাশি যেন শিশুর মত ছুটে এসে জামা কাপড় ভিজিয়ে দেয়। এও যেন এক

ধরণের খেলা। ফিরে তাকাই। সুন্দরী ঝর্ণা। যেন আধো আধো সুরে কথা বলে। পিছু ডাকে। বলে আয়রে আয়—আমার সাথে খেলবি আয়।

ক্ষণিক দাঁড়িয়ে দেখি চন্দন বর্ণা সুন্দরী ঝর্ণাকে। মনের গহনে সে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। বারবার বলে যেন ওরে যাস্ না ফিরে। আমরা দু'জন মিলে—চলবো দুলে দুলে। ভাসবে মোদের খেয়ার তরী আনন্দের পাল তুলে।

সত্যি হিমালয়ের বুকে জাদু আছে। তাঁর ছোঁয়ায় আছে মোহ। প্রতিটি পাথর, ধূলিকণা, গাছপালা, নদী নির্ঝর—সবাই যেন আপনার করে কাছে টানে। কোথায় মনের দুঃখ, কোথায় পথ ক্লান্তি—নিমেষেই এরা যেন সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। এরাই তো খেলার সাথী। এরাই তো পথের বন্ধু। এখানে এসে কি যে চাই আর কি পাই—তা জানি না। শুধু মনে হয় অনন্তকাল ধরে যদি এদের সাথে মিশে যেতে পারতাম—তাহলে মনে হয় যেন মনের সব আকাঙ্ক্ষা মিটতো।

বেলা হয়ে আসে। আজই খাতি ফিরতে হবে। অরুণ তাগিদ দেয়। দ্রুত নামতে থাকি।

আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। মেঘের পর মেঘ জমেছে নীল আকাশে। কালো মেঘ যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে ছুটে আসছে মাটির দিকে। কুয়া-শায় ঝাপসা হয়ে আসছে চতুর্দিক। শীতের পাগলা হাওয়া ছুটে আসছে যেন হিমের দেশ থেকে। কি হাড়কাঁপানো শীত!

পথ যেন আর ফুরায় না। প্রতি বাঁকেই মনে হয় এই বুঝি ফুরকিয়ার বাংলো দেখা দেবে। জোর কদমে এগিয়ে যাই। এখন তো চড়াই নেই—উৎরাই পথ। তবুও ব্যানার্জিদা, নাড়ু পিছিয়ে রয়েছে। পানু এখন আমাদের সাথে সাথেই চলেছে।

প্রচণ্ড ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। শরীরও ক্লান্ত। কিন্তু বরফানি হাওয়ার তাড়নায় পা দু'খানি যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। চলাই

যেন পরম আনন্দ। শরীর গরম রাখে।

হঠাৎ বাঁক ঘুরেই স্বপন চেঁচিয়ে ওঠে ঐতো বাংলো! মনে আশার আলো জাগে। হুড়হুড় করে নামি। বেলা তখন এগারটা। বৃষ্টি নামে নামে ভাব আমরা বাংলো এসে পোঁছাই।

প্রচণ্ড ক্ষিদে। পেটে যেন ছুঁচোর কীর্তন চলেছে। হায়েদ সিং চায়ের জল গরম করছে। চা হ'লে রুটী খাওয়া যাবে। কিন্তু আর তর সইছে না। কাল রাত্রের কিছু উদ্বৃত্ত খিচুড়ি সেন মগে রেখে দিয়েছিল। ক্ষিদের চোটে সকলেই সেই ঠাণ্ডা খিচুড়ির ওপর চিলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ বাদে হায়েদ চা করে নিয়ে আসে। অরুণ রুটীতে জেলি মাখিয়ে সকলকে দেয়। এখন আর ডিম নেই। সকালেই শেষ হয়ে গেছে। তা হোক। ক্ষিদের মুখে যা পাওয়া যায় তাইতো অমৃত। গরম চায়ের অলৌকিক ক্রিয়া। দেহ মন সতেজ করে। আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই। জগৎরামরা অনেকক্ষণ এগিয়ে গেছে। খালি হায়েদ রয়েছে। ব্যানার্জিদারা এখনও এসে পোঁছায়নি। যে মন্থর গতিতে ওরা হাঁটছে তাতে এখানে আসতে ওদের বেশ দেরী হবে। হায়েদকে রেখে যাই। ও ওদের খাইয়ে এক সঙ্গে খাতিতে ফিরবে। ওখানেই ওর ঘর। যাবার আগে ওকে দু'টো টাকা দিই। সেন একটা সিগারেট দেয়। মুখখানি তার মধুর হাসিতে ভরে ওঠে।

* * *

আকাশের মেঘ কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে। প্রকৃতির মুখে যেন হাসি ফুটেছে। পথ যেন ডেকে ডেকে যায়। মন আবার খুশীতে ডগমগ করে। তিন মাইল্স উৎরাই পথ। পাও চলেছে তড়িৎ গতিতে।

কাঁচা মিঠে রোদ। মিঠে মিঠে বাতাস। সবুজ বনের শ্যামল শোভা। পিণ্ডারীর গান শুনতে শুনতে পথ যেন নিমেষে ফুরিয়ে আসে। এক ঘণ্টার মধ্যেই দোয়েলি পৌঁছে যাই।

বৃদ্ধ চৌকিদার আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। চা খাইয়ে সে আমাদের সাথে রওনা হবে। কাঠ জ্বেলে চায়ের জলও গরম করে রেখেছে। কারণ জগৎরাম ও ধরম সিং আমাদের অনেক আগে পৌঁছে খবর দিয়ে চলে গেছে। হাঁটার পরেই একটু বিশ্রাম। তারওপর সঙ্গে সঙ্গে চা—এযেন পরম সৌভাগ্যের কথা।

মিঠে রোদে বসে আরামে চা খাই। শরীর চাঙ্গা হয়। কিন্তু চরণদ্বয় যে একটু বিশ্রাম পেলে আর একটু বিশ্রাম চায়।

চায়ের পর্ব শেষ হতে না হতেই হঠাৎ দেখি হায়েদ এসে হাজির। ব্যানার্জিদাদের খবর জিজ্ঞাসা করি। সে বলে মোটাবাবু বেশী খেয়েছে আর সেই জন্যই আস্তে আস্তে হাঁটছে। ওর কথা শুনে সকলে উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে। ও হাসে।

ব্যানার্জিদাদের জন্য আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করি। কিন্তু ওদের পাত্তা নেই। সেন .তাগিদ দেয়। বাধ্য হয়ে উঠতেই হয়। খাতিতেই ওদের সঙ্গে দেখা হবে এই আশা নিয়ে আবার চলতে থাকি। হায়েদ কাফনি হিমবাহের পথটা দেখায়। দূরত্ব ৮ মাইল। জগৎরাম ও ধরম সিংকে কাফনি যাবার কথা বলেছিলাম। গভীর জঙ্গলের পথ বলে ওরা যেতে একেবারেই রাজী হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে খাতিতেই নেমে চলি। সৌন্দর্য পিপাসু মন যে বারবার বিদ্রোহ করে। সেতো কোন জায়গা অদেখা রাখতে চায় না। অজানাকে জানবার অদেখাকে দেখবার আশায় পা যে পিছু টানে।

নদীর ওপর কাঠ পেরিয়ে ওপারের চড়াই পথ ধরে গহন বনে প্রবেশ করি। সঙ্গে এখন চৌকিদার ও হায়েদ সিং আছে। নিবিড় বনের পথ হ'লেও এখন যেন আর ভয় করে না। বেশ গল্প করতে করতে পথ চলেছি।

দুপুরের চনমনে রোদ। নীল আকাশের উজ্বল দীপ্তি। যেন নীলকান্তমণি। তবু চলার কষ্ট নেই। স্নিগ্ধ মনোরম ছায়া ঘেরা বনপথ। পথের দু'দিকে বড় বড় গাছের সারি।

পথ ঘুরে আসে। অকস্মাৎ দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। বাঁদিকে

দেখা দেয় পিণ্ডারীর রূপোলী রেখা। কোমল ঘাসে ছাওয়া সমতল ভূমি। ইতস্ততঃ ফুলের শোভা। দূর থেকে মনে হয় কে যেন সযত্নে বিছিয়ে রেখেছে নকশা কাটা বুটিদার শ্যামল গালিচা। পিণ্ডারীর সঙ্গীতে বিভোর হয়ে উঠেছে বনভূমি। পাখীও ডাকছে কোন গহন বনের আড়াল থেকে। কুহু কুহু সুরে। আহা! এ যেন সঙ্গীতের আসর বসেছে। ঐতো জগৎরাম ও ধরম সিং বসে আছে। ওরা যেন প্রাণভরে শুনছে নদীর গান। জলসা ঘরে বসে দেখছে তারা পিণ্ডারীর নৃত্য মধুর দৃশ্য। ঐখানেই তো প্রকৃতির সৌন্দর্যের হাট বসেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। পিঠের বোঝা নামিয়ে সেখানে গিয়ে ঘাসের ওপর মাথা রেখে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ি। সব ক্লেশ, সব শ্রম নিমেষে মিলিয়ে যায়। মনে হয় এইতো আমার ঘর। কতকাল পর যেন আবার ফিরে এসেছি। শুয়েছি সেই কোমল শয্যায়। অন্তর পুলকে ভরে। অলক্ষ্যে কার যেন স্নেহাশিস্ পাই। দু'চোখের পাতায় পাতায় কে যেন এসে কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়। অসময় ঘুম নামে।

কতক্ষণ যে চুপচাপ শুয়েছিলাম সে খেয়াল নেই। হঠাৎ স্বপনের ডাকে তন্দ্রা কাটে। উঠে হাঁটতে থাকি। নদীর উপর পুল পেরিয়ে ওপারের রাস্তা ধরি।

মামুলী পাহাড়ী পথ। চলেছে এঁকেবেঁকে। নৃত্যপরা পিণ্ডারী এখন আমাদের ডান দিকে। সুরের লহরি তুলে, হাসির বাঁধ ভেঙে, পাথর থেকে পাথরে লুটিয়ে পড়ে চলে সে আমাদের পথ দেখিয়ে। গান শুনিয়ে। মন ভরিয়ে।

এখন আর কারও মুখে কথা নেই। সবাই যেন আপন আপন চিন্তায় চঞ্চল। জনমানব শূন্য পথ। নদী যেন একমাত্র সাথী। সূর্যের রেশমী আলো এসে পড়েছে নদীর জলে। ছোঁয়া লেগেছে সবুজ গাছের পাতায় পাতায়। যেন ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরে প্রকৃতি-রাণী এসেছেন আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। রূপোলী জলের রেখা দিয়ে এঁকেছেন যেন বিচিত্র আলপনা। পথের পাশে

বনফুল দোলে। মৃদু বাতাসে গাছের পাতা নড়ে। যেন ছন্দে ছন্দে, গন্ধে গন্ধে আকুল করে মন। সুরের ছোঁয়ায় সবুজ বনানীও যেন আনমনা হয়ে যায়। পথ চলতে কি মধুর না লাগে।

বনপথ আসে। দল বেঁধে এগিয়ে চলি। জগৎরামরা এখন অনেক পিছিয়ে। ব্যানার্জিদা, নাড়ু, পানুদেরও দেখা নেই। ওরা আসছে ধীর পদক্ষেপে। বিশ্রামের আশায় আমরা চলেছি দ্রুত গতিতে। চারিদিকে বড় বড় গাছের সারি। সবুজ পাতায় ঢাকা ছায়া পথ। সব কিছুই দৃষ্টির অন্তরালে। বন হাল্কা হতেই চেয়ে দেখি দূরে কুয়াশার মায়াজাল। মেঘের দল জটলা পাকায় আকাশের আনাচে কানাচে। সবুজ পাহাড়ের মাথা থেকে কুজ্ঝটিকার উত্তরীয় উড়েছে নীল আকাশে।

দেখতে দেখতে আকাশ জুড়ে শুরু হয় মেঘের ঘনঘটা। কালো মিশমিশে ধোঁয়ায় কে যেন আকাশটাকে ঢেকে দিয়ে যাচ্ছে। চারি-দিকে যেন থমথমে ভাব। গুরু গুরু মেঘ ডাকে। যেন মাদল বেজে ওঠে। এক টুকরো নয়, দলে দলে মেঘ আসে উড়ে আকা-শের নাচের আসরে। বিদ্যুতের ঝলকানি শান্ত বনভূমির নীরব-তাকে যেন খান খান করে ভেঙে দেয়।

জোরে হাওয়া বইতে শুরু করে। সারা বনভূমি যেন নেচে ওঠে। গাছগুলো দোলে। এ ওর ঘাড়ে যেন ঢোলে ঢোলে পড়ে। সনসন বাতাস বয়। ঘুর্ণি হাওয়ায় ধুলোর রাশি ওড়ে আকাশে। আমাদের শরীর ধুলোয় ধূসর হয়। চোখ দু'টো ধুলোর আস্তরণে অন্ধকার। প্রলয় নাচনে নিজেকে মাতিয়ে তোলার নির্দেশ দেয় যেন ঐ ঝড়ো হাওয়া।

তীরের মত ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি নামে আকাশ থেকে। গুরু গুরু গর্জায় মেঘ। যেন রুদ্রভৈরব নটরাজের বেশে তাণ্ডব নৃত্যে মেতেছেন। থর থর করে কাঁপছেন যেন ভীতা সিক্তা শঙ্কিতা ধরিত্রী। কাঁপিয়ে তুলেছে আমাদের সারা দেহ। বর্ষাতি জড়িয়ে পথ চলি। চারিদিক অন্ধকার। ক্ষুব্ধ শীতের বাতাস নির্মম ভাবে

যেন চাবুক চালায়। তীরের ফলার মত বৃষ্টির ছাট নাকে মুখে এসে লাগে। দারুণ ঠাণ্ডায় যেন দাঁতে দাঁতে লেগে যাবার উপক্রম। চলার গতিও ধীর হয়ে আসে। শুরু হয় শিউলি ঝরার মত তুষারপাত। ঝিরঝির ঝরে খালি আকাশ থেকে। ঘন অন্ধকার। এক হাত দূরেরও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সাদায় সাদা হয়ে গেছে। ডানদিকে পিণ্ডারীর বিশাল খাদ তাও কুয়াশায় অবলুপ্ত। জলের আওয়াজটুকুও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেছে শ্রুতির অন্তরালে। অবিরাম ঝরেছে তুষার। তুষার আর তুষার! আর তো চলা যায় না। এ যেন নটরাজের জটার বাঁধন খুলে খসে পড়ছে ধুতরোর শ্বেত কুণ্ডল। বর্ষাতি চাপা দিয়ে একটা পাথরের উপর সকলে বসে থাকি।

ঝরঝর ঝরেছে তুষার। পাথরে পাথরে কাঁকরে কাঁকরে সাদার প্রলেপ পড়ে। যেন আকাশ কে শ্বেত চন্দন ছিটায়। সবুজ গাছের পাতায় পাতায় তুষার পড়ে। অপূর্ব দেখায়। যেন স্বর্গ থেকে পরীর দল উড়ে এসে পরিয়ে দিল শ্যামলা মায়ের কণ্ঠে মুক্তের মালা। আবার ক্ষীণ আলোটুকু হারিয়ে গেল। ঘন কুয়াশা এসে যেন যবনিকা ফেলে দিল।

শীতে বসে বসে কাঁপি। মাঝে মাঝে বর্ষাতি ঝাড়া দিই। ফুলঝুরির মত তুষার ঝরে পড়ে। মজা লাগে। ক্ষণিকেই মন আবার অনিশ্চয়তায় দুলে ওঠে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে তুষারপাত বন্ধ হয়। হাওয়ার বেগও কমে। আকাশের গায়ে ক্ষীণ আলো একটু একটু করে ফুটে ওঠে। কালো মেঘ যেন কি ভেবে ছুটে পালায়। কুয়াশার লজ্জা কেটেছে। সেও যেন ঘোমটা সরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরের পাহাড়ের দিকে। তবুও সূর্যদেবকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। নীলিমার মুখখানি এখনও ম্লান। হাসি ফোটেনি। দিক্‌চক্রবালে কেমন যেন কাঁচা হলুদে রঙে রঞ্জিত আলোর রোশনাই।

অনিশ্চিত মনের গহনে কে যেন প্রদীপের আলো দেখায়।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ওরই মধ্যে হাঁটতে থাকি। একটু একটু করে খাতির বাংলো এগিয়ে আসে। পরিশ্রান্ত দেহখানি যেন বিশ্রামের আশায় মাতে। পাও যেন মদত দেয়।

হঠাৎ দেখি মেঘের অবগুণ্ঠন তুলে সূর্যদেব হেসেছেন। হেসেছে নীলিমা। যেন আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে। হাল্কা সোনালী কিরণ এসে পড়েছে পথে প্রান্তরে। নদীর জলেও দোলা লেগেছে। চলছে পিণ্ডারী মহাআনন্দে হেসে খেলে।

পথ ঘুরে আসে। নদীর সেই উল্টো ভিয়ের 'Λ' পথ সামনে। ঐটুকু পেরিয়ে একটু গেলেই মিলবে বাংলো। শেষ হবে আজকের পদযাত্রা। মন আনন্দে ভরে ওঠে।

পথে এখন সোনালী সূর্যের হাল্কা রোদের পরশ। বসুন্ধরার মুখে স্নিগ্ধ হাসি। এ যেন দূর থেকে সন্তানকে ঘরে ফিরতে দেখে স্নেহময়ী মা আনন্দে দু'হাত বাড়ান। ভারি ভাল লাগে। পাথরের ওপর সকলে বসে দেখি সুন্দরী প্রকৃতির স্নিগ্ধ মুখখানি।

স্বপন তাগিদ দেয়। বলে দীপকদা এখানে বেশীক্ষণ বসে থাকা ঠিক হবে না। বনেব পথ। গা ছমছম করে। সুধেন্দু হাসে। বলে যে 'ভিয়ে' তুমি ভাল্লুক দেখেছিলে সেটাতো অনেক্ষণ পেরিয়ে এসেছি—এখন আর ভয় কি?

আমি ওদের কথায় বিশেষ কান না দিয়ে দু'চোখ ভরে দেখি পিণ্ডারীকে। কি মধুর রঙ্গ ভঙ্গে চলেছে সে।

আমি ও অজিত ছাড়া ওরা সকলে চলে যায় বাংলোর দিকে। আমরা ক্ষণিক বসে থাকি। এদিক ওদিক দেখি। হঠাৎ বাঁকের কোণটার অর্থাৎ ভিয়ের সরু ফলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই গা শিউরে ওঠে। ভয়ে থরথর করে কাঁপি। সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে। চোখে যেন সব কিছু উলোট-পালট দেখি। কোন কথা বলার শক্তি যেন আর নেই। সব কিছুই যেন অসাড় হয়ে আসছে। শুধু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে অজিতকে বলি—ঐ দেখ ঐ কোণের টিলাটার ওপর বাঘ শুয়ে আছে। কেমন কান দু'টো

নাড়াচ্ছে। অজিত দেখেই চমকে ওঠে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে দীপদা সত্যি বা-ঘ। কান নাড়াচ্ছে। এবার আর রক্ষে নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। এই সেই ম্যান ঈটার!

চিন্তা ভাবনার আর অবকাশ নেই। ভয়ে আমরা দু'জন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছি। বুকের ভেতরটা খালি ধড়াস ধড়াস করে। অন্য কোন রাস্তা নেই যে পার হয়ে যাব। ডান দিকে নদীর বিশাল খাদ। যেতে হলে ঐ টিলার তল দিয়ে যেতে হবে। অরুণারাও ঐ পথ ধরেই কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। বাঘটা হয়তো তখনও শুয়েছিল। কিন্তু তখন কারও লক্ষ্য পড়ে নি। এখন আমরা কি করি। অজিত একবার বলে চলো পিছন দিকে হাঁটি। জগৎরামদের সঙ্গে দেখা হলে একসাথে আসবো।

আমার আর সে সব বুদ্ধি মাথায় খেলে না। ভয়ে কাঁপি। টিলাটার দিকে চোখ পড়লেই বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যায়। যে কোন মুহূর্তে বাঘ যদি টিলাটার থেকে টুক্ করে লাফ দেয় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। টিলাটার উচ্চতাও পথ থেকে মাত্র ৩০´/৪০´ হবে।

ভয়ে দু'জনের মাথায় অন্য কোন বুদ্ধি আর খেলে না। প্রাণ-ভয়ে দু'জনায় মাথার ওপর রুকস্যাক দুটোকে তুলে উর্দ্ধশ্বাসে টিলার তল দিয়ে দৌড়াতে থাকি। বুক দুরদুর করে। এই বুঝি বাঘ লাফালো। অজিত জুতো খুলেছিল তাই এক হাতে জুতো জোড়া নিয়ে মোজা পরে দৌড়ায়। ছুট ছুট—সে কি ছুট!

প্রাণপণে মাথায় রুকস্যাক নিয়ে বনের পথে ক্রমাগত দৌড়াই। খালি ভাবি বাঘ যদি মাথার ওপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে হয়তো রুকস্যাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়বে—সেই অবসরে যদি পালাতে পারি। বুদ্ধি সবই লোপ পেয়েছে। বাঘ যদি সত্যি ঘাড়ের ওপর লাফায় তাহলে আমাদের এ বুদ্ধি যে কোন কাজেই আসবে না সে কথা ভেবে দেখবার অবকাশ তখন ছিল না। ভয়ে সবই তাল-গোল পাকিয়ে গিয়েছিল। তখনও ভেবে দেখি নি যে বাঘের সঙ্গে দৌড়ে আমরা পারবো না। সেতো তীরের বেগে দৌড়ায়।

ছুটছি তো ছুটছি। পিছন ফিরে দেখারও যেন অবকাশ নেই। অজিতও ছুটেছে উর্দ্ধশ্বাসে। সে খেলোয়াড়। কিন্তু হলে হবে কি! ঐ ভারি বোঝা নিয়ে মনে হয় খুবই জোরে দৌড়াচ্ছি। কিন্তু আদৌ তা নয়। দৌড়ের গতিও খুবই কম। আর যেন পারি না। প্রচণ্ড হাঁপাতে থাকি। খাতির বাংলোর খুব কাছে, পথে কয়েকজন পাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হয়। তারা রাস্তা মেরামতের কাজ করছিল। আমাদের ছুটতে দেখে কাছে এসে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে কিয়া হুয়া বাবু!

কিন্তু কথা বলার কোন শক্তিই আর নেই। দাঁড়িয়ে খালি হাঁফাই আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে। বুকটা কাতলা মাছের মত খপ খপ্ করে। অতি কষ্টে একটু সংযত হয়ে বলি শে-শে-শের।

কি আশ্চর্য! ওরা বাঘের কথা শুনেও একটুও ভীত হয় না। অম্লান বদনে হেসে বলে চলুন বাবু আমাদের সঙ্গে, দেখিয়ে দিন কোথায় বাঘ আমরা তাড়িয়ে দিচ্ছি।

আমাদের আর সে সাহস নেই যে ওদের সঙ্গে আবার যাব বাঘ দেখাতে। ঐ প্রকাণ্ড ডোরা কাটা বাঘ দেখে কার না ভয় হয়! আমাদের আর ধৈর্যও নেই। তাই বলি ঐ টিলার ওপরে বাঘটা শুয়ে আছে। কান দু'টো বেশ মেজাজে নাড়াচ্ছে। গেলেই দেখতে পাবে।

বেলা তখন তিনটে পনেরো আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে বাংলোয় আসি। অরুণরা আমাদের দেখে বেরিয়ে আসে। ভয়শঙ্কুল চেহারা দেখে ওরা জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে ?

অজিত কোন রকমে বলে বাঘ।

বাঘ! বাঘ! বলিস কি ?

হ্যাঁ বাঘ। তোরা চলে আসার একটু পরেই হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে ঐ টিলাটার ওপর। দেখি বিরাট বাঘ শুয়ে কান নাড়াচ্ছে। ভয়ে আত্মারাম খাঁচা। কোন পন্থাই মাথায় খেলে না। প্রাণভয়ে দৌড়াতে শুরু করি। পরে ওদের সব কথাই বলি।

সুধেন্দু জিজ্ঞাসা করে বাঘটাকে দেখে কি মনে হয়েছিল ম্যান ঈটার না নেকড়ে ?

অরুণ সুধেন্দুর কথায় হেসে বলে ঐ অবস্থায় কেউ কি বলতে পারে কি ধরনের বাঘ ছিল। একি চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে দেখা বাঘ! কত বড় লম্বা! কি আকার—তখন কি ওসব বিচার করা যায় ? শিকারী হলে অবশ্য অন্য কথা। তারা ভাল করে লক্ষ্য করে। আর আমাদের মত পদযাত্রী বনের পথে যখন বাঘ ভাল্লুক দেখে তখন যে কি অবস্থা হয় তাতো মর্মে বুঝেছি। তাছাড়া ম্যান ঈটার না হয়ে যদি নেকড়েই হয়—তাহলেও তো ভীষণ। জিম করবেট বলেছিলেন নেকড়েও বাঘ। যখন তাদের বন্যপশু শিকার করার ক্ষমতা কমে আসে এবং সেই সময় যদি নেকড়ে মানুষের রক্তের স্বাদ পায় তাহলে সেইসব নেকড়ে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ খেকো বাঘে পরিণত হয়।

'Leopards, unlike tigers, are to a certain extent scavengers and become man-eaters by acquiring a taste for human flesh when unrestricted slaughter of game has deprived them of their natural food.'

ওদের কথা শোনার মত ধৈর্য আমার নেই। সোজা ঘরে ঢুকে খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ি। সারাদিনে আমি আজ ২২ মাইলের মত পথ হেঁটেছি। ভীষণ ক্লান্ত। তাই শুতেই নিমেষে ঘুম নামে।

যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখি জগৎরামরাও এসে গেছে। চৌকিদার কফি নিয়ে হাজির। উঠে বসি। অরুণরাও এতক্ষণ শুয়েই ছিল। ওরাও উঠে কফি খায়। দেহমন চাঙ্গা হয়। বাইরে বেরিয়ে আসি।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে লনখানা ভরে আছে। শ্যামল দূর্বাদলে যেন রেশমী আলোর পরশ লেগেছে। মমতাময়ী প্রকৃতি আবার যেন রূপ বদলেছেন। সুন্দরীর বেশে হাজির হয়েছেন যেন মন ভোলাতে। বাতাস যেন দোল দেয়। ফুলেরা দোলে। মনও সেই তালে আপনা থেকে দোল খায়। লনে গিয়ে বসি। চৌকিদারের মুখে বাঘের কথা শুনে জগৎরাম, হায়েদ ও ধরম সিং

আমাদের কাছে আসে বাঘের খবর জানতে। সব কথা বলি। ওরা হাসে। বলে এসব বাঘ গরু ভেড়া ধরে খায়। মানুষকে তেমন কিছু করে না।

অজিত বিস্ময়ে বলে কি করে জানলে ঐ বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে না।

ওরা হাসে। বলে রাত্রে প্রায়ইতো গ্রামে বাঘ আসে। ভেড়া ছাগল নিয়ে পালিয়ে যায়। আমবাও লাঠি নিয়ে বেরই। কুকুব ছোটে। বাঘ পালায়। ইচ্ছে করলে তো আমাদের ঘাড়েও লাফিয়ে পড়তে পারে। আর তাছাড়া দেখুন না বুগিয়ালে তো কয়েকজন লোক মিলে কয়েকশো ভেড়া চড়ায়। দিনের পর দিন তারা বনেই থাকে। সঙ্গে অবশ্য গোটা কয়েক কুকুর থাকে। বাঘও হামেসাই আসে বকরি শিকাব করতে। মানুষ শিকার করতে নয়। মাঝে মাঝে বকবি নিয়ে পালায়। মানুষকে কই কোন আঘাত কবে না।

অরুণ বলে বলো কি! কুমায়ুনের জঙ্গল তো মানুষ খেকো বাঘেবই রাজত্ব। হায়েদ ঘাড নাড়ায়। বলে ঠিকই। কিন্তু বাবু সব বাঘ মানুষ খায় না। যে বাঘ অকেজ, বুড়ো সেই বাঘ দেখলে সকলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার কাছে আব বেহাই নেই। কিন্তু আপনারা যে বাঘেব কথা বলছেন সে বাঘ মানুষ খায় না। ওবা ছাগল ভেড়া ধবে খায়। অবশ্য কোন কোন সময় যে আক্রমণ করে না তা নয়। তবে সেটা খুব কম। তাছাড়া আপনারা তো ওব সামনে দিয়ে দৌড়ালেন—কিছু কি করেছিল? সিগারেটে মৌজ টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে করবে না বাবু কিছুই করবে না। সবই নন্দাভগবতীর আশীর্বাদ।

ওরা যাই বলুক না কেন—বাঘে যে মানুষকে কিছু করবে না একথা বিশ্বাস হয় না। কোন বাঘ মানুষ খায় আর কোন বাঘ ভেড়া ছাগল ধরে—সে বিচার করার ক্ষমতা থাকে না যখন সামনে দেখা যায় বাঘ। তাছাড়া বাঘ ভাল্লুক দেখতে আমরা অভ্যস্তও

নই। বাঘ দেখে ভয় পায় না এমন ক'টা লোক আছে? তাই ওদের কথা আমাদের কানে আশ্চর্যই ঠেকে। অবশ্য জিম করবেটও ওই একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সব বাঘ মানুষ খায় না। যে বাঘ আহত হয়ে শিকার করতে অক্ষম, যে বৃদ্ধ বাঘ আর শিকার করতে পারে না, যে কোন অঙ্গে পঙ্গু সেইসব বাঘই উপায় না দেখে মানুষ শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

'A man eating tiger is a tiger that has compelled, through stress of circumstances is, in nine cases out of ten, wounds and in the tenth case old age. The wound that has caused a particular tiger to take to man eating might be the result of a carelessly fired shot and failure to follow up and recovered the wounded animal, or be the result of the tiger having lost his temper when killing a porcupine. Human beings are not the natural prey of tigers, and it is only when tiger have been incapacitated through wounds or old age that in order to live, they are compelled to take a diet of human flesh '

(The man eater of kumaun)

গল্প করতে করতে বেলা পড়ে আসে। পশ্চিম দিগন্তে চেয়ে দেখি বঙ্কিম আলোর শেষ অভিনন্দন। আকাশে গোধূলিব ছায়া নামে। বাতাসে ভেসে আসে পূরবীব সুরে বিদায় রাগিনীর অন্তিম সুব মূর্ছনা। দিন শেষ হয়ে আসে। অন্ধকারের যবনিকা টেনে ঘুমিয়ে পড়েন বিশ্বপ্রকৃতি। কিন্তু ঘুম নেই আমাদের চোখে। আমরা উদ্বিগ্ন। এখনও ব্যানার্জিদা, নাড়ু, পানু এসে পৌঁছায়নি। সন্ধ্যে সাতটা হয়ে গেল। তারওপব আজ বাঘের দর্শন। অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি। ধৈর্যের সীমাও যেন ছাড়িয়ে গেছে। অবশেষে আমি সুখেন্দু ও সেন রান্নার দায়িত্ব নিয়ে জগৎরাম ও ধরম সিংকে টর্চ হাতে দিয়ে ওদের খুঁজতে পাঠাই।

শরীর আজ ভীষণ ক্লান্ত। রান্না করার ধৈর্যও আজ নেই। কিন্তু উপায় কি? করতে তো হবেই। তারওপর কলকাতা থেকে আনা পাঁউরুটিও আজ ফুরিয়ে গেছে। তাই সকালের খাবারও তৈরী করে নিতে হবে। দেরী না করে হাত লাগাই।

অরুণ, অজিত ও স্বপন ঘর ও বাইর করে। রাগে তারা গজ গজ করে বলে ওরা কি ভেবেছে এটা কেদারের পথ—যে রাত নটায় ফাটাচটি পৌঁছানোর মত এখানে পৌঁছাবে। বেলা তিনটের সময় ওরা জগৎরামদের সঙ্গেই ছিল। দূরত্বও খাতি থেকে মাইল তিনেক—কিন্তু এখনও তাদের পাত্তা নেই। বাঘের পেটেই বা গেল কিনা—তাই বা কে জানে? পথ ভুল হবার নয়। সকলেই উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে অন্ধকার পথের দিকে।

রান্নাও হয়ে গেছে। খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় দেখি টর্চের আলো। জগৎরাম ও ধরম সিং এর কাঁধে হাত দিয়ে ধুঁকাতে ধুঁকাতে ওরা তিনজন আসছে। সেন ও মনোজ ছুটে যায় ওদের ধরে আনতে। ওরা যখন বাংলোয় পৌঁছায় তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

রাতের খাওয়া সেরে ডায়রী লিখতে বসি। তবে আজকে লেখার ক্ষমতাও খুব কম। কোন রকমে পিণ্ডারী দেখা, বাঘের সাক্ষাৎ ইত্যাদি লেখার পর আজকের অভিজ্ঞতাটুকু না লিখে থাকতে পারি না। আজ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছি হিমালয়ের পথে দল বেঁধে হাঁটা উচিৎ। একে অপরকে ফেলে কোন রকমেই বেশী দূর এগিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। তবে এটাও ঠিক সকলে যেন সমান তালে হাঁটে। খুব বেশী পিছিয়ে পড়া কোন মতেই সমীচীন নয়। দলে ধীর গতি সম্পন্ন বা অলস প্রকৃতির লোক থাকলে খুবই অসুবিধা হয়। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সম মনবল থাকলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যায় নইলে পদে পদে বিপদ আসে।

রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। সকলেই শুয়ে পড়েছে। আলো আর জ্বালিয়ে রাখা ঠিক নয়। আমিও ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ১২ ॥

মধুর শীতে রাত কাটে। বিগত দিনের ক্লান্তি অবসাদ যায় মুছে। নবীন প্রভাতে সবই যেন স্বপ্নের মত লাগে।

পাখী ডাকে মিষ্টি মধুর সুরে। যেন ঘুম ভাঙানি গান গায়। জাগেন বিশ্বপ্রকৃতি নতুন আলোর প্রভায়।

সূর্য ওঠে। দিগন্তের কালিমা যায় মুছে। চারিদিক ঝলমল করে। প্রকৃতিরাণী যেন পূজার ডালি সাজিয়ে দেবতাত্মা হিমালয়ের বন্দনা করেন। কি প্রসন্ন প্রভাত! কি সুনীল আকাশ! এযেন হিমালয়ের অন্দরে বসে রূপময়ী প্রকৃতির স্বরূপ দেখা। কি অপূর্ব রূপের আধার! কি প্রশান্ত মূর্তি! উদ্ভাসিতা জগজ্জননীকে প্রাতঃ প্রণাম জানিয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হই।

মন আজ বেঁকে বসে। কিছুতেই সে ফিরে যাবে না। নিজের মনকে নিজেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। অবুঝ মন সে প্রবোধ মানে না। সরল শিশুর মত অঝোরে কাঁদে। চোখ তুলে চাইতে পারি না। সবই যেন ম্লান ঠেকে। কিন্তু ফিরে তো যেতেই হবে। এ রূপের অঙ্গনে থাকার সৌভাগ্য তো আমার চিরস্থায়ী নয়। তবু কেন মন কাঁদে। কেনইবা চরণযুগল চলা বন্ধ করতে চায়। কেন—কেন নয়ন জলে ভরে। জানি না তারা কি চায়।

চৌকিদার আসে। তার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিই। সেও কাঁদে। বিদায় জানাতে পারি না। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। বেদনায় ভরা মন নিয়ে বন্ধুর পথে যাত্রা করি।

সকাল সাতটা। খাতি ছেড়ে এগিয়ে চলি ঢাকুরির পথে। মন চায় আজকের পথ যেন না ফুরায়। অনন্তকাল ধরে যেন হেঁটে চলি এরই পথে পথে। হিমালয় চিরসুন্দরের আলয়।

সেদিনের উৎরাই পথ আজ চড়াই হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। শরীর ক্লান্ত। মন বিষাদে ভারাক্রান্ত। তাই ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হয়। সকাল তখন সাড়ে ন'টা ঢাকুরির বাংলোয় এসে পৌঁছাই।

জগৎরাম কাঠ জেলে চায়ের ব্যবস্থা করে। খাবার দেয়। তার-তো কাজের ক্রটি নেই। কিন্তু আজ যেন কিছুই ভাল লাগে না।

মিষ্টি রোদ। সুবর্ণমণ্ডিত পর্বতমালার সৌন্দর্য। ফুলের সুবাস। পাখীর গান। ঝর্ণার কলকলানি—সবই যেন ব্যথাতুর মনে মাঝে ম্লান হয়ে যায়। তবুও চোখের দৃষ্টি থাকে সেইদিকে।

আজ ব্যানার্জিদারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। চড়াই ভাঙার সময় একটু পিছিয়ে পড়েছিল। যাইহোক ওরা এসে গেছে একসঙ্গেই আবার রওনা হওয়া যাবে। তাই বিশ্রাম করি।

হঠাৎ জগৎরাম এসে খবর দেয়। মোটাবাবু আর নাড়ু এখানে তুপুরের খাওয়া না খেয়ে যাবে না। তাই চাল ডাল ইত্যাদি বের করে দিয়ে ধরম সিংকে রেখে আমরা লোহারক্ষেতের পথে এগিয়ে চলি। সামান্য চড়াই ভেঙে ঢাকুরি খালে পৌঁছে ক্ষণিক বিশ্রাম করি। নন্দাভগবতীর উদ্দেশ্যে লজেন্স দিয়ে পূজা দিই। জগৎরাম পূজা করে। পাথরের বেদীমূলে ফুল সাজিয়ে দিই। প্রসাদ খেয়ে আবার উৎরাই পথে নামতে থাকি।

সেদিনের সেই বুকফাটা চড়াই আজ মারাত্মক উৎরাই হয়ে দাঁড়ায়। হুড়হুড় করে নেমে চলি।

মাঝ পথে দেখা হয় তিনজন বাঙালীর সাথে। তাঁবা চলেছেন পিণ্ডারী দেখতে। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে আলাপ করি। এই দলে আছেন বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, সুশীল ব্যানার্জি ও রথীন ব্যানার্জি। এঁরা প্রত্যেকেই কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশনে চাকরি করেন। এঁদের মধ্যে বিশ্বনাথবাবুব সঙ্গে আমার গতবছরই কেদারনাথেব পথে আলাপ হয়। আমাদের মত পূজোর ছুটীতে ওনারও চলেছেন পিণ্ডারীর পথে। ওঁরা এখন বুকফাটা চড়াই ভেঙে উঠছেন। পরনে হাফ প্যাণ্ট, মাথায় টুপি। যেন জকির বেশে চলেছেন ওঁরা উর্দ্ধমুখে আর আমরা চলেছি নেমে।

প্রচণ্ড রোদ। গরম বোধহয়। গরম জামাকাপড়গুলো খুলে ফেলি। আলগা পাথরের পথ। ধীরে ধীরে নামার উপায় নেই।

পা যেন আপনা থেকে চলে। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যায়। জলের আশায় আরও দ্রুত নামতে থাকি। সামনে ঝর্ণা পেয়ে যেন স্বর্গ পাই। প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল পান করি। দেহের ক্লান্তি মেটে। পাথরের ওপর একটু বসি। ওদিক থেকে এক ঘোড়াওয়ালা এসে হাজির হয়। দেখামাত্রই নমস্কার জানায়। বসে আলাপ করে। নাম তার পান সিং। কথায় কথায় সুনীল চৌধুরীর খবর জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সুনীল চৌধুরীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ নেই। তাই খবর বলতে পারি না। তবে তার নাম শুনেছি।

পান সিং বলে আমি সুনীল চৌধুরীর সাথী। ওঁর সঙ্গে আমি থারকোট অভিযানেও গিয়েছিলাম।

সেন পান সিংকে একটা সিগারেট দেয়। ও খুশী হয়ে চলে যায়। আমরা নামতে থাকি।

বাঁক ঘুরতেই দেখি লোহারক্ষেতের বাংলো। মনের আনন্দে অরুণরা তাড়াতাড়ি নামতে থাকে। আমি পান্নু ও সমীর একটু পিছিয়ে পড়ি। ধীরে ধীরে নামি।

পথের মাঝে পাহাড়ী শিশুর দল এসে পয়সা চায়। পিছু পিছু দৌড়ায় আর বলে বাবুজি পয়সা দিজিয়ে, বকসিস দিজিয়ে।

টুলটুলে নিষ্পাপ শিশুগুলোকে দেখে বড়ই কষ্ট হয়। ফোলা ফোলা কোমল দেহ। পরনে শত ছিন্ন জামা। মুখে আধো আধো বুলি। দু'হাতে পেতে পয়সা চায়, খাবার চায়। যত এদের দেখি, দরিদ্রতার কথা ভাবি ততই যেন কষ্ট বাড়ে। পকেট থেকে লজেন্স ও পয়সা বের করে ওদের হাতে দিতেই ওরা যেন আনন্দে লুটিয়ে পড়ে। খুশীর মেজাজ নিয়ে আমাদের সাথে বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়। ওদের কথা বুঝি না। তবুও ওদের সাথে আলাপ করতে করতে লোহারক্ষেতের বাংলোয় এসে পৌছাই। বেলা তখন আড়াইটা। সোনালী রোদে ভরে আছে লনটি। পিঠের বোঝা নামিয়ে সেখানে গিয়ে বসি।

অরুণ এখন ব্যস্ত। ওর এখন সবচেয়ে বড় কাজ জামাকাপড়

কাচা। প্রতিদিন দু'বেলাই ওর জামাকাপড় কাচাকাচি করা অভ্যাস। ব্যাচারি এ ক'দিন কাচাকাচি করতে না পারায় মন তার বড়ই খারাপ। তাই এসেই সব কাজ ফেলে দিয়ে কাচতে বসেছে। অবশ্য ওর এই অভ্যাসটা এতই মজার যে অনেক সময় ও কাচাকাচির জন্যে অন্য কাজ করবার নাকি সময় পায় না। সব সময়ই ও একটু ছিমছাম থাকতে চায়। তাই বন্ধুরা ওকে ঠাট্টা করে ফুলবাবু বলে ডাকে। তাতে ও রাগে না। বরং মুচকে হাসে।

ফুলুবাবুর কাজ শেষ হ'লে আমরা একে একে স্নান করে নি। শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়। ক্ষিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। রান্নাঘরে ঢুকে চিঁড়ে আলু পিঁয়াজ ভেজে নিয়ে আসি। মুষোল ধারে বৃষ্টি নামে। সুধেন্দু ভিজতে ভিজতে কফি করে নিয়ে আসে। আরামে খাই। আর বসে বসে দেখি বাদলের লীলাখেলা।

অঝোরে বৃষ্টি নামে। সনসন শব্দ তুলে তীরের বেগে হাওয়া ছোটে। গাছগুলো যেন পাগলের মত এ ওর ঘাড়ে ঢুলে ঢুলে পড়ে। নীরবে গাছের ডালে বসে পাখীরা ভেজে। ফুলভরা গাছগুলো যেন মাথা নত করে অবিরাম স্নান করে। যেন মেতেছে তারা মুক্তিস্নানে।

দুপুরের আকাশ। জমাট বাঁধা মেঘে অন্ধকার। মেঘের পর মেঘ ভেসেছে হিমালয়ের আকাশ জুড়ে। বৃষ্টির ঝালরে চারিদিক অস্পষ্ট। কাছে পিঠে কিছুই দেখা যায় না। কানপেতে শুনি শুধু টিনের চালে বৃষ্টির ঝমঝমানি। যেন জলতরঙ্গের সুর বাজে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। যেন শানিত তরবারি দিয়ে কে এসে কাজল কালো মেঘের জটাজালে আঘাত করে। গুরু গুরু ডেকে ওঠে মেঘ। গগনভেদী গর্জনে পাহাড়তলি যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মেঘের ঘনঘটা, বিজলীর ঝলকানি, ঝিমঝিম শব্দ, অবিরল বারিবর্ষণ—সবই যেন চোখে ঠেকে প্রকৃতির উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন।

আজকের রাত পোয়ালে ছেড়ে যেতে হবে প্রকৃতির রূপের অঙ্গন। সমতলের মানুষ ফিরে যাব সেই সমতলে। ভাবতে যেন

পারি না। কষ্টে বুক ফেটে যায়। দু'চোখে নামে অশ্রুধারা। সজল নয়নে চাই প্রকৃতির দিকে। তারও চোখ দিয়ে জল ঝরছে। সেও তো কাঁদছে অঝোরে। সেও বিদায় ব্যথায় ব্যথাতুরা।

কাঁদি আমি। কাঁদে প্রকৃতি। হিমালয়ের গহন কন্দরে বসে নির্জনে প্রকৃতির সাথে প্রেমালাপ ছেড়ে যেতে—কারই বা মন চায়। প্রকৃতিও যেন আপনার করে নেয়। তাইতো বিদায় জানতে কেউ কাউকে পারে না। উভয়রই চোখ শুধু ছলছল করে জলে ভরে ওঠে। মন গুমরে গুমরে কাঁদে।

মেঘেরা যেন পাখা গুটায়। বৃষ্টি কমতে থাকে। ঝরঝর থেকে ঝিরঝির। তারপরে থেমে যায়। আকাশে আবার হাল্কা সোনালী রোদ খেলে। সদ্যস্নাত জননী বসুন্ধরা শুচি বস্ত্র পরে এসেছেন যেন পূজা মণ্ডপে। কপালে তাঁর রাঙা টিপ। পরনে লালপাড় রেশমী শাড়ি। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। এসে-ছেন যেন সন্ধ্যারতী দেখতে।

সূর্যদেব বিদায় নিয়ে চলেছেন। আকাশের কপালে রক্ততিলক এঁকে তিনিও তলিয়ে গেলেন কোন অতলে। এই বুঝি দেব মন্দির খুলবে। জ্বলবে তারার প্রদীপ। শুরু হবে সন্ধ্যারতী। আহা কি অপূর্ব পবিবেশ! কি মধুর না লাগে। কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি।

জগৎরামের ডাকে চমক ভাঙে। একগাল হেসে বলে বাবু খাবার এনেছি।

আজ খাবারের বেশ পরিপাটি করা হয়েছে। সেন নিজেই রান্না করছে। টিনের মাংস এতদিন ধরে সে রেখে দিয়েছিল। সেগুলো আজ রান্না হচ্ছে। বার পাঁচেক শুনিয়েও গেছে আজ সসিটকারি হবে। মাঝে মাঝে উঠে এসে সে সসিটের গুনগান গেয়ে যায়। খেতেও নাকি অপূর্ব! নিজেকে নিজেই তালিম দিয়ে বন্ধুদের বলে দেখিছিস্ ঠাণ্ডার দেশে কি খাবার এনেছি। রান্না হোক্ দেখবি কি অপূর্ব জিনিষ! আবার ও চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদেই ঘুরে আসে। বন্ধুদের বলে কিরে গন্ধ পাচ্ছিস্। না

পেলেও ওরা হ্যাঁ বলে। ফরমাশের পর ফরমাশ করতে থাকে। বন্ধুরা না পেরে ওর নাম দেয় সসিটবাবু।

আমাদের সঙ্গে তো ওসব খাবার নেই। তাতো আগেই বলেছি। আমাদের খাবার ঐ খিচুড়ি। জগৎরামের ডাকে উঠে রান্নাঘরে যাই। সারা রান্নাঘরখানি সসিটের চিমসে গন্ধে ভরপুর। বিকেলের জলখাবারের পরটা আলুর তরকারি পেট থেকে যেন ঠেলে বের হয়ে আসতে চায়।

বিকট গন্ধ হলে হবে কি--যেহেতু সেন কলকাতা থেকে অনেক দাম দিয়ে ওগুলো কিনে এনেছে সেইহেতু খারাপ হলেও সে জোর করে ভাল বলবেই। ঐ গন্ধ পেয়ে দলের লোকেরা একে একে সকলেই সসিটবাবুকে বলে যায় সে খাবে না। সসিটবাবু তো ভীষণ রেগে গেছে। রাগের চোটে মাঝে মাঝে তার কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও সে ছাড়বার পাত্র নয়। বলেই চলেছে ঠাণ্ডার দেশে এসব না খেলে শরীর ভেঙে পড়বে।

সেনের কথা শুনে হাসি পায়। মনে মনে ভাবি কলকাতা থেকে সে এই টিনের মাংসগুলো বয়ে নিয়ে এল। সেগুলো আবার টেনে নিয়ে গেল ফুরকিয়াতে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাত কাটালো ফুর-কিয়ায়। সেখানে ভাল ভাবে কোন জিনিষ সিদ্ধ করা যায় নি। অথচ ঐ অসুবিধার মধ্যেও সেন দলের লোককে সসিটের টিন কেটে মাংস গরম করে খাওয়ায় নি। দলের লোক যতবারই সেনকে বলেছে ততবারই সে বলেছে পরে হবে। ফুরকিয়ার উচ্চতা ছিল ১০৭০০´ আর লোহারক্ষেতের উচ্চতা ৫৭৫০´ অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার ফুট নীচে নেমে এসে যেখানে সকলে ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পায়, মৃদু গরম বোধহয় সেখানেই সেন সাহেবের ঠাণ্ডা বেশী লাগে। ফুরিকায় যেখানে প্রচণ্ড বরফ পড়েছিল কাঠের আগুন ছাড়া একদণ্ডও সেখানে বসা যাচ্ছিল না—সেখানটা তার কাছে ঠাণ্ডার জায়গা হল না। হল কি না লোহারক্ষেত। এযেন একেবারে সেই দি গ্রেট রঞ্জিত চ্যাটার্জির গল্পের মত। রঞ্জিত

চ্যাটার্জির লোকেরা বলে একবার প্রচণ্ড চড়াই ভেঙে যখন তারা ১৩৫০০´ উচ্চ এক গিরিবর্ত্মে´ উঠছিল তখন দলের সকলেই গরম জামা, সোয়াটার ইত্যাদি খুলে ফেলেছিল। কারণ চড়াই পথে উঠতে শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম নামে, গরম লাগে। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেই ঠাণ্ডা লাগে। কিন্তু দি গ্রেট গরম জামা-কাপড় কোনটাই খোলে নি। যখন তারা গিরিবর্ত্মে´র মাথায় পৌছায় তখন তারা প্রচণ্ড হিমেল হাওয়ায় ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপে। যার যা গরম জামা ছিল সবই পরে। তবুও ঠাণ্ডা বোধহয়। কিন্তু এইখানেই দেখা যায় দি গ্রেটের বাহাদুরি। সে গরম জামা খুলে একটা ফিন-ফিনে টেরিলিনের সার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকে। শীতে কাঁপলেও দি গ্রেট তা স্বীকার করতে চায় না। ভাব দেখায় যেন এসব তার কাছে কিছুই নয়। কোথায় শীত! গর্বের সঙ্গে বলে একি যে সে জামা। এ বম্বের টেরিলিন। ভাল কথা। গিরিবর্ত্ম থেকে প্রায় পাঁচ/ছ হাজার ফুট নীচে যখন নামতে থাকে তখন সকলেই আবার একটা একটা করে গরম জামা খুলে ফেলে। আব দি গ্রেট! তখন গরম জামা পড়তে শুরু করে। সেখান থেকে আরও নীচে অর্থাৎ সমতলের দিকে নামতে থাকে তখন সকলেই সুতীর সার্ট পরে। কিন্তু দি গ্রেট তখন যত গরম জামা ছিল সবগুলোই পরে বসে থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আগে একবার ময়লা করে নিচ্ছি।

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে কখন যে মুখ ফসকে গল্পটা সকলকে শুনিয়ে ফেলেছি তা খেয়ালই নাই। হঠাৎ ওদের হাসির শব্দে আমার গল্প থেমে যায়। অজিত তো হাসতে হাসতে বলেই ফেলে—আজ থেকে আমরাও সেনদার নাম দিলাম সসিট দি গ্রেট।

সুধেন্দু সায় দিয়ে বলে বেশ সুন্দর নামকরণ হয়েছে। এক-জনের নাম রঞ্জিত কুমার আর একজনের নাম সসিট কুমার। গ্রেটে গ্রেটে মিলেছে ভাল।

সেন এসব কথা শুনে রেগে উঠবে উঠবে ভাব তখন ব্যানার্জিদা

এসে সেনকে জড়িয়ে ধরে বলে বেশ তোফা নামটি দিয়েছে ভাই।
সেন খ্যাঁক্ করে উঠে বলে ভুঁড়িদাসকে নুনের বস্তা বলাই ভাল। হাঁটাপথে বাবুর ঘোঙানি শুরু হয় আর যখন খেতে দেওয়া হয় তখন বাবুর মুখে বুলি ফোটে। যেই সেন ব্যানার্জিদার ভুঁড়িতে হাত বুলায় অমনি হাসির রোল ওঠে। গল্প থেমে যায়।

জগৎরাম ও ধরম সিং এর ছেলেমেয়েরা এসেছে। তারাও অবাক হয়ে আমাদের হাসি ঠাট্টার কথাগুলো শুনছিল। থেমে যেতে তারা যেন আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চায়।

জগৎরাম আর একবার কফি করে নিয়ে আসে। আমরা মগ হাতে বাংলোর বারান্দায় এসে বসি।

আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। চাঁদ উঠেছে নীল আকাশে রূপোলী আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে। চন্দনবর্ণা চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার প্লাবনে দিগন্ত উদ্ভাসিত।

চাঁদ হাসছে। অন্ধকার ম্লান হয়ে গেছে। রূপসীর রূপের ছোঁয়ায় অন্ধকার যেন অভিমান করে পালিয়ে গেছে অন্য কোনখানে!

আকাশের গায়ে পাহাড়ের কোলে লেগেছে চন্দ্রাবতীর উজ্জ্বল হাসির ছটা। ভাস্বর হয়ে উঠেছেন জননী বসুন্ধরা। কি প্রশান্ত সৌন্দর্য! কি অবিস্মরণীয় স্মৃতির আলেখ্য!

আবার যেন আস্তে আস্তে চোখের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে লাগল। ভুলে গেলাম সব কিছু। ক্লান্ত দেহে, পাগলা মনে এনে দিল দীপ্ত জীবনের হিল্লোল। পিছনে ফেলে আসা দুঃখের ইতিহাস আবার যেন স্মৃতির কোলে বিলুপ্ত হয়ে গেল। হৃদয় নতুন আনন্দের উদ্বেল জোয়ারে প্লাবিত। এ অবস্থায় আর যেন চোখের জল মানায় না। সেটুকু মুছে ফেলে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকি রূপসী চাঁদের দিকে। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে পাহাড়তলির বুকে।

আজ উৎসবের দিন। মেতেছে সবাই আনন্দে। আকাশ পথেও দেখা দিয়েছে লক্ষ লক্ষ তারার শোভাযাত্রা। জ্বলজ্বল করে উঠেছে তাদের সাজানো প্রদীপের দীবাবলী। ছোট ছোট

হাল্কা মেঘের ভেলা কেমন দুলে দুলে ভেসে ভেসে চলেছে অগাধ নীল আকাশে পাড়ি দিয়ে।

জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছে বনের পাখী। ডাকছে তারা কুলায় বসে মনের আনন্দে। এই বুঝি ওরাও উড়ে যাবে ঐ উৎসব প্রাঙ্গনে। উড়েছেও দু'একটা। যেন ডেকে ডেকে যায় সবাইকে। মঙ্গলধ্বনি বেজেছে যেন সানাইয়ের সুরে।

পূর্ণ চন্দ্র উদিত হয়েছে উর্দ্ধগগনে। রূপের বন্যা বয়েছে যেন চতুর্দিকে। সৌন্দর্যময় পৃথিবীর যে কি রূপ, কি বিস্ময়—তা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করি।

ছুটেছে কুয়াশা আলুথালু হয়ে। চলেছে মেঘ বলাকার মত সারি বেঁধে রূপসীর সন্দর্শনে। জাদুকর যেন এসে গেছে রহস্যময় দেশে। মায়াকাঠির পরশে কেমন যেন ঘুম নামিয়ে দিয়েছে দিগন্তে। রূপবতীও যেন ঘুমিয়ে পড়ছে রূপোর পালঙ্কে।

ধীরে ধীরে তন্দ্রা নামে ধরণীর চোখে। চারিদিকে কেমন যেন ঢুলুঢুলু ভাব। রাত ক্রমেই গভীর হয়ে ওঠে। শীতের বাতাস ছোটে যেন সবাইকে ঘুম পাড়াতে। অবস হয়ে আসে দেহ। উঠে ঘরে যাই।

নিঃশব্দ রাত। সবাই ঘুমে অচেতন। আমারও চোখ জুড়ে আসে। এই ঘুমাই। এ[illegible] ভাঙে। আবার ঘুমাই। আবার জাগি। আজ যেন নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। মনের দিগন্ত জুড়ে শুধু বাজে বিদায়ের করুণ সুর, বাজে ব্যথার রাগিণী। ছেড়ে যাবার অব্যক্ত ব্যথাটুকু যেন আগামী আনন্দের মাঝে এক হয়ে মিশে যায়। অবুঝ মন বুঝেও বোঝে না কিছু। সে ভালবাসে পুরানো স্মৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে। ভালবাসে হারানো আনন্দে ডুব দিতে।

শুয়ে শুয়ে আবার খাতি থেকে পিণ্ডারীর পথের স্বপ্ন দেখি। জলছবির মত সবই আবার মনের কোণে ভেসে ওঠে। কত কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সুনিবিড় পাইনের ছায়ায় বারবার আমি

বিশ্রাম নিয়েছি। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, জেগে উঠেছি পাখীর গানে। চেয়ে দেখেছি দূরে পাহাড়ের পশ্চাতে দিনের শেষে আবিরের আলপনা এঁকে সূর্যদেব চলেছেন বিদায় নিতে। রাতের চাঁদ কুয়াশার ঘোমটা তুলে অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছে পৃথিবীর দিকে। নদীর কলকলানি, বাতাসের সনসনানি, বৃষ্টির ঝমঝমানি, আর শুভ্র তুষারের ঝলকানি—সবই যেন আবার মনের আঙিনায় ভেসে আসে। আবার যেন ডুবে যাই রূপসাগরে।

*　　　*　　　*

বিদায়ের দিন এগিয়ে আসে। রাতের কুয়াশা ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে এসেছে। সূর্য উঠছে। আকাশ রাঙিয়ে। ছড়িয়ে পড়েছে কনক কিরণ। হেসেছেন বিশ্বপ্রকৃতি তরুণ তপনের স্নিগ্ধ পরশে। মুখ তুলে চেয়ে থাকি প্রভাত সূর্যের দিকে। খুশীর ফানুস যেন আজ চুপসে গেছে।

হে সূর্য। অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে আজ তোমায় বন্দনা করি। জানিনা কোন মন্ত্র, জানিনা কোন তন্ত্র। কিন্তু মন বলছে বারবার উজাড় করে দে নিজেকে, বিলিয়ে দে আপনাকে, ভুলে যা সব দুঃখ।

আঁকাবাঁকা পথ ছলাকলা নিয়ে চলেছে আবার। চলেছে সে আমার মনকে নিয়ে অন্য কোনখানে। পথের পুরস্কার রয়ে গেল মনে।

পরিশিষ্ট

পিণ্ডারী যাতায়াতের পথ

ট্রেনে : হলদোয়ানি বা কাঠগুদাম।

বাসে : হলদোয়ানি—কাঠগুদাম—ভাওয়ালি—গরমপানি—আলমোড়া—গোমেশ্বর—কৌশানী—গরুড়—বৈজনাথ—বাগেশ্বর—কাপকোট—ভাড়ারি (১২২ মাইল)।

হাঁটাপথ

একস্থান	থেকে অপর স্থান	দূরত্ব (মাইল)	থাকার জায়গা	পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ভাড়ারি	লোহারক্ষেত	৯	বাংলো	মামুলী পথ।
লোহারক্ষেত	ঢাকুরি	৬	"	প্রথমে প্রচণ্ড চড়াই পরে উৎরাই।
ঢাকুরি	খাতি	৬	"	প্রথমে উৎরাই পরে মামুলী।
খাতি	দোয়েলি	৭	"	মামুলী চড়াই।
দোয়েলি	ফুরকিয়া	৩	"	ঐ।
ফুরকিয়া	পিণ্ডারী	৪	"	ঐ।
পিণ্ডারী	ফুরকিয়া	[illegible]	"	মামুলী উৎরাই।
ফুরকিয়া	দোয়েলি	৩	"	ঐ।
দোয়েলি	খাতি	৭	"	ঐ।
খাতি	ঢাকুরি	৬	"	প্রথমে মামুলী পরে চড়াই।
ঢাকুরি	লোহারক্ষেত	৬	"	প্রথমে চড়াই। পরে প্রচণ্ড উৎরাই।
লোহারক্ষেত	কাপকোট	১০	"	মামুলী পথ।

* ঢাকুরি থেকে সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকা যাবার পথ। পথে পড়বে জাতোলী গ্রাম (১২ মাইল) ডুঙ্গিয়াঢণ্ড (৮ মাইল)। সেখান থেকে সুন্দরডুঙ্গা (৯ মাইল)।

* রূপকুণ্ড যাবার সময় আমাদের গাইড বীর সিং এর কাছে শুনেছিলাম

মান্দোলি গ্রাম থেকে পিণ্ডারী ধরে খাতিতে নাকি আসা যায়। সুতরাং খাতি থেকে রূপকুণ্ডের পথে হেঁটে যাওয়া যায়।

* দোয়েলি থেকে কাফনি হিমবাহে যাবার পথ। দূরত্ব ৮ মাইল। দোয়েলির বাংলো থেকে সকালে বেরিয়ে বিকেলে ঘুরে আসা যায়। পথটি জঙ্গলাকীর্ণ সেইজন্য কুলিদের সাথে রাখা প্রয়োজন।

* ফুরকিয়া থেকে দু' মাইলের মত পিণ্ডারীর পথে এগিয়ে গেলে পথের ডান দিকে পড়ে মার্তোলী গুহা। সেখান থেকে আরও এক মাইলের মত এগিয়ে গিয়ে পিণ্ডারী নদী অতিক্রম করে মাইল পাঁচেক গেলে বুড়িয়াকা হিমবাহ দেখতে পাওয়া যায়। পথটা দুর্গম। পাঁচ মাইলে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে তো হবেই উপরন্তু খাড়া পাথরের দেওয়াল বেয়ে উঠতে হবে। সেইজন্য ঐ পথে যেতে হ'লে কিছু সাজ সরঞ্জাম ও পর্বতাভিযানের কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। শুনেছি হিমবাহটি দেখতে নাকি অপূর্ব।

* পিণ্ডারী হিমবাহ দেখতে যাবার প্রকৃষ্ট সময় মে-জুন অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। * ১৬ দিনে ভ্রমণ শেষ করা যায়।

* জিনিষপত্র কেনার জন্য হয় আলমোড়া না হয় বাগেশ্বরে এক দিন থাকলে ভাল হয়। অবশ্য ভাড়ারিতেও জিনিসপত্র পাওয়া যায় তবে একটু দাম বেশী।

* উপরোক্ত বাংলোর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।
একসিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডব্লু, ডি, আলমোড়া, উত্তর প্রদেশ।
বাংলোর জন্য নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে চিঠি দিতে হবে।
বাংলোয় রান্না করার বাসনপত্র পাওয়া যায়।

* যাবার আগে বর্তমান পরিস্থিতি জানবার জন্য টুরিষ্ট অফিসার, উত্তর প্রদেশ সরকার, আলমোড়ার সহিত যোগাযোগ করে নেওয়া ভাল।

* ভাড়ারি থেকে কুলি গাইড নিতে হবে। গাইডের বিশেষ প্রয়োজন নেই। কুলি নিলেই সব কাজ হয়ে যাবে। মাল বইবার জন্য ঘোড়াও পাওয়া যায়। কুলির মজুরী ৯০/৯৫ টাকা পিণ্ডারী যাতায়াত। খাওয়া দিতে হবে না। ঘোড়া ১০০/১১০ টাকা। ঘোড়া চালককেও খাওয়া দিতে হবে না। গাইড নিলে ১৫০ টাকা পড়বে। তাছাড়া তাকে খাওয়াও দিতে হবে।

* ডাক বাংলোর প্রতি ঘরের ভাড়া দৈনিক ৪ টাকা।

খরচের হিসাব (চারজনের দলের হিসাবে)।

ট্রেন ভাড়া ছাড়া।

	মোট	মাথাপিছু
বাস ভাড়া	২০০ টাকা	৫০ টাকা
খাওয়া	৫২০ "	১৩০ "
থাকা	৩২ "	৮ "
কুলি	২০০ "	৫০ "
অন্যান্য	৪৮ "	১২ "
	১০০০ "	২৫০ "

বাজার দর বুঝে খরচের হিসাব বদলাতে হতে পারে।

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র (প্রতি সদস্যের)।

বিছানা : গ্রাউণ্ড সীট ১টা, কম্বল ২টা (স্লিপিং ব্যাগ হলে ১টা ও এয়ার ম্যাট্রেস ১টা), হাওয়া বালিশ ১টা।

জামাকাপড় : জামা (গরম+টেরিলিন) ২টা, প্যান্ট (গরম+টেরিলিন) ২টা, সোয়েটার (ফুল+হাফ্) ২টা, মোজা (গরম+নাইলন) ২ জোড়া, গরম দস্তানা ১ জোড়া, মাফলার ১টা, হনুমান টুপি ১টি, হান্টার সু ১ জোড়া, বর্ষাতি ১টা, চটি ১ জোড়া, রঙিন চশমা ১টা, তাছাড়া গেঞ্জি, রুমাল ইত্যাদি।

ওষুধ : সর্দিকাশী, পেটের গণ্ডগোল, মাথাধরা, পেশী ব্যথার জন্য, চোখের ওষুধ, বমির ওষুধ, আয়ডিন ব্যাণ্ডেজ, ভিটামিন ইত্যাদি। * কলেরা বসন্তের টীকা নেওয়া দরকার।

অন্যান্য : ওয়াটার বট্‌ল ১টা, ব্যাটারি সহ টর্চ ১টা, রুকস্যাক অথবা হাভারস্যাক ১টা, ক্রীম ১ টিউব, তেল, গামছা, সাবান, দাড়ি কামানোর জিনিষপত্র, ছুঁচ সুতা, বোতাম, নোটবই, পেনসিল, পলিথিনের থালা, মগ ও চামচ।

দলের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ

খাবার : চা, কফি, দুধ, চিনি, বিস্কুট লজেন্স, চকলেট, চিউনগাম, সুজি, ছোলা, চিঁড়ে, মুড়ি, চানাচুর, জেলি, অন্যান্য শুকনো খাবার। তাছাড়া চাল, ডাল, আটা, আলু, পেঁয়াজ, লবণ, তেল, ঘি, মশলা ইত্যাদি।

অন্যান্য : স্টোভ, কেরসিন, প্রেসারকুকার, মোমবাতি, দেশলাই, ক্যামেরা, ফিল্ম, বস্তা বা বড় কিটস্, গুনছুঁচ, দড়ি, পলিথিন সীট ইত্যাদি।